নিষিদ্ধ কথা
আর
নিষিদ্ধ দেশ

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

উৎসর্গ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

বন্ধুকে

সূচীপত্র

নতুন নিউ এজ সংস্করণের ভূমিকা

ঠিক দেড় বছর হলো, বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিলো। নিজের কলমের মর্যাদা সম্বন্ধে যেটুকু ধারণা তার অনুপাতে প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের মধ্যে সময়ের ব্যবধানকে তখনই আশাতিরিক্ত সংকীর্ণ মনে হয়েছিলো। মনে হয়েছিলো, দুর্লভ সৌভাগ্য আমার। আনন্দ তো হয়েছিলোই, এমন কি রীতিমতো গর্বও।

সেদিন অবশ্য স্বপ্নেও ভাবিনি দেড় বছরের মধ্যে বইটির আর একটা সংস্করণের দরকার হবে। আর, সত্যি বলতে কি, এ-খবর পেয়ে এবার গর্বের বদলে রীতিমতো আশঙ্কাই বোধ করেছি। কেন, তাই বলি।

যতই দিন যাচ্ছে আমাদের দেশে ততই একটি কথা পরিষ্কার হয়ে উঠছে। আমার-আপনার মতো দেশের সাধারণ মানুষ জীবনের সমস্যার সমাধান পাবার আশায় ক্রমশই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী হয়ে উঠছে। ফলে দ্রুত বেড়ে চলেছে, সোবিয়েৎ সমাজের কথা স্পষ্টভাবে জানবার আগ্রহ! আমার এই বইটির প্রতি পাঠক সমাজের আগ্রহ যে আসলে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনায় বিশ্বাসের বিকাশ-মাত্র সে-কথায় সন্দেহ নেই। তৃতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হয়েছে শুনে তাই প্রথম মনে হলো, বইতে এ-বিশ্বাসকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া সম্ভব হয়েছে কি না। আশঙ্কাটা তাই নিয়েই।

বইটি আবার আগাগোড়া ভাল করে পড়ে দেখলাম। পুরানো লেখা পড়তে এমনিই অল্পবিস্তর বিরক্তি লাগে। তাছাড়াও মনে হলো, আলোচনা অনেক জায়গায় অক্ষম হয়েছে, শুধরে লেখা দরকার। মনে হলো, কয়েকটি পরিচ্ছেদে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে, সাধ্যমতো পূর্ণতর করবার চেষ্টা করা দরকার। মনে হলো, বইটির বিষয়বস্তুর নির্বাচনে যে-প্রতিশ্রুতি তা পালন করতে হলে কয়েকটি নতুন পরিচ্ছেদ যোগ দেওয়া দরকার।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই নবসংস্করণের জন্যও বইটিতে অল্পবিস্তর পরিবর্তন করা প্রয়োজন হয়েছে। বস্তুত, আমাদের জাতীয় জীবনে দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে খাপ খাওয়াতে হলে অনেক আলোচনা সম্পূর্ণ ঢেলে সাজানো দরকার। যেখানে তা সম্ভব হয়নি সেখানে অন্তত সাধ্যমতো সংস্কারের চেষ্টা করেছি।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা
২০. ২. ৫৮

এক : পটভূমি

১ : নিষিদ্ধ কথা

২ : ইতিহাসের জবানবন্দি

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিষিদ্ধ কথা

নরনারীর সম্পর্ক নিয়ে সোজাসুজি আলোচনা করবার চেষ্টা আমাদের দেশে সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ। আর সোবিয়েৎ দেশ আজো অনেকাংশে নিষিদ্ধ দেশ। সে-দেশ নিয়ে সত্যভাষণের সম্মান প্রায়ই রাজদণ্ড।

এই নিষিদ্ধ কথা আর নিষিদ্ধ দেশ নিয়েই এ-বই-এর আলোচনা। এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধ যতোখানি, ততোখানিই প্রয়োজন এ-আলোচনার।

প্রথমত এই নিষিদ্ধ কথাটার কথাই ধরা যাক।

বাস্তবকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টায় আর যাই থাক নির্মল বুদ্ধির পরিচয় নেই। এবং বাস্তবের দিক থেকে মানতেই হবে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে নানান রকম সমস্যা আমাদের জীবনে অত্যন্ত গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু সেই সঙ্গে সোবিয়েৎ দেশের কথা কেন? প্রথমত নিশ্চয়ই এই কারণে যে, সোবিয়েতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার যতোই হোক না, ইতিহাসের অমোঘ সাক্ষ্য রয়েছে যে, এই দেশের মানুষ পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী গড়তে এগিয়েছে। 'যেখানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান'—রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,—যে-দেশ না গেলে তাঁর 'তীর্থদর্শন এ-জন্মের মতো অসমাপ্ত থাকতো'। তাই নিশ্চয়ই এ-প্রশ্ন না তুলে উপায় নেই: ওই নতুন পৃথিবী গড়বার সময় নরনারীর সম্পর্ককে কোন চোখে দেখবার চেষ্টা করা হয়েছে? যুগ যুগ ধরে যে-সব সমস্যার কোনো সমাধান দেবার বদলে শুধু নিষিদ্ধ বলে নিন্দেই করা হয়েছে সেগুলির কোনো সমাধান কি সোবিয়েৎ সমাজে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছে? যদি হয়ে থাকে তাহলে তার দার্শনিক ভিত্তিটা কী রকম? বাস্তব কর্মপন্থাই বা কোন ধরনের?

বাস্তব কর্মপন্থার কথাটা কম জরুরী নয়। কেননা ওরা না মানে কোনো যাতুমন্ত্র, না কোনো বিশুদ্ধ দার্শনিকতা—যে-দার্শনিকতার সঙ্গে মাটির পৃথিবী আর রক্ত-মাংসে গড়া মানুষের যোগাযোগ নেই। আবার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিটাকেও ওরা ছোট করতে রাজী নয়। কেননা, ওরা জানে, অন্ধ বিশ্বাসের নির্ভরে কোনো কাজ করতে গেলে সুফল পাবার আশা সংকীর্ণ।

শুধু এই কারণেই, আমাদের ওই নিষিদ্ধ সমস্যাগুলির আলোচনার প্রসঙ্গ থেকে সোবিয়েৎ-এর অভিজ্ঞতাটা যদি বাদ দেওয়া যায় তাহলে ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার অভিজ্ঞতাটাই বাদ পড়ে যাবে।

নিষিদ্ধ কথা আর নিষিদ্ধ দেশ—নামকরণের তাৎপর্যটাকে আরো একভাবে ঘুরিয়ে বলা সম্ভব।

এই বইতে আমি বলতে চেয়েছি, প্রাচীনকাল থেকেই মানব-সমাজ কতকগুলি মূল সমস্যার মুখোমুখী হয়েছে, কিন্তু সেগুলির সমাধান খুঁজে পায়নি। বিশেষ করে আমাদের দেশে, সমাধানের বদলে বরং শিষ্টাচারের নামে সেগুলিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টাই চোখে পড়ে। কিন্তু বালিতে মুখ গুঁজে উটপাখী তো সত্যিই বাস্তব বিপদ উত্তীর্ণ হতে পারে না। তেমনিই, সমস্যাগুলি সম্বন্ধে উদাসীন থাকলেও সমাধান-অভাবের গ্লানিটা আমাদের পীড়িত করবেই। তাই, সমস্যাগুলির কথা মুখে না আনায় প্রিয়-ভাষণের পরিচয় হলেও শ্রেয়-বোধের পরিচয় নেই।

এই বইতে আমি আরো বলতে চেয়েছি, এই সমস্যাগুলিকে জীবনের বাকি সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবার চেষ্টাটা ভুল। এগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র কোনো সমস্যা নয়। জীবনের বাকি সব সমস্যার সঙ্গে এগুলির যোগাযোগ এতো গভীর যে, বাকিগুলি থেকে এগুলিকে আলাদা করে দেখতে যাওয়াটাই অবাস্তব। তাই, ঘুরিয়ে বললে বলা চলে, জীবনের মূল সমস্যার সার্থক সমাধান পাওয়া গেলে তারই সঙ্গে পাওয়া যায় এই সমস্যাগুলির সমাধানও। অপরপক্ষে, এগুলিকে আলাদা করে নিয়ে, শুধুমাত্র এগুলির সমাধান খোঁজার চেষ্টায়, বিফলতা অনিবার্য।

আগেকার কালের চিকিৎসকেরা রোগের নানান লক্ষণ

অনুসারে চিকিৎসা করবার চেষ্টা করতেন: মাথার যন্ত্রণার জন্যে একটা ওষুধ, জ্বরের জন্যে একটা ওষুধ, এইভাবে প্রেস্‌ক্রিপসনের চেহারা সুদীর্ঘ হতো। বর্তমানের চিকিৎসকেরা অনুসন্ধান করেন, আসলে কোন্ বীজাণুর আক্রমণে এতো সব রকমারি রোগলক্ষণ। সেই বীজাণুর বিরুদ্ধেই আজকের চিকিৎসাপদ্ধতি। এই তফাতটার মধ্যে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পরিচয়।

এই বইতে আমি আরো বলতে চেয়েছি, সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনাতেই জীবনের ওই মূল সমস্যার সার্থক সমাধান। পৃথিবীতে এই পরিকল্পনা প্রথম বাস্তব রূপ পেয়েছে রুশ দেশে, আধুনিক যুগে। তাই, ও-দেশে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার কল্যাণ শুধুমাত্র মানুষের আর্থিক দুঃখটুকু দূর করেই নিঃশেষ হয়নি; সেই সঙ্গেই সক্ষম হয়েছে অনেকগুলি সনাতন প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিতে। তাই, সোবিয়েৎ সমাজের অভিজ্ঞতা বাদ দিয়ে আলোচ্য সমস্যাগুলির সমাধান খোঁজা নিস্ফল।

কথাটাকে এইভাবে পাড়তে গেলে শুরুতে দুটি প্রশ্ন তোলা দরকার।

প্রথম প্রশ্ন হলো, যৌনজীবন সংক্রান্ত এই প্রশ্নগুলিকে ঠিক কতোখানি গুরুত্ব দিতে হবে? সমস্যাগুলি বাস্তব। সমস্যাগুলিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টায় শুভবুদ্ধির পরিচয় নেই। কিন্তু তার মানেই কি এই যে, ওই জাতীয় প্রশ্ন নিয়েই মাথা ঘামাতে হবে সবচেয়ে বেশি,—যেন এগুলিই জীবনের প্রধান ও অন্যতম প্রশ্ন? এই রকমের একটা মতবাদ আছে বই কি। এমন কি, আজকের দিনে মতবাদটার বৈজ্ঞানিক মর্যাদা নিয়ে নামডাকও কম নয়। কিন্তু বিরুদ্ধ মতবাদও রয়েছে। আর তাই প্রশ্ন ওঠে, মতবাদটা কতখানি স্বীকার্য? এবং, এ-বিষয়ে সোবিয়েৎ সমাজের অভিজ্ঞতা কী রকম?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা ছাড়া এই সমস্যাগুলির প্রকৃত সমাধান যদি খুঁজে পাওয়া সম্ভব না হয় তাহলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার আগে পর্যন্ত কি এগুলি সম্বন্ধে আমাদের কিছুই করবার নেই? মানুষ কোনো আলাদিনের

প্রদীপ খুঁজে পায়নি, রাতারাতি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সমাজতন্ত্র সংগ্রাম সাপেক্ষ; এ-সংগ্রাম সুদীর্ঘও হতে পারে। ততোদিন পর্যন্ত কি এগুলি সম্বন্ধে আমরা শুধুই উদাসীন থাকবো?

দ্বিতীয় প্রশ্নটির জবাব দেওয়া সম্ভব হবে বই-এর শেষ পর্যন্ত পৌঁছে। এখানে শুধু প্রথম প্রশ্নটির আলোচনা করা যাক।

সমস্যাগুলির প্রতি কতখানি গুরুত্ব আরোপ করবো? এই প্রশ্নের জবাব দেবার আগে প্রশ্নটাকেই ভালো করে যাচিয়ে নেওয়া দরকার। যৌনজীবনের সমস্যা বলতে কি শুধুই একটি ব্যক্তিগত মানুষের পক্ষে ব্যক্তিগত যৌন-পরিতৃপ্তি খোঁজবার সমস্যা? নিশ্চয়ই নয়। নানান কারণে তা হতে পারে না। প্রথমত পুরো সমাজটার কথা বাদ দিয়ে কোনো ব্যক্তিরই নিজস্ব বা ব্যক্তিগত জীবন বলে আসলে কিছু নেই। তাই যদিই বা আমি বাকি সমাজটার কথা বাদ দিয়ে শুধু নিজের সমস্যায় একান্তভাবে মশগুল থাকবার চেষ্টা করি—তাহলেও আমার চেষ্টা নিষ্ফল হতে বাধ্য। সমাজের গ্লানি আমার ব্যক্তিগত জীবনে গ্লানি সৃষ্টি করবেই, সমাজের স্বাস্থ্য ছাড়া আমার ব্যক্তিগত জীবনকে সুস্থ করে তোলা অসম্ভব। আমাদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতায় এই কথা কী ভাবে প্রকট রূপ ধারণ করেছিলো তার স্মৃতি নিশ্চয়ই আমাদের মন থেকে মুছে যায়নি। একটা সময় গিয়েছে যখন কালোবাজার থেকে চাল না কিনলে, কালোবাজার থেকে ওষুধ না কিনলে, কলকাতা শহরে বেঁচে থাকাই দায় হয়ে উঠেছিলো। কালোবাজারকে প্রশ্রয় দেওয়া দুর্নীতির লক্ষণ; অথচ যাঁরা প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরা যে সবাই দুর্নীতিপরায়ণ তা নিশ্চয়ই নয়। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই ব্যক্তিগতভাবে সাধু ও সৎ। তবু দুর্নীতিকেই প্রশ্রয় দিতে হয়েছিলো। তার কারণ, সামাজিক গ্লানির সামনে ব্যক্তিগত সাধুতার সেদিন চরম পরাজয়। তখন অবশ্য দেশের দুঃসময়—সংকটের সময়! কিন্তু সংকটের সময়েই সত্যটা প্রকট হয়ে পড়ে।

রোগী যখন প্রলাপ বকে তখন প্রলাপের মধ্যেই অনেক সময় তার চরিত্রের আসল ইশারা পাওয়া যায়—স্বাভাবিক ব্যবহারে যা অল্পবিস্তর চাপা থাকে।

যৌনজীবনের সমস্যাকে নিছক ব্যক্তিগত জীবনের ব্যক্তিগত পরিতৃপ্তির সমস্যা বলে চিনতে যাওয়া বৈজ্ঞানিক মনস্তত্ত্বের দিক থেকেও অসম্ভব। কেন অসম্ভব তার পরিচয় এখানে প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজন।

সিড্‌উইক নামের জনৈক য়ুরোপীয় নীতিবিজ্ঞানী একটা চমৎকার কথা বলেছিলেন: যদি আপনি সত্যিই সুখ চান তাহলে 'সুখ পেতে চাই' এই কথাটা ভুলতে হবে—in order to get pleasures one must forget them। যুক্তিটা সহজ: সুখ চাই, এই চিন্তাই যদি মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে তাহলে যে-সব স্বাভাবিক পরিতৃপ্তির দরুন সুখ সেগুলির দিকে আর মন যাবে না। ফলে ওই পরিতৃপ্তি অসম্ভব হয়ে উঠবে এবং এই পরিতৃপ্তিই যেহেতু সুখলাভের সর্ত সেই হেতু অসম্ভব হবে সুখের সম্ভাবনাও। তাই, সুখ যদি পেতেই হয় তাহলে সুখ পাবার কথাটা মন থেকে সরিয়ে অন্য বিষয়ের দিকে মন দেওয়া দরকার। গান শোনার দিকে যার মন তার পক্ষেই গান শুনে সুখ পাওয়া সম্ভব, খেলার দিকেই যার মন তার পক্ষেই খেলে বা খেলা দেখে সুখ পাওয়া সম্ভব। তেমনি সুস্থ পারিবারিক জীবন গড়ে তোলার দিকে যার মন তার পক্ষেই পারিবারিক জীবনের সুখ পাওয়া সম্ভব। তার বদলে কেউ যদি একান্তভাবেই মনোনিয়োগ করেন শুধুমাত্র যৌন-পরিতৃপ্তি খোঁজ করবার দিকে তাহলে তাঁর পরিতৃপ্তির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হবেই।

প্রসঙ্গত একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উল্লেখ করা যায়। মনোবিকারের চিকিৎসা নিয়ে একসময়ে খুব উৎসাহী হয়েছিলাম। তখন রকমারি রোগীর সঙ্গে পরিচয় হতো। এই পরিচয়ের মধ্যে একটি কথা বারবার চোখে পড়েছে; পুরুষত্বহীনতার লক্ষণ যে-রোগীর মধ্যে প্রবল তার পক্ষেই নিছক যৌন-পরিতৃপ্তি খোঁজবার সবচেয়ে উগ্র উৎসাহ। এই কথাটি এমনই নিয়মিতভাবে চোখে পড়ে যে, ওই জাতীয় উগ্র উৎসাহের পরিচয় পেলে প্রায় সরাসরি

বলে দেওয়া যায় এটা যৌন অক্ষমতারই লক্ষণ বা সূচনা। চলতি কথায় আমরা যাকে কাঙালের খিদে বলি সেটা আর যাই হোক স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। স্বাভাবিক পরিশ্রমের ফলেই স্বাভাবিক খিদে হয়। অস্বাভাবিক রকমের খাবার উৎসাহ দেখলে সন্দেহ করতে হবে শরীরটা বিকল হয়েছে।

এই বইতে যা বলতে চেয়েছি তা কিন্তু আরো অনেকখানি কথা। শুধুমাত্র স্বাভাবিক ও সুস্থ পারিবারিক জীবন গড়ে তোলবার মধ্যেই আলোচ্য পরিতৃপ্তি সম্ভবপর, কিন্তু বর্তমান সমাজের বাস্তব পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক ও সুস্থ পারিবারিক জীবন গড়ে তোলার বাধা আছে. তার প্রধান কারণ হলো, বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে নারীজাতির স্থান। স্ত্রী-শূদ্রের বেদে অধিকার নেই—এমনতরো কথা সরাসরি বলতে অবশ্য আজ অনেকেরই রুচিতে বাধবে। কিন্তু এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে মেয়েরা সামাজিকভাবে মুক্ত নয়। আমাদের দেশে তো ননই, এমন কি য়ুরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও নয়। মেয়েদের মর্যাদাটা প্রায়ই নিছক ভোগ্যবস্তুর মর্যাদা। আজকালকার যে-কোনো একটি মার্কিন পত্রিকার মলাট থেকে শুরু করে শেষ পাতার বিজ্ঞাপন পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে যান, দেখবেন প্রতিটি পণ্যবস্তুকেই ক্রেতার মনে ধরাবার আশায় নারীমূর্তির প্রলোভন দেখানোর কী কুৎসিৎ আগ্রহ! রংচং-এ খাবারের ছবি আর মেয়েদের ছবি দেখতে দেখতে যেন গুলিয়ে যায়—পরিবেশনের উৎসাহটা এমনই উৎকট।

কিন্তু কথা হলো, অর্ধোলঙ্গ পুরুষের ছবি ছাপিয়ে পত্রিকার মালিকদের বা বিজ্ঞাপনদাতাদের সিদ্ধি জোটে না কেন? এই সহজ প্রশ্নটি আমরা প্রায়ই তুলতে ভুলে যাই। কিন্তু এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত রয়েছে নারীর প্রতি ওই সমাজের মনোভাব।

শ্রেণীসমাজের কাছে নারীজাতির পবিত্রতা রক্ষার প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুতর। কেননা, শ্রেণীসমাজের ভিত্তিই হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তি, আর তাই এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির নির্ভুল উত্তরাধিকারী নির্ণয় করাই শ্রেণীসমাজের একটি বড়ো মাথা ব্যথা। উত্তরাধিকারী যদি নির্ভুল না হয় তাহলে তো ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রায় বেহাত

হবারই সামিল। একই কারণে, শ্রেণীসমাজে নারীর জীবনের উপর অতি-সতর্ক নিষেধাজ্ঞা। নারী তাই দুর্লভ সামগ্রী,—দুর্লভ বলেই লোভনীয়, লোভনীয় বলেই তার ছবির লোভ দেখিয়ে যে-কোনো পণ্যবস্তুকেই বাজারে কাটানো সহজসাধ্য। ফলে অবস্থাটা মোটের উপর এক উৎকট পরিহাসের মতোই হয়ে দাঁড়িয়েছে: নারীজীবনের শুচিতা রক্ষা করার তাগিদই নারীকে আজ পরম পণ্যে পরিণত করছে।

মার্কিন সভ্যতার এই বিকৃত বীভৎস রূপটিকে আকস্মিক ঘটনাও বলা চলে না। শ্রেণীসমাজের চূড়ান্ত বিকাশ আজ এই সভ্যতায়। তাই এ-সভ্যতায় যে-কথার অমন প্রকট প্রকাশ তারই আলোয় অন্যান্য শ্রেণীসমাজে যে-কথা এখনো কিছুটা নামাবলী ঢাকা ও প্রচ্ছন্ন রয়েছে তার কথা বুঝতে পারবার সুযোগ আছে। এই হলো শ্রেণীসমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব: একদিকে নির্ভুলভাবে উত্তরাধিকারীকে সনাক্ত করবার আশায় স্বাভাবিক সামাজিক মর্যাদা থেকে নারীজাতিকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবার আয়োজন, এবং এই আয়োজনের খাতিরেই নারীজাতির শুচিতা ও সতীত্ব নিয়ে অফুরন্ত সাধুবাক্য; অপরদিকে এরই বাস্তব পরিণতি হলো নারীজাতিকে একেবারে পরম-পণ্য করে তোলা—রংচং-এ খাবারের ছবি আর রংচং-এ মেয়েদের ছবি, মার্কিন পত্রিকায় এই দু'-এর মধ্যে সীমারেখা অস্পষ্ট।

এই দিক থেকে দেখতে গেলে যৌনজীবন-সংক্রান্ত সমস্যার গুরুত্ব কিন্তু অত্যন্ত গভীর। কেননা, এই সমস্যার সূত্র ধরে এগোলে দেখা যায় এরই মধ্যে জীবনের একটি মূল সমস্যার বিকাশও। এবং এই দিক থেকে এগোবার চেষ্টা করেছি বলেই শেষ পর্যন্ত যে-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি সেটা হলো জীবনের মূল সমস্যা সম্বন্ধে উদাসীন থেকে নিছক যৌন সমস্যাকে স্বতন্ত্র ও একান্ত সমস্যা হিসেবে দেখবার চেষ্টা করলে তার প্রকৃত সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভবই নয়। তার মানে, যৌনজীবনের সমস্যা ঠিক কতখানি গুরুত্বপূর্ণ এ-কথার জবাব দিতে হলে সর্বপ্রথম সমস্যাটাকে স্পষ্টভাবে চিনতে পারা দরকার। এ-সমস্যা ব্যক্তিগত পরিতৃপ্তি সন্ধানের সমস্যাই নয়। ওই পরিতৃপ্তির উপর দৃষ্টি যদি একান্তভাবে আবদ্ধ থাকে

তাহলে তা অসুস্থতার লক্ষণ হয়ে দাঁড়ায় এবং তার দরুন আর যাই হোক প্রকৃত তৃপ্তির আশাও থাকে না। অপরপক্ষে সমস্যাটাকে ঠিক মতো চিনতে পারলে বোঝা যায় এটা বৃহত্তর সামাজিক সমস্যারই অঙ্গ। এবং সেই বৃহত্তর সামাজিক সমস্যা যে-হেতু গভীর ও গুরুতর সেই হেতু, তার অঙ্গ হিসেবেই, যৌনজীবনের সমস্যার গুরুত্বও অকিঞ্চন নয়।

এই দিক থেকে নিষিদ্ধ কথার আলোচনা আর নিষিদ্ধ দেশের আলোচনা, এ-দু'-এর মধ্যে আরো যোগাযোগ চোখে পড়ে। কেননা দু'রকম নিষিদ্ধতা জারির সঙ্গেই শ্রেণীশোষণের সম্পর্ক আছে, যদিও অনেক সময় তা অচেতন। সোবিয়েতের কথাকে নিষিদ্ধ করার পিছনে শোষকশ্রেণীর স্বার্থ অবশ্যই প্রকট। কিন্তু যৌনজিজ্ঞাসার বিরুদ্ধে যে-প্রতিবন্ধ তার পিছনে শোষকশ্রেণীর স্বার্থটুকু অত প্রকট বা স্পষ্ট নয়। সেই কথাটা সামান্য আলোচনা করা যাক।

পৃথিবীর বুকে মানবসমাজের যে সুদীর্ঘ ইতিহাস, মোটের উপর তাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়: প্রাক্-বিভক্ত সমাজ, শ্রেণীবিভক্ত সমাজ আর শ্রেণীহীন সমাজ।

প্রাচীনকালে ছিলো প্রাক্-বিভক্ত সমাজ। সে-সমাজে শোষণের অবকাশ নেই, কারুর পক্ষেই অপরের শ্রম দিয়ে তৈরি জিনিস আত্মসাৎ করে বড়োলোক হবার প্রশ্ন ওঠে না। কেননা, মানুষের হাতিয়ার তখনো এমনই স্থূল যে, তার উপর নির্ভর করে সবাই মিলে প্রাণপাত পরিশ্রম করলে পৃথিবীর কাছ থেকে সবশুদ্ধ, যেটুকু জিনিস সংগ্রহ করা সম্ভব তাই দিয়ে কোনোমতে পুরো দলটার প্রাণ বাঁচাতে পারে। তাই দলের মধ্যে বড়লোক-ছোটলোকের তফাত সম্ভব নয়, সম্ভব নয় মালিক-শ্রমিকের

তফাত। তার বদলে এক রকম সাম্যের নিয়ম অনুসারেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ সরল সম্পর্ক। এই জন্যেই এ-অবস্থাটাকে বলা হয় আদিম সাম্য অবস্থা। কিন্তু এই সাম্যের ভিত্তিতে আসলে দৈন্য, দারিদ্র্য, অভাব। সকলেই সমান, কেননা সকলেই সমান গরিব। আর, সকলেই সমান গরিব হতে বাধ্য, কেননা তখন পর্যন্ত মানুষের হাতিয়ারের যা অবস্থা তাই দিয়ে প্রাচুর্য তো দূরের কথা,—এমন কি সচ্ছলতা সৃষ্টি করাও সম্ভব নয়।

কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের বিরাম নেই। আর এই অবিরাম সংগ্রামের দরুনই দিনের পর দিন তার উৎপাদন-শক্তি উন্নত থেকে উন্নততর হয়ে চলেছে। এইভাবে উন্নতি হতে হতে একটা পর্যায়ে পৌঁছে দেখা গেলো মানুষের শ্রমশক্তি সৃষ্টি করতে শিখেছে নিছক জীবন-ধারণের জন্যে যেটুকু দরকার তার চেয়ে বেশি জিনিস, বাড়তি জিনিস। আর, তখন থেকেই দেখা গেলো শ্রমের দায়িত্ব গ্রহণ না করেও একজনের পক্ষে, বা কয়েকজনের পক্ষে, বেঁচে থাকবার সম্ভবনা আছে: বাকি পাঁচজন পরিশ্রম করে যে-পরিমাণ জিনিস উৎপন্ন করবে তা থেকে ওই বাকি পাঁচজনের জীবন-ধারণের তাগিদ চুকিয়েও অপরকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। অর্থাৎ কিনা, এই সময়টা থেকেই দেখা দিলো শোষণের সম্ভাবনা: অপরের শ্রম দিয়ে তৈরি জিনিস আত্মসাৎ করার নামই শোষণ।

তাই, একদিক থেকে উৎপাদন-শক্তির এই উন্নতিতে যে-রকম অগ্রগতির পরিচয়, আবার অপর দিক থেকে এরই প্রভাবে পুরোনো কালের সমান সহজ সম্পর্কটা ভেঙে যায়। মানুষের সমাজ ক্রমশই দুটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে স্পষ্টভাবে ভাগ হয়ে যেতে লাগলো। শোষক-শ্রেণী আর শোষিত শ্রেণী। এ-সমাজের নাম তাই শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। আর এই শ্রেণীবিভাগের দরুনই, মানুষের উৎপাদন-শক্তিটা যতো অবিশ্বাস্য রকমেই বেড়ে চলুক না কেন, মানুষের দুঃখ-দৈন্য, দুর্দশা-লাঞ্ছনা কোনো কিছুরই যেন শেষ হয় না। প্রাচুর্যের মধ্যেও তাই হাহাকার। বাহুল্যের মেদরোগ, আর তারই উল্টো পিঠে অভাবের ক্ষয়রোগ। এই হলো শ্রেণী-সমাজের এ-পিঠ ও-পিঠ দু'পিঠের কথা।

কথা হলো, এই রকমটাই কি থেকে যাবে চিরকাল?

নিশ্চয়ই নয়। কেননা, হাজার কয়েক বছর ধরে মানুষের উৎপাদন-শক্তিতে উন্নতি হতে হতে শেষ পর্যন্ত আধুনিক যুগে পেঁাছে দেখা গেলো একেবারে নতুন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমত, উৎপাদন-শক্তিটা বেড়ে গিয়েছে অবিশ্বাস্যভাবে। দ্বিতীয়ত, মানুষের উৎপাদন-শক্তি এইভাবে বেড়ে যাবার দরুনই দেখা গেলো মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে আর শ্রেণীসমাজের কাঠামোর মধ্যে বেঁধে রাখা সম্ভবই নয়। ওই উৎপাদন-শক্তির প্রভাবেই আজ শ্রেণীসমাজের কাঠামোটা দিকে দিকে চিড় খেয়ে চুরমার হয়ে যেতে চায়। তারপর নতুন নিঃশ্রেণীক সাম্যসমাজ। পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী। তারই প্রথম বাস্তব আয়োজন সোবিয়েৎ সমাজে।

তাই আমাদের পিছনে এক শ্রেণীহীন সমাজের স্মৃতি। আমাদের সামনে এক নিঃশ্রেণীক সমাজের আহ্বান। আর মাঝখানটুকুতে আমরা—আমরা যারা শ্রেণীসমাজের মানুষ। পৃথিবীর বুকে মানবজাতির সুদীর্ঘ ইতিহাসের তুলনায় এই শ্রেণীসমাজের ইতিহাসটুকু নেহাতই যেন চোখের পলক। অতীতের কথা ভোলা চলবে না, ভোলা চলবে না আগামীকালের কথা। আর তারই আলোয় বোঝবার চেষ্টা করতে হবে আজকের দিনের সমস্যাকে।

আজকের দিনে নরনারীর সম্পর্কে যে-গ্লানি, যে-ব্যর্থতা—আদিম শ্রেণীহীন সমাজে তার পরিচয় ছিলো না। আগামীকালের নিঃশ্রেণীক সমাজেও তা থাকবে না। এই গ্লানির সঙ্গে শ্রেণীসমাজের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। কেননা, আমরা পরে দেখবো, শ্রেণীসমাজে মানুষে-মানুষে সম্পর্কটা ব্যক্তিগত সম্পত্তির দাবির কাছে গৌণ। তবু, মনে রাখতে হবে, অতীতের শ্রেণীহীন সমাজের ভিত্তিতে দৈন্য আর অভাব—ধন উৎপাদনের দিক থেকে দৈন্য, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দিক থেকে দৈন্য। বিজ্ঞানের হাতিয়ার হাতে প্রাচুর্যের ভিত্তিতে আজকের মানুষ যে-নিঃশ্রেণীক সমাজ গড়তে এগিয়েছে সে-সমাজে নরনারীর সম্পর্ক ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার

পক্ষে প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু আগামীকালের মুক্তি সেই আদিম মুক্তির পুনরুক্তি মাত্র হবে না। সে-মুক্তি হবে অনেক সমৃদ্ধ, তাই অনেক সুস্থ ও সহজ। তবু মুক্তি হিসেবে, শ্রেণীসমাজের গ্লানির অভাব হিসেবে, মিল নিশ্চয়ই আছে। এই কথাটুকুকে ভুলে যাওয়াও কাজের কথা নয়।

শ্রেণীসমাজের গ্লানিটা ঠিক কী রকম? শ্রেণীসমাজ দেখা দেবার সময় থেকেই স্ত্রীপুরুষের স্বাভাবিক সত্তাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির চাহিদার কাছে গৌণ করা হয়েছে। সমাজে প্রকাশ্যভাবে নরনারীর সম্পর্ককে যতটুকু স্বীকার করা হয় তা নিছক নির্ভুল উত্তরাধিকারী সৃষ্টি করবার জন্যে, সহজ সুস্থ জীবনের জন্যে নয়। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা, পুত্র পিণ্ডপ্রয়োজনম্'—চানক্যের এই অতি সহজ ও অতি স্পষ্ট কথাটুকুই সমস্ত দেশের শ্রেণীসমাজের প্রকাশ্য বা পরোক্ষ মূলমন্ত্র। কেবল, একে যদি আজকের দিনের বাস্তবের সঙ্গে আরো ভালো করে খাপ খাইয়ে প্রকাশ করতে হয় তাহলে ওই পিণ্ডপ্রয়োজনে কথাটা ভেঙে বলা দরকার, নির্ভুল উত্তরাধিকারী সনাক্ত করবারই প্রয়োজন। শ্রেণীসমাজে, এর বাইরে যৌনজীবনকে যতটুকু লুকিয়ে স্বীকার করা, তা সোজাসুজি নগদ মূল্যের বিনিময়ে। সংখ্যাগণিতের হিসেব করে নাকি বলে দেওয়া যায় কোন্ দেশে কোন্ যুগে ঠিক কতোগুলি গণিকার প্রয়োজন!

মোটের উপর, শ্রেণীসমাজে নারীর মুক্তি নেই বলেই নরনারীর সম্পর্কটা সহজ ও সুস্থ হবার সুযোগ পায়নি। যৌনপ্রবৃত্তি হয় উত্তরাধিকারী সৃষ্টি করায় নিযুক্ত, আর না হয় তো নগদ পণ্যের কারবারে পর্যবসিত। যৌনপ্রবৃত্তিকে এই যে সম্পত্তি রক্ষার কাজে নিয়োগ করা, বা নগদ মূল্যের পণ্য করে তোলা, এর মধ্যেও শ্রেণীশোষণের চিহ্নই বর্তমান। শোষণের প্রত্যক্ষ দুর্ভোগটুকু অবশ্য নারীর কপালেই। তবু এই বঞ্চনার পরিণামে পুরুষের অধঃপতনটাও কম নয়। যে-মেয়ে নগদ মূল্যের বিনিময়ে দেহ বিকোতে বাধ্য হলো তার দুঃখ-দুর্গতি অবশ্যই প্রকট। কিন্তু যে-পুরুষ সামাজিকভাবে কামপ্রবৃত্তির সহজ চরিতার্থতা খুঁজে পায়নি বলেই মুদ্রা বিনিময়ে লাম্পট্য সুখ কিনতে গেলো তার কাহিনীও কম মর্মান্তিক নয়।

এ-সমাজে মানুষের যৌনজীবন তাই অনেকাংশেই লাঞ্ছনা আর বঞ্চনার জীবন। আরো পাঁচরকম শোষণের মতো এ-ও একরকম শোষণের রূপ। যৌনজিজ্ঞাসার প্রকৃত বৈজ্ঞানিক উত্তর খুঁজতে গেলে শেষ পর্যন্ত এই আলোচনাতেই এসে পড়া স্বাভাবিক। আর তাই, যৌনবিজ্ঞানের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক আলোচনার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবন্ধ থাকে: শেষ পর্যন্ত তা সমাজব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা হয়ে দাঁড়াবার উপক্রম করে যে!

কেবল নিন্দিত নয় সেই গ্রন্থ, যার লেখক যৌনবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করবার ওজুহাতে আসলে আলোচনা তুলেছেন শোষকশ্রেণীর ভোগবিলাসকে কেমন করে মাত্রাতিরিক্ত করা যায়। নমুনা, বাৎসায়নের 'কামসূত্রম্'। আমাদের দেশে যৌনপ্রবৃত্তিকে হাজার রকম বিধিনিষেধের শাসনে কঠোরভাবে বেঁধে রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু তারই পাশে বাৎসায়ন শুধু ঋষি নন, মহর্ষি। কেমন করে তা সম্ভব হয়? এ-প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে বাৎসায়নের কামসূত্রের মূল আলোচ্য বিষয়ের কথা ভেবে দেখতে হবে। এই গ্রন্থের সূচীপত্রটুকু উল্টে গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে, কামসূত্রের পনরো আনাই হলো শোষকশ্রেণীর প্রতি উপদেশ: "পরস্ত্রীকামী রাজা বা রাজতুল্য ব্যক্তির কর্তব্য,....পতি সমীপে ও পতি প্রবাসে থাকিলে সতী ভার্যার আচরণ,—সপত্নী থাকিলে জ্যেষ্ঠা ভার্যার আচরণ, ঐ স্থলে কনিষ্ঠার আচরণ, পুনর্ভূর আচরণ, দুর্ভাগার আচরণ, অন্তঃপুরের ব্যবস্থা, বহুপত্নীক পুরুষের আচরণ,—বারাঙ্গনার উপজীব্য নায়ক, বিরাগভাজন নায়কের প্রতি বারাঙ্গনার ব্যবহার, নায়কের আগ্রহসাধন,—নায়কের মনোহরার্থ নায়িকার আচরণ,—অর্থাগমের কৌশল,—অন্তঃপুরিকাদিগের আচরণ ও ধর্মপত্নীগণের রক্ষাবিধান,—জীবিকাহীন নপুংসকগণের জীবিকোপায়ের জন্য গণিকাবৃত্তি ব্যবস্থা,—বশীকরণ, ভোগশক্তি বৃদ্ধির ঔষধ, অঙ্গবৃদ্ধির উপায়—" ইত্যাদি। কামসূত্রের আলোচনা শুরু হলো 'নাগরিক বৃত্ত' নিয়ে, পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় যার মানে করেছেন, 'সেকালের বাবুগিরি'। আর কামসূত্রের শেষ আলোচ্য বিষয় হলো 'ভোগ বিষয়ক বিবিধ তথ্য'। এই শুরু আর শেষ থেকেই অনুমান করা সহজ যে, গ্রন্থের আসল উদ্দেশ্যটা ঠিক কী।

অবশ্যই, যৌন-মনস্তত্ত্বের দিক থেকে কামসূত্রের কোন বৈজ্ঞানিক অবদান আছে কিনা সে-আলোচনা স্বতন্ত্র। বাৎসায়নের যুগটার কথাও ভুললে চলবে না। সে-যুগের শোষক-তুষ্টির উদ্দেশ্য বাদ দিয়ে বিজ্ঞানের আলোচনা হয়তো সম্ভবই ছিল না। এমন কি সুশ্রুত এবং চরকও চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভূমিকায় খোলা গলায় বলছেন, 'রাজার কাছে মুখ বুজে গোলামী করতে যে নারাজ তার চিকিৎসা করবো না'—শুধু এই প্রতিজ্ঞার ভিত্তিতেই কাউকে চিকিৎসাবিজ্ঞান শেখানো সম্ভব। কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে কথাগুলো শ্বেতপাথরে লেখা আছে। তবু, একথাও ভুললে চলবে না যে, এই শোষক-তুষ্টির প্রসাদেই যৌনবিজ্ঞানের আলোচনা তুলেও বাৎসায়ন শ্রেণী-সমাজের নিন্দাভজন হননি, তার বদলে পেয়েছেন মহর্ষির গৌরব।

অথচ, খুব সোজাসুজি আর খোলাখুলিভাবে শোষক-তুষ্টির এই সহজ পথ ছেড়ে যৌনজীবনের আলোচনা করতে এগিয়ে অনেকেই দেখেছেন পথটা রীতিমতো দুর্গম: মহর্ষির গৌরবের বদলে তাঁরা পেয়েছেন দুর্নাম আর দুর্ভোগের বোঝা। আমাদের এই আলোকপ্রাপ্ত ও বৈজ্ঞানিক যুগেই এর নমুনা রয়েছে।

তিরিশ বছর ধরে একটানা অক্লান্ত গবেষণা করবার পর হ্যাভ্‌লক এলিস্‌ তাঁর গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করলেন। কিন্তু ঋষির গৌরব না জুটে তাঁর কপালে জুটলো হাকিমের হুমকি এবং তিনি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলতে বাধ্য হলেন: "আমার পথে যে কত রকমের বিঘ্ন তা শুরুতে আমি আন্দাজ করতে পারিনি। আমার ধারণা ছিল, এই ধরনের ছাত্র (যে কি না একটানা তিরিশ বছর গবেষণা করেছে!) যে-পুলিশ বা সরকারের রক্ষণব্যবস্থায় নিজেকে আশ্রিত মনে করেছে, অন্তত তার কোনো স্থূল আক্রমণের সম্ভাবনা থেকে সুনিশ্চিতভাবে মুক্ত। কিন্তু দেখা গেল ধারণাটা ভুল।" দুরাশা ও আশাভঙ্গ। দু'-এর মূলেই কিন্তু এক কথা—ইতিহাসবোধের অভাব। এলিস্‌ নরনারীর বাস্তব সম্পর্ক, কামপ্রবৃত্তির দাবি এবং এ-যুগে সে-দাবি ব্যর্থ হবার যে-গ্লানি তাকেই বোঝবার চেষ্টা করেছিলেন। সেই বোধ কতখানি পূর্ণাঙ্গ হয়েছিল তার আলোচনা স্বতন্ত্র; কিন্তু এ-কথায় সন্দেহ নেই যে, এলিসের গবেষণা শেষ

পর্যন্ত আধুনিক সমাজেরই একটি কঠোর সমালোচনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই বিঘ্ন। আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থাটাকে টিকিয়ে রাখবার জন্যেই যে-আইন-কানুন তা আধুনিক সমাজের বিরুদ্ধে এমন সমালোচনা সহ্য করবে কেন?

এদিক থেকে সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েডের দৃষ্টান্তও উল্লেখ করা যায়। যৌনপ্রবৃত্তি নিয়ে আলোচনা করতে এগিয়ে তিনিও সামাজিক প্রতিবন্ধের মুখোমুখি হয়েছেন এবং তাই নিয়ে নানান আক্ষেপ করেছেন। অবশ্য এই প্রতিবন্ধের আসল তাৎপর্য যে কী তা তাঁর নিজের চেতনায় ধরা পড়েনি; তিনি নিজে বরং এ-নিয়ে অনেক রকম রহস্যময় আলোচনা তুলছেন। কিন্তু ইতিহাসবোধের দিক থেকে বিচার করলে বুঝতে পারা যায়, একটা বিশেষ যুগে যৌনসম্পর্ক নিয়ে তাঁর মূল বক্তব্য কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে চেয়েছিল। তাই কায়েমী স্বার্থ বাধা তুলেছিল তাঁর বক্তব্যের বিরুদ্ধে। অবশ্যই ঐতিহাসিকভাবে এই বাধার পরমায়ু ফুরোতে খুব বেশি সময় লাগেনি, কেননা নতুন সমাজের স্বার্থের সঙ্গে তাঁর মতবাদ ও মন্তব্য খাপ খাবার পর নতুন সমাজ তাঁকে শুধু সমর্থনই করলো না, নানানভাবে তাঁর মতবাদ প্রচার করবারই আয়োজন করলো।

এ-বিষয়ে ফ্রয়েডের মতবাদটাকে খুঁটিয়ে বিচার করবার দরকার আছে। কেননা, ফ্রয়েডের ওই মতবাদটির তরফে প্রচার এতোই প্রবল যে, যৌন-জীবনের কথাকে নিষিদ্ধ কথা বললেই মনে হতে পারে, এ হলো ফ্রয়েডবাদেরই প্রতিধ্বনি।

ফ্রয়েড বলেন, তাঁর বলবার কথাটার বিরুদ্ধে সভ্যসমাজের স্বাভাবিক আপত্তি না উঠে পারে না। কেননা, সভ্যতার ভিত্তিতে রয়েছে যৌন-প্রবৃত্তির বঞ্চনা—যৌনশক্তিকে স্বাভাবিক চরিতার্থতা থেকে বঞ্চিত করা সম্ভব হয়েছে বলেই মানুষ পেরেছে তাই দিয়ে সভ্যতার ইমারত গাঁথতে। আর, ফ্রয়েড বলতে চান, তিনি যে শুধু এই কথাটিকে প্রকাশই করে দিয়েছেন তাই নয়, তাঁর বিচার

অনুসারে এ-বঞ্চনা প্রায়ই অপচয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাই সভ্যতার তরফ থেকে তাঁর বক্তব্যের বিরুদ্ধে অমন আপত্তি না উঠে উপায় কি?

এ-বিষয়ে অবশ্যই সন্দেহ নেই যে, একটা বিশেষ যুগে ফ্রয়েডের বিরুদ্ধে সত্যিই প্রবল আপত্তি দেখা দিয়েছিলো। কিন্তু যুগ-বদলের সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া বদলটা যে ঠিক কীভাবে হয় তা দেখতে অবাক লাগে। আজকের দিনে আপনি যদি ফ্রয়েডের নিজের রচনা পাঠ করেন তাহলে আপনার মনে এমন কি এ-সন্দেহও জাগতে পারে যে, সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড হয়তো সত্যি কথাই বলছেন না। কেননা, তাঁর গ্রন্থে বারবার ঘুরে ফিরে এই অভিযোগই দেখা যায় যে, তাঁর আলোচনার বিরুদ্ধে সমাজের প্রতিবন্ধ অতি কঠোর। সমাজ বুঝি চক্রান্ত করেছে তাঁর বিরুদ্ধে! অথচ আজকের দিনে ফুটপাথ থেকে একটি মার্কিন পত্রিকা তুলে নিন—হয়তো যে-কোনো পত্রিকার যে-কোনো সংখ্যা হলেই হবে। দেখবেন, ফ্রয়েডীয় বক্তব্য নিয়ে কী প্রবল তুমুল উৎসাহ, কী অদ্ভুত আগ্রহে তা পাঠকদের মাথায় ঢোকাবার চেষ্টা!

ফ্রয়েড কি তাহলে জেনেশুনেও সত্যের অপলাপ করছেন? আসলে তা নয়। তাঁর আলোচনার বিরুদ্ধে এককালে সত্যিই নানা রকম প্রতিবন্ধ উঠেছিলো, আজকের দিনে তাঁর আলোচনা নিয়ে উৎসাহটা যতই মাত্রাতিরিক্ত হোক না কেন। এই প্রতিবন্ধের পক্ষে মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহে পরিণত হওয়ার ইতিহাসটা খুবই আশ্চর্য। ফ্রয়েডীয় মতবাদের ভাগ্যবিপর্যয়ের এই ইতিহাসটুকুকে ভালো করে বিচার করলে আমাদের পক্ষে স্পষ্টভাবে বোঝা সম্ভব হবে যৌনজীবনের কথা কেন নিষিদ্ধ।

ফ্রয়েডের মতে, তাঁর বলবার কথাকে ভুলে থাকতে পারলেই মানবসমাজের নিশ্চিন্ত আরাম। মনোবিকারের রোগী রোগের দরুনই একরকম আরাম পায়, এও সেই রকমই। কেননা, তিনি এমন কতকগুলি কথা আবিষ্কার করেছেন বলে দাবি করেন যা

শুধুই মানব-মনের আত্মাভিমানকে পীড়িত করে না, এমন কি মানবসমাজের বনিয়াদটুকুকেও সংকটাপন্ন করে তোলে। আত্মাভিমানটা পীড়িত হবার কথা কেন? তার কারণ, ফ্রয়েড বলছেন, মানুষের চিরন্তন অভিমান হলো সচেতন কীর্তির অভিমান; অথচ তাঁর আবিষ্কার প্রতিপন্ন করছে এই সব সচেতন কীর্তির পিছনে রয়েছে কতকগুলি অন্ধ, অচেতন এবং সামাজিকভাবে নিকৃষ্ট বাসনার তাগিদ। মানুষের অভিমান এতে আহত হবে না? ফ্রয়েড বলছেন, বিজ্ঞানের ইতিহাসে মানুষের আত্মাভিমান এর আগে আর দু'বার এইরকমভাবে আহত হয়েছিল। এক, কোপার্নিকাস্ যখন প্রমাণ করলেন আমাদের এই পৃথিবী সত্যিই সৌরজগতের কেন্দ্র নয়। আর দুই, ডারউইন যখন প্রমাণ করলেন আমাদের এই প্রজাতি আসলে একরকম বনমানুষের বংশধর। আর, মানুষের আত্মাভিমান অমন সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছিল বলেই এই দুটি মতবাদের বিরুদ্ধেও দেখা দিয়েছিল দারুণ সামাজিক প্রতিবন্ধ।

কিন্তু ফ্রয়েডীয় মতবাদের দরুন মানবসমাজের বনিয়াদটা সংকটাপন্ন হবে কেন? তার কারণ, ফ্রয়েড বলেছেন, সমাজ-সভ্যতা বলে মানুষ যা-কিছুই গড়ে তুলেছে তাই তার নিজের যৌন-চরিতার্থতাকে খর্ব করে, সঙ্কুচিত করে গড়ে তোলা। যৌন তাগিদটাই যেন ইন্ধন, এই ইন্ধন যোগান দেওয়া গিয়েছে বলেই সভ্যতার বহ্নি এমন দীপ্ত কিরণে ইতিহাসকে উদ্ভাসিত করতে পেরেছে! মানুষের সভ্যতা তো এমনি গড়ে ওঠেনি, আত্মত্যাগের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়। ফ্রয়েড মনে করেন, সভ্যতা যে বিরাট আত্মত্যাগ মানুষের কাছ থেকে দাবি করে তার অনুপাতে সভ্যতার প্রতিদানটা যৎসামান্যই। অর্থাৎ, আত্মত্যাগটা অনেকাংশে অহেতুক, অর্থহীন। আর এই কথাটা মানুষ যদি স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে শেখে তাহলে সভ্যতার বনিয়াদটুকু কেঁপে উঠবে না? তাই সভ্যতার তরফ থেকে এই মতবাদের বিরুদ্ধে অমন অভিযান।

অবশ্যই, ফ্রয়েডের মতে মানুষের আত্মাভিমান আর সমাজ-সভ্যতা সব কিছুই ইতিহাস-উত্তীর্ণ শাশ্বত ও সনাতন। যুগপরিবর্তনের সঙ্গে এর যদিই বা কোনো ইতরবিশেষে দেখা দেয়

তাহলেও তা মৌলিক নয়। অর্থাৎ বাইরের দিকে এই রদবদল যাই হোক না কেন ভিতরের চেহারাটা বরাবর একই রকম। তার মানে, ফ্রয়েডের চেতনায় ইতিহাস-বোধ-এর স্থান নেই।

এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ফ্রয়েড যখন প্রথম তাঁর মতবাদ প্রকাশ করেন তখন তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র সামাজিক নিন্দা ও আন্দোলন দেখা দিয়েছিলো। বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে অনেকদিন ধরে অনেকভাবে তাঁকে যুঝতে হয়েছে। কিন্তু তার আসল কারণ যদি এই হতো যে, তাঁর মতবাদ মানুষের আত্মাভিমানকে আহত করেছে, সংকটাপন্ন করে তুলেছে সভ্যতার বনিয়াদ, তাহলে হঠাৎ আজকের দিনে পরিস্থিতিটি এমন আশ্চর্যভাবে বদলে গেলো কেন? ইংরেজ এবং বিশেষ করে মার্কিন দেশে সাইকোএ্যানালিসিস্ নিয়ে আজ কী প্রবল প্রচণ্ড উৎসাহ! কী অজস্র অর্থব্যয়! গল্প-উপন্যাস, দৈনিক-সাপ্তাহিক থেকে শুরু করে সিনেমা-টেলিভিশন পর্যন্ত আধুনিক জগতের যতো রকম প্রচার-মাধ্যম আছে তার সাহায্যে আজ সাইকোএ্যানালিসিসের প্রচার। ফ্রয়েড তাঁর জীবদ্দশায় একবার আক্ষেপ করে লিখেছিলেন, আধুনিক সভ্যজীবন মানুষের উপর অসহ্য বোঝা চাপিয়েছে, তারই একটা কোনো প্রতিকার প্রয়োজন; এবং হয়তো কোনো একদিন সত্যিই কোনো কোটিপতি মার্কিন দাতা কোটি কোটি টাকা দান করে সমাজ-কর্মীর দলকে সাইকোএ্যানালিটিক্যাল্ কলাকৌশলে দীক্ষিত করে তুলবেন, আধুনিক জীবন যে-বিকারগ্রস্ত অবস্থা সৃষ্টি করেছে তার সঙ্গে এঁরা সংকটত্রাণ ফৌজের মতো সংগ্রাম করতে পারবেন। আজকের দিনে ফ্রয়েড যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনি নিশ্চিতই দেখতে পেতেন কোনো নির্দিষ্ট মার্কিন দাতা-মহারাজের প্রত্যক্ষ দান হিসেবে না হলেও মার্কিন দেশে সত্যিই সাইকোএ্যানালিসিসের পিছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করবারই আয়োজন হয়েছে। কিন্তু ইতিহাস যেন পরিহাস-রসিক; তাই আজকের এই উৎসাহের উদ্দেশ্য আধুনিক জীবনের গ্লানি হাল্কা করা নয়, তার বদলে আধুনিক সমাজব্যবস্থাকেই—অতএব এই গ্লানিকেই—টিকিয়ে রাখবার ব্যর্থ প্রয়াস।

তাহলে ফ্রয়েড যাকে সাইকোএ্যানালিসিসের বিরুদ্ধে মূল

প্রতিবন্ধের বৃহৎ সামাজিক বিকাশ বলে বর্ণনা করছেন তার কী হলো? সত্যিই কি কোনো রকম আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ ওই প্রতিবন্ধের জাত-বদল করে ওকে প্রবল উৎসাহে পরিণত করেছে? কিন্তু তা তো আর বাস্তবিক সম্ভব নয়। যে-মতবাদ ফ্রয়েডের মতে মানুষের আত্মাভিমানকে নির্মমভাবে আহত করে, আজকের ক্ষয়িষ্ণু পৃথিবীতে সেই মতবাদই মানুষের কাছে এমন প্রিয় হয়ে উঠলো কী করে? যে-মতবাদ ফ্রয়েডের মতে সমাজের বনিয়াদটাকেই সংকটাপন্ন করে তোলে তাকেই আজকের ক্ষয়িষ্ণু সমাজ আঁকড়ে ধরছে কেন?

তার মানে কি এই যে, সমাজের পক্ষ থেকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিরুদ্ধে বাধা ওঠবার কথাটাই কল্পনা? সামাজিক প্রতিবন্ধের কথাটাই কি মিথ্যে? নিশ্চয়ই নয়, যদিও সমাজ বলতে একটা সনাতন ও অন্তর্দ্বন্দ্বহীন কিছু বুঝতে গেলে এই সামাজিক প্রতিবন্ধের কথাটা আগাগোড়াই কাল্পনিক হয়ে দাঁড়ায়। কোপার্নিকাস্, গ্যালিলিও, ডারউইন, মার্কস্—এঁদের সবাইকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিরুদ্ধেই সামাজিকভাবে তীব্র ও তুমুল আপত্তি উঠেছে। বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে বই কি। কিন্তু এই বিক্ষোভের উৎস ঠিক কোথায়? পুরো সমাজটা? নিশ্চয়ই নয়। মানুষের সনাতন আত্মাভিমান? তাও নয়। তাহলে?

আসলে, কোনো একটা বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখবার ব্যাপারে যে-শ্রেণীর স্বার্থ সেই শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে কোনো বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার বা দার্শনিক মতবাদ যখন সংঘাত সৃষ্টি করে তখনই সেই শ্রেণীর স্বার্থই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বা দার্শনিক মতবাদের বিরুদ্ধে তীব্র বাধা সৃষ্টি করে। এই কথার মূল তাৎপর্যগুলি একে একে দেখা যাক। প্রথমত, সমাজ-ব্যবস্থা সনাতন বা শাশ্বত কিছু নয়। যুগে যুগে মানব-সমাজে মৌলিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, পুরো সমাজটা অন্তর্দ্বন্দ্বহীন সমজাতীয় সংগঠন নয়। সভ্য সমাজ শুরু হবার মুখোমুখি সময় থেকে ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত বিকাশ পর্যন্ত সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থার মূলেই অন্তর্দ্বন্দ্ব। সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের নাম শ্রেণীসংগ্রাম—শোষক আর

শোষিতের মধ্যে সংগ্রাম, শাসক আর শাসিতের মধ্যে সংগ্রাম। তৃতীয়ত, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও দার্শনিক মতবাদ বিশুদ্ধ, নির্লিপ্ত ও নৈর্ব্যক্তিক কিছু নয়, শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে এগুলির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। অর্থাৎ কোনো আবিষ্কার বা মতবাদ একটা বিশেষ সমাজের শোষক-শাসক শ্রেণীর স্বপক্ষেও যেতে পারে আবার বিপক্ষেও যেতে পারে। আর চতুর্থত, যে-মতবাদ বা যে-আবিষ্কার সামাজিকভাবে যে-শ্রেণীর স্বার্থে আসে সেই শ্রেণী ওই মতবাদকে সমর্থন করে, যে-শ্রেণীর বিরুদ্ধে যায় সেই শ্রেণী এর বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টি করে।

ফ্রয়েড নিজে কোপার্নিকাস আর ডারউইনের কথা উল্লেখ করেছেন। চমৎকার দৃষ্টান্ত, সন্দেহ নেই। কিন্তু কথা হলো, দৃষ্টান্ত দুটির তাৎপর্য কি সত্যিই তাঁর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে? এ'-দুটিকে বিশ্লেষণ করা যাক। কোপার্নিকাসের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি। কিন্তু কোন্ সমাজের, কোন্ শ্রেণীর পক্ষ থেকে আপত্তি? কেন আপত্তি? য়ুরোপের সামন্ত যুগটার শেষাশেষি যে-অবস্থা তার পটভূমি মনে না রাখলে এ-আপত্তির তাৎপর্য বোঝা সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে, তখনকার দিনে সামন্ত আর পাদ্রী শ্রেণীর কথা। তারাই শোষক, তারাই শাসক আর তাদের শাসনের একটা প্রধান অস্ত্র হলো ধর্মমোহ। সেই ধর্মমোহের বিরুদ্ধে কোপার্নিকাসের আবিষ্কার তীব্র আঘাত এনেছিলো। কিন্তু সমাজ বদলালো, শেষ হলো জমিদার-পাদ্রীদের শোষণশাসন আর সেই সঙ্গে শেষ হলো কোপার্নিকাসের বিরুদ্ধে ওই তীব্র বিদ্বেষ। কেননা, নতুন যে-শ্রেণী প্রভুর আসনে বসলো তার স্বার্থের সঙ্গে কোপার্নিকাসের ওই আবিষ্কারের সংঘর্ষ নেই। মানবাত্মার সনাতন অভিমানই যদি ক্ষুন্ন করে থাকে তাহলে আজকের দিনে কোপার্নিকাসের আবিষ্কার আমাদের সহজ বুদ্ধিতে পরিণত হলো কী করে? আমাদের এই পৃথিবী যে সত্যিই সৌরজগতের কেন্দ্র নয়, সূর্যের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে,— এ-কথায় আত্মাভিমান আহত হবার কোনো সম্ভাবনা কল্পনা করাই আমাদের পক্ষে আজ রীতিমতো কঠিন। কিন্তু তখনকার দিনের ধর্মমোহের সঙ্গে এ-কথার যে কী তীব্র সংঘর্ষ তা সামান্যমাত্র

ঐতিহাসিক চেতনার বলে আমাদের পক্ষে অনুমান করা কঠিন নয়। ডারউইনের বেলাতেও একই কথা। কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে তাঁর আবিষ্কারের যতখানি বিরোধ, কায়েমী স্বার্থ সামাজিকভাবে তাঁর আবিষ্কারের বিরুদ্ধে ঠিক ততখানিই প্রতিবন্ধ প্রকাশ করেছে। ডারউইনের বিরুদ্ধেও সবচেয়ে প্রবল আপত্তি রক্ষণশীল শ্রেণীর পক্ষ থেকে, কেননা ডারউইনের আবিষ্কার এই রক্ষণশীল শ্রেণীর স্বার্থকেই আহত করেছে। সৃষ্টিতত্ত্বের সনাতন এক উপাখ্যানের সঙ্গে রক্ষণশীল শ্রেণীর স্বার্থ স্পষ্টই সংযুক্ত। তাছাড়া ডারউইনের দৃষ্টান্তে আরও একটা কথা লক্ষ্য করা দরকার। তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে মিশে রয়েছে পুঁজিবাদী নীতিকথার বিজ্ঞানম্মন্য নির্লজ্জ প্রচারক ম্যালথাসের মতবাদ—তথাকথিত বাঁচবার খাতিরে আত্মীয়বধের নীতি। এবং পুঁজিবাদী সভ্যতার পরমায়ু যতই ফুরিয়ে আসছে ততই পুঁজিবাদী পৃথিবী ডারউইনের আসল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারটুকুর উপর থেকে ঝোঁক সরিয়ে (কেননা এ-আবিষ্কার শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদকেও সম্মান করতে পারে না) ওই অবৈজ্ঞানিক কল্পনার উপরই গুরুত্ব আরোপণের আয়োজন করে: সক্ষমের জয় আর অক্ষমের পরাজয়।

ফ্রয়েড নিজের সঙ্গে ডারউইন আর কোপার্নিকাসের তুলনা করছেন। এই তুলনার মধ্যে বাহুল্য থাকলেও এর ভিত্তিতে কোনো সত্য নেই মনে করাও ঠিক হবে না। তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে, ফ্রয়েডের মতবাদও বিজ্ঞানের ইতিহাসে কোপার্নিকাস আর ডারউইনের মতোই যুগান্তর এনেছে। তার মানে এও নয় যে,—ফ্রয়েড নিজে যে-রকম কল্পনা করছেন,—তাঁর মতবাদও মানবাত্মার সনাতন আত্মাভিমানকে একইভাবে আহত করেছে বলেই সমজাতীয় প্রতিবন্ধের মুখোমুখি হতে বাধ্য হয়েছে। তার আসল তাৎপর্য এই-ই যে ফ্রয়েড প্রথম যখন তাঁর মতবাদ প্রকাশ করেছিলেন তখন সে মতবাদও একদিক থেকে শাসকশ্রেণীর স্বার্থের বিরোধিতা করেছিল আর সেই জন্যেই সামাজিকভাবে ফ্রয়েডীয় মতবাদের বিরুদ্ধে নানান রকম বাধাবিপত্তি সৃষ্টি হয়েছিলো। কী ভাবে তাই দেখা যাক।

মনে রাখতে হবে, সে-সময়ে ফ্রয়েডীয় মতবাদের মূল কথা ছিল 'ব্যক্তিগত যৌন-প্রণয়ের' দাবি, যৌন জীবনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। এবং এঙ্গেলস্ দেখাচ্ছেন, এই দাবি ধনতান্ত্রিক সভ্যতারই অবদান, ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আগে পর্যন্ত এ-দাবি তোলবার মতো বাস্তব পরিস্থিতি মানুষের ইতিহাসে দেখা দেয়নি। য়ুরোপীয় সামন্ত যুগেও নয়। যে-যুগে মানুষের যৌন-সম্পর্ককে একেবারে অন্য চোখে দেখবার চেষ্টা হয়েছে। তাছাড়া, যে-সমাজে যে-যুগে ফ্রয়েডের মতবাদ দানা বাঁধছে সেই সমাজে, সেই যুগে, য়ুরোপীয় সামন্ত সভ্যতার সমস্ত চিহ্নই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। ১৮৭০-৭৫-এর অস্ট্রিয়া—তখনও সেখানে সামন্ততন্ত্রের স্পষ্ট রেশ থেকে গিয়েছে। ফ্রয়েডের মতবাদ তাই এই দিক থেকে কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতা করেছে আর প্রত্যুত্তরে কায়েমী স্বার্থের কাছ থেকে বিরোধিতাও পেয়েছে। অর্থাৎ, তিনি ধনতান্ত্রিক শ্রেণীর নানান দাবির মধ্যে একটা দাবি তুলেছিলেন বলেই সেই যুগে ধনতন্ত্র-বিরোধী রক্ষণশীল শ্রেণী তাঁর বিরুদ্ধে নানান রকম বাধাবিপত্তি সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সমাজ-সচেতন দৃষ্টিতে সেই বাধাবিপত্তির বিশ্লেষণ না করে, বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন এক "বিশুদ্ধ" মনস্তত্ত্ব দিয়ে এর ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে ফ্রয়েড তাঁর ওই আধা-রহস্যময় 'প্রতিবন্ধ'-র মতবাদ সৃষ্টি করলেন।

এইখানে একটা কথা খুব স্পষ্টভাবে মনে রাখা দরকার। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের তুলনায় ধনতন্ত্রের ওই আওয়াজ—যৌন মুক্তির দাবি, ব্যক্তিগত যৌন প্রণয়ের দাবি—অনেক প্রগতিশীল। কিন্তু এই প্রগতিও আপেক্ষিক, চরম প্রগতি নয়। কেননা, সামন্ততন্ত্রের তুলনায় ধনতন্ত্র স্বর্গ হলেও সমাজতন্ত্রের তুলনায় নরকই। যৌন সম্পর্কের বেলাতেও একই কথা। মনে রাখা দরকার, মতবাদ এবং প্রয়োগ উভয় দিক থেকেই যৌন মুক্তির এই ধনতান্ত্রিক বা ফ্রয়েডীয় সংস্করণটির মধ্যে ফাঁকি আছে। মতবাদের দিক থেকে ফাঁকি কেন, তার আলোচনা একটু পরেই তুলবো। তার আগে প্রয়োগের দিক থেকে ফাঁকির দিকটা আলোচনা করা যাক। জার্মান বৈপ্লবিক আন্দোলনের একটা যুগে তরুণ সমাজতান্ত্রিকদের মনে ফ্রয়েডীয় মতবাদের এই কথাটা

একরকম মোহ সৃষ্টি করেছিল, এবং সমাজবাস্তবকে পরিবর্তন করার চেয়ে—যে-পরিবর্তন না হলে প্রকৃত যৌন মুক্তির কথা শেষ পর্যন্ত আকাশকুসুমের মতো অলীক হয়েই থাকবে—তাঁরা নিছক এই যৌন মুক্তির আদর্শের উপাসক হতে চাইলেন। ফলে তাঁদের ব্যবহারিক জীবনে দেখা দিয়েছিল যৌন অরাজকতার সম্ভাবনা—এ্যানার্কিস্‌ম্। এবং এ-বিষয়ে লেনিনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে তিনি এর অত্যন্ত কঠোর সমালোচনা করেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদে সে-কথা আলোচনা করবো।

আসলে, ধনতন্ত্র মানুষের সামনে যে-সব রঙিন প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছিলো ধনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে সেগুলির বাস্তব বিফলতা অনিবার্য আর অত্যন্ত করুণ। ব্যক্তিগত যৌন মুক্তি সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই। যৌন মুক্তির ওই দাবি বাস্তব সমাজে অবারিত গণিকা-প্রথার গ্লানিতে পর্যবসিত। এঙ্গেল্‌স্ দেখাচ্ছেন, এর আসল কারণ হলো প্রকৃত যৌন মুক্তির জন্যে যে সামাজিক প্রস্তুতি প্রয়োজন ধনতান্ত্রিক সভ্যতার কাঠামোর মধ্যে তা সফল হওয়া সম্ভব নয়। সামাজিক প্রস্তুতিটা হলো, মেয়েদের মধ্যে সামাজিক শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা, সমাজে স্ত্রী-পুরুষের সাম্য সৃষ্টি করা। সামন্ততন্ত্রের আবহাওয়ায় এ-কথা সম্ভাবনা হিসেবেও দেখা দেয়নি, ধনতন্ত্রের যুগেই সম্ভাবনা হিসেবে তা প্রথম দেখা দিলো। কিন্তু এই সম্ভাবনাকে সত্যিই বাস্তবে পরিণত করতে গেলে ধনতন্ত্রের ভিত্তিই সংকটাপন্ন হয়। তাই যৌন মুক্তির যে-আদর্শ ধনতন্ত্রের যুগে প্রথম শোনা গেলো ধনতান্ত্রিক সমাজ-বাস্তবে তারই অনিবার্য অবমাননা হতে বাধ্য।

এই হলো এঙ্গেল্‌স্-এর বিশ্লেষণ : যৌন মুক্তির আদর্শ পুঁজিবাদী সভ্যতারই আদর্শ অথচ এই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করবার যে অনিবার্য শর্ত—স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সামাজিক সাম্যের প্রবর্তন—তা ওই ধনতান্ত্রিক সমাজের কাঠামোকেই সংকটাপন্ন করতে চায়।

কিন্তু ফ্রয়েড প্রসঙ্গে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে না। কেননা ফ্রয়েডীয় মতবাদ যে ধনতান্ত্রিক স্বার্থের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে

জড়িত তার পক্ষে আরও একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ফ্রয়েড শুধুই যৌন মুক্তির দাবি তোলেন নি, ধনতান্ত্রিক স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই আপাত-বৈজ্ঞানিক মন্তব্য হিসেবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, মেয়েরা সত্যিই ছোটো, পুরুষের সঙ্গে সমানে সমান হতেই পারে না। প্রমাণ? ফ্রয়েড বলছেন, পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের মধ্যে sublimation বা উৎগতির শক্তি অনেক কম। তাছাড়া, নারীচরিত্রের একটি সার্বভৌম লক্ষণ হিসেবে তিনি তাঁর বিখ্যাত penis-envy বা 'লিঙ্গ-ঈর্ষা'-র মতবাদ পেশ করেছেন। এই মতবাদের মূল কথা হলো, পুরুষ-জনন-অঙ্গের অনুরূপ একটি অঙ্গ দেহে নেই বলে নারীজাতি মনে-প্রাণে নিজেকে পুরুষের তুলনায় হীন ও হেয় জ্ঞান করে এবং যদিই বা কোনো মেয়ে রোখ করে পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিতে যায় তাহলে বুঝতে হবে তার এই ব্যবহারটা আসলে ওই হেয়বোধের গ্লানি থেকে আত্মরক্ষার প্রয়াস মাত্র (defense reaction)। সাধারণ পাঠকের সহজ বুদ্ধির কাছে এই মন্তব্য হয়তো আষাঢ়ে গল্পের মতো মনে হবে; কিন্তু আধুনিক সাইকোঅ্যানালিটিক্যাল সাহিত্যের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন এই মতবাদটিকেই ফ্রয়েড্-পন্থীরা ধ্রুব সত্য মনে করেন। আপাতত, সে-আলোচনার খুঁটিনাটি উল্লেখ করবার অবকাশ নেই; কিন্তু সমাজ-সচেতন ব্যক্তি স্বীকার করবেন, পুরুষ-প্রধান সমাজব্যবস্থার সমর্থনে এমন অভিনব যুক্তি আর কখনো প্রচার করা হয়েছে কিনা তা অত্যন্ত সন্দেহের কথা।

ধনতান্ত্রিক সমাজের দুটো দিকের কথাই মনে রাখা দরকার: সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে যৌন মুক্তির দাবি আবার সমাজতান্ত্রিক দাবির বিরুদ্ধে মেয়েদের হেয় ও হীনপ্রতিপন্ন করবার উৎসাহ। এই দুটো কথা স্পষ্টভাবে মনে রাখলে ফ্রয়েড-বাদের সঙ্গে পুঁজিবাদী সভ্যতার মূল দাবির সঙ্গতি দেখতে পাওয়া অসুবিধে হবে না। 'প্রতিবন্ধ' নাম দিয়ে তিনি যে-কথা বলছেন তার আসল তাৎপর্যটুকুও এই দিক থেকেই বুঝতে পারা যাবে: সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ এককালে তাঁর বিরুদ্ধে বাধা-আপত্তি তুলেছিলো। কোনো রকম

নির্জ্ঞান রহস্যের কথা বলে ওই 'প্রতিবন্ধ'র ব্যাখ্যা করবার দরকার নেই। আর তাই আধুনিক যুগের মুমূর্ষু ধনতন্ত্র কেন ফ্রয়েডবাদ নিয়ে মেতে উঠেছে তার ব্যাখ্যাও কঠিন নয়। ফ্রয়েডবাদী আর্নস্ট জোন্স যেন প্রায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলেছেন, বিজ্ঞানের বিপক্ষে মানুষের সংস্কার দিনের পর দিন দুর্বল হয়ে আসছে। তার মানে, মানুষ কি বিজ্ঞানের জন্মশত্রু? কথাটা নিশ্চয়ই স্বীকার যোগ্য নয়। কেননা বিজ্ঞান গ্রহান্তর থেকে আমদানি নয়, মানুষেরই সৃষ্টি। মানুষ কেন বিজ্ঞানের জন্মশত্রু হবে? তা যদি হতো তাহলে মানুষ হাজার বছর ধরে অমন অক্লান্ত পরিশ্রম আর স্বার্থত্যাগ সহ্য করে বিজ্ঞানকে গড়ে তুললো কেন? বিজ্ঞানই মানুষের পরম সুহৃৎ, মানুষকে মুক্তির পথ দেখায়। কোনো বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থের বিরোধিতা করলে পরই সেই শ্রেণী বিজ্ঞানের শত্রু হতে পারে, কিন্তু সমস্ত মানুষ সম্বন্ধে এমন কোনো কথা বলা নিশ্চয়ই যায় না।

ফ্রয়েডের ওই তথাকথিত 'প্রতিবন্ধ'র কথা বিচার করতে হলে আরও একটি প্রশ্ন তোলা দরকার: আজকের পৃথিবীতে যে-সব দেশে মুমূর্ষু ধনতন্ত্রের বাঁচবার প্রচেষ্টা সেইসব দেশগুলিতেই ফ্রয়েডীয় মতবাদ নিয়ে আজ এমন মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহ কেন? অপরপক্ষে ধনতন্ত্রের নাগপাশ থেকে সে-সব দেশ মুক্তি পেয়েছে সেই সব দেশে তো এ-আগ্রহের পরিচয় নেই। কোনো রকম নির্জ্ঞান রহস্যের কথা তুলে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া চলে না। উত্তরটা আসলে সমাজতন্ত্রের কাছ থেকেই পাওয়া সম্ভব: ফ্রয়েডীয় মতবাদ ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সঙ্গে জড়িত, তাই সামন্ত-তন্ত্রের পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে এককালে যে-রকম আপত্তি উঠেছিল আজকের দিনে মুমূর্ষু ধনতন্ত্র সমাজতন্ত্র-বিরুদ্ধ সংগ্রামে তার চেয়েও বেশি আগ্রহে এই মতবাদটির উপর নির্ভর করতে চায়।

ফ্রয়েডীয় মতবাদের সমর্থনে মুমূর্ষু ধনতন্ত্রের 'প্রতিবন্ধ'র বদলে মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহই। অবশ্য মনে রাখতে হবে, ফ্রয়েডীয় মতবাদের পক্ষ থেকে এই উৎসাহের প্রত্যুত্তরে একরকম কৃতজ্ঞতাও দিনের পর দিন প্রকাশ পেয়েছে। যৌন মুক্তির ওই পুরনো দাবির বদলে ফ্রয়েডবাদ দিনের পর দিন এমন সব নতুন ধরনের মতবাদ

সৃষ্টি করেছে যাতে এই মুমূর্ষু সভ্যতার অনেক প্রত্যক্ষ লাভ। অর্থাৎ, ফ্রয়েডীয় শ্লোগানগুলিরও ইতিহাস আছে। প্রথমে ছিল যৌন মুক্তির শ্লোগান। কিন্তু সে সময়ে এই শ্লোগান ধনতান্ত্রিক সভ্যতার পক্ষে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে যতই সুবিধে সৃষ্টি করুক না কেন কিছুদিন পরেই দেখা গেল এই শ্লোগানের উপরই খুব বেশি জোর দিতে গেলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আশঙ্কা আছে। ফ্রয়েডীয় মতবাদের শ্লোগান তাই বদলালো: Sense of guilt বা 'পাপবোধে'র উপর ঝোঁক, আর তারপর Aggression বা জিঘাংসার উপর ঝোঁক। এই 'পাপবোধ' এবং 'জিঘাংসাবৃত্তির' কথা মুমূর্ষু ধনতান্ত্রিক সভ্যতার পক্ষে লাভজনক। পাপবোধের কথায় সংগ্রামী মানুষের মন স্তিমিত হয়, জিঘাংসাবৃত্তির কথা বলে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সমর্থন করা যায়। তারপর আরও আছে: death-instinct বা মরণবৃত্তির কথাও। মানুষ যে শুধুই খুন করতে চায় তাই নয়, মরতেও চায়। ফ্রয়েডের কল্পনাশক্তি সত্যিই বিস্ময়কর: এই মরণবৃত্তির কথাটা ব্যাখ্যা করে তিনি বলছেন, এ যেন পঞ্চভূতের পিছটান। শেষ পর্যন্ত পঞ্চভূত থেকেই তো মানুষের উৎপত্তি, আমাদের মনের কোণায় এই পঞ্চভূতের দিকে ফিরে যাবার একটা আকর্ষণ থাকা আর বিচিত্র কী? জন্মাদস্য যতঃ। অথচ, এই মরণবৃত্তির মহিমা শুনিয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে কামানের খোরাক সংগ্রহ করাও সহজসাধ্য।

তার মানে, ওই তথাকথিত প্রতিবন্ধের বদলে ফ্রয়েডীয় মতবাদের কপালে যতই রাজসম্মান জুটেছে ফ্রয়েডবাদও ততই পুরনো কালের দাবি ভুলে এমন নতুন নতুন দাবি তুলতে শুরু করেছে যার দরুন এই মুমূর্ষু সমাজটার লাভ প্রত্যক্ষ। ফ্রয়েডবাদের কথা আর এই ধনতান্ত্রিক সভ্যতার কথা তাই আলাদা করে দেখা চলে না।

. .

এই আলোচনার পটভূমিতে আমাদের দেশে বর্তমানে যৌন-জীবন সম্বন্ধে চলতি দৃষ্টিভঙ্গিকে বিচার করা সম্ভব।

বিদেশীর তাঁবে আমাদের দিন কেটেছে। এক-আধ দিন নয়। অনেক দিন। আর তাই, আমাদের বাজারে বিদেশী পণ্যের মতোই আমাদের মনেও অনেকরকম বিদেশী মতবাদের আমদানি। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, উন্নততর সভ্যতার অবদান বলেই এই জাতীয় মতবাদের মধ্যে অনেকগুলিই সত্যিই উন্নততর। যেগুলি সত্যিই উন্নত সেগুলি নিশ্চয়ই স্বীকার্য। অর্থাৎ মতবাদের-ক্ষেত্রেও খাঁটি স্বদেশী ছাড়া আর কোনো দৃষ্টিভঙ্গিই স্বীকার্য নয়—এমন কথা প্রকৃত স্বদেশ-প্রীতির পরিচয় হবে না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে একটা সহজ নমুনা নেওয়া যায়: পাস্তুরের আবিষ্কারের সঙ্গে চরক বা সুশ্রুতের কথা খাপ খায় না, কিন্তু বিদেশী বলেই যদি পাস্তুরকে বর্জন করতে হয় এবং স্বদেশী বলেই যদি শুধুমাত্র চরক সুশ্রুতকে স্বীকার করতে হয় তাহলে আজ আর দেশের রাস্তা থেকে মড়া সরাবার লোক পাওয়া যাবে না। তাই ওটা সত্যিকারের স্বদেশ-প্রীতির পরিচয়ও হবে না।

আবার সেই সঙ্গেই মনে রাখতে হবে যে, বিদেশ থেকে আমদানি হয়েছে, উন্নততর সমাজব্যবস্থা থেকে আমদানি হয়েছে,—নিছক এইটুকু পরিচয়ের জোরেই কোনো দৃষ্টিভঙ্গি স্বীকার্য হতে পারে না। কেননা, শোষকের দেশ থেকে রপ্তানি বলেই এ-জাতীয় অনেক দৃষ্টিভঙ্গির মূলে শোষণের কূট অভিসন্ধি থাকাও অসম্ভব নয়।

ফলে, স্বদেশী-না-বিদেশী—এই বিচারের ভিত্তিতে কোনো একটা মতবাদকে যাচাই করতে গেলে ভুল হবার ভয়। বিচার করতে হবে নির্মল বুদ্ধির আলোয়, বাস্তব পরিণামের দিক থেকে। সে-বিচারের ফলে ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে, জীবন-দর্শনের আলোচনায়, যে-রকম বিদেশী-বর্জনের প্রয়োজন হতে পারে সেই রকমই প্রয়োজন হতে পারে স্বদেশী বর্জনেরও। দুই-ই স্বদেশ-প্রীতির পরিচায়ক।

স্বদেশ-প্রীতির প্রয়োজনে স্বদেশী-বর্জনের প্রসঙ্গটা হয়তো খাপছাড়া শোনাতে পারে। বরং বিদেশীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমরা এই কথাটাই শুনতে অভ্যস্ত হয়েছি যে, অন্তত ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে, সত্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে, আমাদের দেশের প্রাচীন গৌরব অতুলনীয়। তাই নেহাত অস্ত্রবলে ইংরেজ প্রভুরা আমাদের যে পদানত করে

রেখেছে সেটা শুধুই এক সাময়িক বিপর্যয়। এতো বড়ো মহান জাতিকে এইভাবে পদানত করে রাখা চলবে না।

'হে ভারত, ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ—সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী....'

কথাটা ঠিক, কিন্তু ঠিক নয়ও। ঠিক এই দিক থেকে যে, আমাদের দেশে প্রাচীন সভ্যতার গৌরব অতি অপরূপ, মহান আমাদের ঐতিহ্য, বিপুল বিরাট আমাদের ভবিষ্যৎ! কিন্তু সেই ঐতিহ্য বলতে ঠিক কী বোঝায়? তা কি শুধুই অধ্যাত্মবাদ, জাতিভেদ, সতীদাহপ্রথা? নিশ্চয়ই নয়। সুতরাং সেদিক থেকে কথাটা ভুল। আর ভুল এই কারণে যে, প্রাচীন যুগের আধ্যাত্মিক গৌরবটুকুকে সম্বল করে বাঁচবার চেষ্টাটা শেষ পর্যন্ত অতীতের শৃঙ্খলে মানুষের মনকে বেঁধে রাখবারই আয়োজন। দেশের প্রচীন চিন্তাচেতনাকে আঁকড়ে ধরে থাকবার চেষ্টাটা প্রাচীন যুগে টিকে থাকবার চেষ্টাই।

আসলে, ধ্যানধারণা বা চিন্তা-চেতনা সত্যিই আকাশ থেকে পড়ে না। এগুলির মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয় দেশের বাস্তব অবস্থা। বাস্তব অবস্থাটা যদি পিছিয়ে-পড়া অবস্থাই হয় তাহলে তার প্রতিবিম্ব যে-সব ধ্যানধারণায় সেগুলিও পিছিয়ে পড়া হতে বাধ্য। নির্বিচারে সেগুলিকে আঁকড়ে পড়ে থাকবার চেষ্টাটা তাই প্রতিক্রিয়াশীল। কেননা ধ্যানধারণাগুলি বাস্তব অবস্থার প্রতিবিম্ব হওয়া সত্ত্বেও বাস্তব অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করবার কাজেও এগুলির উপযোগিতা কম নয়। তাই, অনুন্নত অবস্থাকে পিছনে ফেলে উন্নততর অবস্থার দিকে এগিয়ে যেতে হলে চিন্তা-চেতনাকেও সংস্কার করবার প্রয়োজন। আর তার মানেই, নিজের দেশের হলেও অনেক রকম পুরোনো ধারণা মন থেকে বর্জন করবার দরকার পড়ে। স্বদেশ-প্রীতির জন্যই স্বদেশী বর্জন বলতে শুধু এইটুকুই বোঝাতে চেয়েছি। যে-সব পুরোনো সংস্কার আমাদের পঙ্গু ও অক্ষম করে রাখতে চায় সেগুলির প্রতি সহিষ্ণুতায় স্বদেশ-প্রীতির পরিচয় কোথায়?

আমাদের প্রতিবেশী দেশ—চীন, মহাচীন। তার অভিজ্ঞতাটা কোন ধরনের? আমাদেরই মতো অনেক শতাব্দী ধরে পিছিয়ে-পড়া অবস্থা, অনেক শতাব্দী ধরে অন্ধ সংস্কারের ঘোরে আচ্ছন্ন তাদের আকাশ-বাতাস: সেই চীন আজ জেগে উঠেছে আর মাত্র কয়েকটা বছরের মধ্যেই যেন পেরিয়ে যেতে চাইছে অনেক শতাব্দীর পথ! এমনই অবিশ্বাস্য তার অগ্রগতির কাহিনী।

এই অগ্রগতির জন্যে দেশের পুরোনো নানান ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হয়েছে। চীনের ভূমিব্যবস্থা-সংস্কারের কাহিনী আধুনিক ইতিহাসের এক অতি-বড় বিস্ময়। কিন্তু শুধু ভূমিসংস্কারই নয়। বহু যুগের পুরোনো বিবাহ-বিধিকেও সম্পূর্ণভাবে বদল করবার আয়োজনও। বিবাহ-বিধির এই সংস্কারের তাৎপর্যকে ওরাই আধুনিক ভূমিসংস্কারের সঙ্গে তুলনা করে।

সেই সঙ্গে, মানুষের চেতনাকে, ধ্যান-ধারণাকে, চিন্তাকে আমূল সংস্কৃত করবার জন্যে সচেতন, সুপরিকল্পিত চেষ্টাও। তাই ওদের দেশে চিন্তা-সংস্কার আন্দোলন: 'থট্‌ রিফর্ম মুভমেণ্ট'। এখানে, শুধুমাত্র একটা নমুনা উল্লেখ করা সম্ভব; এই চিন্তাসংস্কার আন্দোলনে ওরা কী অদ্ভুত বাস্তব-বোধের পরিচয় দিয়েছে তার আভাস পাওয়া যাবে। আমাদের দেশের মতোই ওদের দেশেও বহুদিন ধরে প্রচলিত ছিলো মামুলি পঞ্জিকা। এবং আমাদের দেশের মতোই বহু যুগ ধরে বহু কোটি মানুষের উপর এই পঞ্জিকারই বিপুল, গভীর প্রভাব ছিলো। মনে রাখবেন, আমাদের দেশে যে-ঘরে আর কোনো পুঁথি নেই সেই ঘরেও একখানা পাঁজি খুঁজে পাওয়া যায়, যে-গ্রামে আর কোনো পুঁথি নেই সেই গ্রামে অন্তত একটা পঞ্জিকা আছে নিশ্চয়ই। ওদের অবস্থাও এই রকমই ছিলো। অথচ ওরা দেখলো, অন্ধকারের বাহন এই পঞ্জিকা—কুসংস্কারের বোঝা চাপিয়ে এই পঞ্জিকা কোটি কোটি মানুষের মনকে পঙ্গু ও অকর্মণ্য করে রাখতে চায়। তাই ওরা ঠিক করলো পাঁজিকে সংস্কার করতে হবে। কিন্তু তাই বলে তো আর দেশের লোকের অনেক কালের পুরোনো অভ্যাসটা রাতারাতি পাল্টে দেওয়া যায় না। তাই ওদের নতুন পাঁজিতে ছবি আর ছড়া, এমন কি

ছাপা আর বাঁধাই পর্যন্ত—এক কথায় চেহারাটা আর কথা বলবার ঢংটা একেবারে মামুলি কালের মতোই রইলো। কেবল বলবার কথাটা নতুন: কৃষি বিজ্ঞান, মাতৃমঙ্গল, ইত্যাদি—এক কথায় আধুনিক বিজ্ঞানের কথাই। কোটি মানুষের কাছে যে-পাঁজি এক ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ, সেই পাঁজিই বাহক হলো পুরোনো অজ্ঞানের বদলে আধুনিক বিজ্ঞানের: এই হলো, চিন্তাসংস্কার আন্দোলনের একটি নমুনা।

মহাচীনের মহান অভিজ্ঞতা,—দুর্লভ সম্পদ আমাদের। আমাদেরও তাই এগোতে হবে এই পথ ধরেই। দেশের অতীত সংস্কারের অনেকখানিই আজ আমাদের এগোতে দিতে চাইবে না। পিছন দিক থেকে টেনে রাখতে চাইবে। কঠোরভাবে বর্জন করতে হবে সেগুলিকে। সেগুলির উপর নীতিবাক্যের নামাবলী ঢাকা রয়েছে দেখেই ভক্তিভরে সেগুলি সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ হয়ে থাকা চলবে না। আর, অপর দিকে, শোষকের দেশ থেকে আমদানি রং-চং-এ অসত্যকেও স্পষ্টভাবে চিনতে হবে, —মুক্তিসংগ্রামের পথ থেকে সরিয়ে, পথ-ভুলিয়ে এগুলি আমাদের কোন সর্বনাশের গহ্বরে নিয়ে যেতে চায় তাও মনে রাখতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন,

"রাশিয়ায় যখন যাত্রা করলুম খুব বেশি আশা করিনি। কেননা কতটা সাধ্য এবং অসাধ্য তার আদর্শ ব্রিটিশ ভারতবর্ষ থেকেই আমি পেয়েছি। ভারতের উন্নতি সাধনের দুরূহতা যে কত বেশি সে কথা স্বয়ং খৃষ্টান পাদ্রি টমসন অতি করুণ স্বরে সমস্ত পৃথিবীর কাছে জানিয়েছেন। আমাকেও মানতে হয়েছে দুরূহতা আছে বই কি, নইলে আমাদের এমন দশা হবেই বা কেন? একটা কথা আমার জানা ছিল, রাশিয়ায় প্রজাসাধারণের উন্নতিবিধান ভারতবর্ষের চেয়ে বেশি দুরূহ বই কম নয়। প্রথমত এখানকার সমাজে যারা ভদ্রেতর শ্রেণীতে ছিল আমাদের দেশের সেই শ্রেণীর লোকের মতোই তাদের অন্তর বাহিরের অবস্থা। সেই রকমেই

নিরক্ষর নিরুপায়, পূজা অর্চনা দিনক্ষণ তাগাতাবিজে বুদ্ধিশুদ্ধি সমস্ত চাপাপড়া, উপরিওয়ালাদের পায়ের ধুলোতে মলিন তাদের আত্মসম্মান, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের সুযোগ সুবিধা তারা কিছুই পায়নি, প্রপিতামহদের ভূতে পাওয়া তাদের ভাগ্য, সেই ভূত তাদের বেঁধে রেখেছে হাজার বছরের আগেকার অচল খোঁটায়....

"অতএব রাশিয়ায় গিয়ে বেশি কিছু দেখতে পাবো এমন আশা করা অন্যায় হতো। কী-ই বা জানি কী-ই বা দেখেছি যাতে আমাদের আশার জোর বেশি হতে পারে! আমাদের দুঃখী দেশে লালিত দুর্বল আশা নিয়েই রাশিয়ায় গিয়েছিলুম। গিয়ে যা দেখলুম তাতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি....

"শোনা যায় য়ুরোপের কোনো কোনো তীর্থস্থানে দৈবকৃপায় চিরপঙ্গু তার লাঠি ফেলে এসেছে, এখানে তাই হলো; দেখতে দেখতে খুঁড়িয়ে চলবার লাঠি দিয়ে এরা ছুটে চলবার রথ বানিয়ে নিচ্ছে, পদাতিকের অধম যারা ছিল তারা বছর দশেকের মধ্যে হয়ে উঠেছে রথী। মানবসমাজে তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাদের বুদ্ধি স্ববশ, তাদের হাত হাতিয়ার স্ববশ।"....

বুদ্ধি স্ববশ। হাত হাতিয়ার স্ববশ। তার মানেই কিন্তু রাশিয়ায় যা দেখে রবীন্দ্রনাথ অমন "অভিভূত" হয়েছেন তা সত্যিই কোনো দৈবকৃপায় পাওয়া নয়। দৈবকৃপা ওরা মানে না। দেবতার পায়ে মাথা কোটবার পালা ছিল আগেকার আমলে, রাজাদের আমলে। রাজাকে ওরা বলতো জার; আগেকার আমলটার নাম তাই জার-আমল। নতুন আমলে কিন্তু একেবারেই অন্য রকম, এতো তফাত যে শুনলে মনে হয় রূপকথা বুঝি! যেন কোনো সোনার কাঠির ছোঁয়া লেগে জেগে উঠেছে পুরো দেশটা। বিরাট বিশাল দেশ, একপ্রান্ত য়ুরোপে, এক প্রান্ত এসিয়ায়: ৮৩৪৮১০০ বর্গমাইল জোড়া দেশ, ১৭৫ রকম জাতির মানুষ, ১৯৩১৯৮০০ মানুষ! রবীন্দ্রনাথ যখন রাশিয়ায় গিয়েছিলেন তখন এই নতুন আমলের বয়েস বছর দশেকের চেয়ে কিছু বেশি; তাও আবার, রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, এইটুকু বছর দশেকের ইতিহাসের মধ্যেই ওদের দেশের বাইরে শত্রু, ভিতরে শত্রু—গড়নের সবরকম চেষ্টার বিরুদ্ধে অজস্র চক্রান্ত।

তবু ঘরে-বাইরের এতো রকম চক্রান্তের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এইটুকু সময়ের মধ্যে সাধারণ মানুষের কল্যাণে ওখানে যা করা সম্ভব হয়েছে তাই দেখে রবীন্দ্রনাথের মনে হলো, এই বুঝি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক যজ্ঞ, এ-দেশ দেখতে না এলে এ-জন্মের তীর্থদর্শন অসমাপ্ত থাকতো।

ছোট্ট একটা দেশলাই-এর কাঠি যেমন চোখের নিমিষে একঘর অন্ধকার দূর করতে পারে তেমনিই ওদের জেগে ওঠবার এই মাত্র ক'টা বছর দেশের বুক থেকে দূর করে দিলো অনেক হাজার বছরের পুরোনো অন্ধকার—দুঃখ আর দৈন্য, লাঞ্ছনা আর অপমানের ভিড়ে যে-অন্ধকার অমন ভয়াবহ হয়েছিল।

অথচ, সত্যিই তো আর রূপকথা নয়। ইতিহাস।

কেমন করে জেগে উঠলো ওরা? উত্তরে শুধু একটি কথা: মার্কস্‌বাদ। মার্কস্‌বাদের কাছ থেকেই ওরা প্রেরণা পেয়েছে, পেয়েছে পথের নির্দেশ, শিখেছে পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী গড়বার কৌশল। মার্কস্‌বাদের নির্ভরেই ওরা আমাদের মতো দীনহীন দশা ছেড়ে যে কতদূর এগিয়ে গেল তা আজ আমাদের পক্ষে আন্দাজ করাই কঠিন। তাই, আমরাও যদি আজ জেগে উঠতে চাই, যদি পণ করি বাঁচবার, তাহলে আমাদেরও নির্দেশ খুঁজতে হবে এই মার্কস্‌বাদের কাছ থেকেই। তাই মার্কস্‌বাদ শুধু জ্ঞানের খাতিরে নয়, জানের দায়েও।

কিন্তু একদল লোক তর্ক তুলে বলবেন, তা হয় না। মার্কস্‌বাদ যে একান্তই বিদেশী ব্যাপার, পশ্চিমী ব্যাপার। রাশিয়ায় যদি এর সুফল ফলে থাকে তাহলে তার আসল কারণ হলো রাশিয়াও বিদেশ, মোটের উপর পশ্চিমী দেশই। আমাদের দেশের ইতিহাস আলাদা, জীবনের আদর্শ আলাদা—সব কিছুই অন্য রকমের। পশ্চিমের আদর্শটা হলো ভোগের আদর্শ, ভুল আদর্শ। সেই আদর্শের মোহে পড়ে পশ্চিমী সভ্যতা আজ কী রকম উন্মাদের মতো আত্মনাশের পথে এগিয়ে চলেছে; পৃথিবীর বুক থেকে একটা মহাযুদ্ধের ক্ষত শুকোতে না শুকোতে শুরু করেছে আর একটা মহাযুদ্ধের তোড়জোড়। আমাদের সনাতন আর্য আদর্শ হলো ত্যাগের আদর্শ, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের আদর্শ। আজ বরং আমাদের

এই প্রাচ্য আদর্শকে গ্রহণ করতে পারলেই পশ্চিমী সভ্যতা ধ্বংসের মুখ থেকে ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু তার বদলে আমরা যদি আমাদের নিজস্ব আদর্শকে ছেড়ে প্রাচ্যের এই জমিতে পশ্চিমী মার্কস্‌বাদের বীজ বুনতে যাই তাহলে অঘটন ঘটবে, জন্মাবে এক বিষবৃক্ষ, তার ফল আমাদের কল্যাণ করবে না।

উত্তরে বলবো, লড়াই কেন হয়—কেন আজকের পৃথিবীতে ধ্বংসের এতো তোড়জোড়—সে-কথা তো ভালো করে বুঝতে হবেই। কিন্তু এ-প্রশ্নের সবচেয়ে স্পষ্ট জবাব মার্কস্‌বাদের কাছ থেকেই পাওয়া যায়।

আমাদের ইতিহাস সত্যি তো কিছুটা অন্য রকম, ঠিক পাশ্চাত্যের মতো নয়। কিন্তু কোন্‌খানে তফাত, কেন তফাত, তার জবাবটাও পাওয়া যায় মার্কস্‌বাদের কাছ থেকেই। আমাদের পূর্বপুরুষদের কীর্তির মধ্যে গর্বের কথা অনেক আছে; নিশ্চয়ই আছে। আজ যদি আমরা সে-কথা একেবারে ভুলে যাই তাহলে তো বলতে হবে অনেক যুগ ধরে বিদেশীর শাসনে থেকে আমরা মনেপ্রাণে গোলাম হয়ে গিয়েছি। তবু, শুধু পুরাকালের কাহিনীতে মশগুল হয়ে থাকাও তো কোনো কাজের কথা নয়। মনে রাখতে হবে একালের কথাও। হিসেব করতে হবে, পঞ্চাশের আকালে ক'লাখ মানুষ কলকাতার ফুটপাথে মুখ থুবড়ে মরলো? প্রতিদিন আমাদের দেশে কত হাজার মানুষ মরে চিকিৎসার অভাবে? পরনের কাপড় জোটে না কতো লক্ষ মানুষের? কত মানুষ রাত কাটায় ফুটপাথে পড়ে? শিক্ষার সুযোগ-সুবিধে ক'জনের কপালে? আর মেয়েরা! সতীদাহ নাকি আইন করে দেশ থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। তবু, কত কোটি মেয়ে আজও আমাদের ঘরে ঘরে তিলে তিলে পুড়ে মরে? এ-সব কথা নিয়ে নিখুঁত হিসেব দাখিল করবার উপায় নেই। হিসেব পাওয়া যায় না। তবু একটা আন্দাজ করবার চেষ্টা করুন; দেখবেন অতীত গৌরবের কথা ভাবতে ভাবতে মনে যেটুকু নেশা ধরেছিলো তা এক মুহূর্তে ছুটে যাবে।

আসলে, পাশ্চাত্যের আদর্শটা ভোগের আদর্শ আর আমাদের আদর্শটা ত্যাগের আদর্শ,—এটা শুধুই ফাঁকা কথা নয়, ফাঁকির

কথাও। ফাঁকিটা দেখলে সন্দেহ হয় সাহেব পণ্ডিতেরা ফন্দি করে কথাটা আমাদের মাথায় ঢোকাবার চেষ্টা করছে। কেননা, এই কথাটা দিয়ে একটা ভারি নোঙরা ব্যাপার ঢাকা দেবার সুবিধে। নোঙরা ব্যাপারটা হলো, বিদেশী শোষণের কৃপায় বহুদিন ধরে আমাদের দেশের মানুষ মুখে রক্ত তুলে খেটে মরেছে আর সেই মেহনত নিয়ে তৈরি সম্পদ ওরা লুটপাট করে নিয়ে গিয়েছে। আমাদের কপালে সত্যিই জুটেছে ত্যাগের দুর্ভোগ, ওদের কপালে ষোলো আনা ভোগ। কিন্তু এর আসল নাম তো শোষণ, জীবনের আদর্শে তফাত বললে শোষণের কথাটা ঢাকা দেওয়া হবে যে! আমরা সর্বস্বান্ত অবস্থায় নীলচাষ দিয়ে মরবো আর ওরা নীলকর সাহেব হয়ে ফুর্তি করবে; আমরা আধপেটা খেয়ে পাটকলে কুলিগিরি করবো আর ওরা পাটকলের সাহেব হয়ে হাওয়া-গাড়ি হাঁকাবে—কেননা আমরা ভোগ করতে চাই না ত্যাগ করতে চাই আর ওরা ত্যাগ করতে চায় না ভোগ করতে চায়—এ-কথা কি সত্যিই কোনো কাজের কথা হলো? আমাদের আদর্শ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ, ওদের মতো ইহলোকের উন্নতি নয়—এই কথাটাও কিন্তু একই কথা, কেবল একটু ঘুরিয়ে বলা, এই যা। আর তাই, সন্দেহ হয় এই কথাটাও আমাদের মাথায় ঢুকিয়েছে সাহেব পণ্ডিতের দল। কেননা, আমরা যদি পরলোকে পরমান্ন পাবার স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকি তাহলে হয়তো আর ইহলোকের শাকান্নে কেন টান পড়ছে তাই নিয়ে হল্লা করতে বেরুবো না।

অবশ্য এমনও হতে পারে যে, কথাগুলো সত্যিই সাহেব পণ্ডিতদের ফন্দি করে শেখানো কথা নয়। হয় তো আমাদেরই কথা, কিন্তু নেহাত অভিমানের কথা। অনেক দিন ধরে বিদেশীর শাসনে আমাদের দিন কেটেছে; অন্নবস্ত্র জোটেনি, শিক্ষা-স্বাস্থ্য জোটেনি, জুটেছে নির্লজ্জ শোষণ আর নির্মম অত্যাচার। ন্যায্য পাওনাটুকু চাইতে গেলে আমরা পেয়েছি পাইক-পেয়াদা আর হুজুর-হাকিমের কুৎসিত হুমকি। আর তাই হয়তো আমরা অভিমান করে বলতে শিখেছি: ভোগ করতে আমরা চাই না, ওটা আমাদের আদর্শই নয়। খানিকটা ওই শেয়ালের গল্পের মতো: যে-আঙুর খেতে পাওয়া গেল না তাকে টক বলে অবজ্ঞা

দেখানো। কেবল শেয়ালের গল্পটা পরিহাসের ব্যাপার, আমাদের অভিমানটা বড় নির্মম, তাই পরিহাসের ব্যাপার নয়।

কিন্তু সাহেবী পণ্ডিতদের শেখানোই হোক আর আমাদের মনের অভিমানই হোক, কথাটা ভুল। আসলে সাহেবরাও মানুষ, আমরাও মানুষ। মানুষ হিসাবে সবাইকার জীবনের আদর্শই সমান। এ-আদর্শটা ঠিক কী রকম হওয়া উচিত তা ভালো করে ভেবে দেখতে হবে বই কি। কিন্তু ভেবে দেখতে হবে সংস্কারমুক্ত মনে, বাস্তবজীবনের বাস্তব অবস্থাটার কথা মনে রেখে।

আপাতত, ওই মোটা তর্কটার জবাব দেওয়া যাক। তর্ক করে কেউ কেউ বলেন, মার্কস্‌বাদ নেহাতই পাশ্চাত্য ব্যাপার। প্রাচ্যের এই জমিতে সে-মতবাদের বীজ ছড়ালে উৎপন্ন হবে বিষবৃক্ষ, যার ফল আমাদের কল্যাণ করবে না।

এমনতরো যুক্তির সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। কেননা, এখানে আজ আর তর্কের অবসর নেই। হালের ইতিহাসই এই যুক্তিকে একেবারে টুকরো করে ভেঙেছে। ভূগোলের ছবিতে যারা আমাদের একেবারে পড়শী তাদের দিকে চেয়ে দেখুন। চীন। মহাচীন। আমাদের মতোই পুরোনো প্রাচ্য সভ্যতার ইতিহাস তাদের। শিল্প, সাহিত্য আর জ্ঞানের গৌরবে সে-ইতিহাস আমাদের মতোই উজ্জ্বল। তবু ওদের কপালেও লেগে ছিলো আমাদের মতোই দুঃখ আর দৈন্য, লাঞ্ছনা আর অপমান। কয়েক হাজার বছর ধরে দেশের সাধারণ মানুষ মানুষের অধম হয়েই বেঁচে ছিলো। এগিয়ে চলবার উপায় নেই, যেন একপায়ে পুরোহিতের শেকল আর এক পায়ে জমিদারের। পিঠে অনেক চাবুকের দাগ; কোনোটা বা বিদেশী প্রভুদের চিহ্ন, কোনোটা বা স্বদেশী প্রভুদের। মেয়েরা তো সত্যিই ভালো করে চলতে পারতো না; কচি বয়েস থেকে লোহার জুতোয় বাঁধা পা, তাই পঙ্গু। লেখাপড়ার উপায় নেই, মেয়েদের তো নয়ই, পুরুষদেরও নয়। আধুনিক বিজ্ঞানের সুযোগ-সুবিধে তো দূরের কথা। সুযোগ শুধু দুর্ভিক্ষের দিনে পথের পাশে মুখ থুবড়ে মরবার। দুর্ভিক্ষের পালা ওদের দেশেও আমাদের চেয়ে কম ছিলো না।

আর আজকের দিনে?

প্রায় পঞ্চাশ কোটি মানুষ ওই দেশে। আজকের দিনে তাদের অন্ন দেবার, বস্ত্র দেবার, শিক্ষা দেবার, মর্যাদা দেবার কী বিরাট বিপুল আয়োজন। চীন, ৪২৭৭২৬০ বর্গমাইল যার আয়তন! হাজার কয়েক বছরের জড়তা কাটিয়ে আমাদের চোখের সামনে কী রকম জেগে উঠছে। যেন জোটে বুড়ীর জটা ধরে টান মেরেছে ওরা। মুক্তি পেয়েছে মানুষ, পেয়েছে উদ্দাম জীবন। শুরু করেছে পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী গড়তে, সে-পৃথিবী আলোয় ঝলমল, সে-পৃথিবী প্রাচুর্যে টলোমল। অভাবের বোঝায় মানুষের পিঠ আর কুঁজো হয়ে থাকবে না, শিক্ষার অভাবে মানুষের মন আর পঙ্গু হয়ে থাকবে না। চীন। মহাচীন। পাশ্চাত্ত্যের কোনো দেশ নয়। আমাদের একেবারে পাশের দেশ। ক'দিন আগে পর্যন্তও আমাদের মতোই দীনহীন দশা, আমাদেরই মতন একদিকে জমিদার পুরোহিতের কড়া শাসন আর একদিকে শোষণ বিদেশী বণিকদের। কেমন করে জেগে উঠলো ওরা? পথের সন্ধান পেলো কোথা থেকে? উত্তরে ওই এক কথা: মার্কসবাদ।

আর আমরা? আমাদের দেশ? আমাদের দশা? একটা ছবি দেখুন:

"ফরিদপুরের গাড়ি আসতে তখনো অনেক দেরি। রাজবাড়ির বাজারে বসে আছি। পাতলা কুয়াশায় মোড়া পঞ্চাশের আকালের এক সকাল। একটু দূরে স্টেশনের রাস্তায় মিলিটারী ছাউনির পাশে একটা অদ্ভুত জন্তু দেখলাম। আস্তে আস্তে চার পায়ে এগিয়ে আসছে। চেনা কোনো জন্তুর সঙ্গে তার মিল নেই। কুয়াশার মধ্যেও জ্বলজ্বল করছে তার দুটো চোখ। একা থাকলে ভয়ে মূর্ছা যেতাম। কেননা সেই চোখের দৃষ্টিতে এমন এক মায়া ছিল, যা বুকের রক্ত হিম করে দেয়।

"আরো কাছে এগিয়ে এল সেই মূর্তি। রাস্তায় ধুলো থেকে কী যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। আর জ্বলন্ত দুটো চোখ কুয়াশায় কী যেন খুঁজে খুঁজে ফিরছে। ঠিক মানুষের হাতের মতো তার সামনের দুটো থাবা। আঙুলগুলো যেন আগার দিকে একটু বেশি সরু। গায়ে একটুও লোম নেই। কোন্ জন্তু?

"সামনা সামনি আসতেই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অমৃতের

পুত্র মানুষ। বারো-তেরো বছরের উলঙ্গ এক ছেলে। মাজা পড়ে গিয়েছে। হাঁটতে পারে না। তাই জানোয়ারের মতো চার পায়ে চলে। বাজারের রাস্তায় খুঁটে খুঁটে খায় চাল আর ছোলা।"—("আমার বাংলা" ঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়।)

এই তো আমাদের দেশ। এমন নয় যে, শুধু পঞ্চাশের আকালের সময়ই এমনতরো অদ্ভুত জন্তু আমাদের রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। দেশটার দিকে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখুন; দেখবেন আজও, এখানে-ওখানে এই রকম অদ্ভুত জন্তু মাটি থেকে কী যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে! এ-দেশের অতীত কীর্তির কথা নিশ্চয়ই ভোলা চলবে না। কিন্তু সেই সঙ্গেই প্রশ্ন তুলতে হবে: এ-দেশের রাস্তায় অমৃতের পুত্র এই রকম অদ্ভুত জন্তুর মতো আর যাতে ঘুরে না বেড়ায় তার স্থায়ী ব্যবস্থা কী হবে? এককালে রুশ দেশের রাস্তায় এ-রকম জন্তু দেখতে পাওয়া যেতো। আজ আর যায় না। এই সেদিনও চীন দেশের রাস্তায় এ-রকম জন্তু দেখতে পাওয়া যেতো। আজ তারা উঠে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু আমরা?

আমরাও উঠে দাঁড়াবো যদি মার্কস্‌বাদের কাছ থেকে সঠিক নির্দেশ নিতে পারি। আমরাও গড়তে পারবো নতুন পৃথিবী রুশ দেশের মতো, চীন দেশের মতো, আমাদের দেশেও।

তাই মার্কস্‌বাদ। শুধু জ্ঞানের খাতিরে নয়, জানের দায়েও।

আর নরনারীর সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার বেলাতেও তাই প্রথম প্রশ্ন হলো: এই মার্কস্‌বাদ অনুসারে নরনারীর সম্পর্কটাকে কেমনভাবে বোঝবার চেষ্টা করতে হবে?

এই প্রশ্ন থেকেই আলোচনা শুরু করা যাক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইতিহাসের জবানবন্দি

গল্পে আছে, যাদুকর মন্ত্রবলে এমন এক দৈত্যশক্তিকে মর্তে নিয়ে এল যে-শক্তিকে আয়ত্তে রাখা তার নিজের পক্ষেই আর সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত এই শক্তিই যাদুকরকে ভেঙে-চুরে দিতে চায়। মার্কস্-এঙ্গেল্‌স্ বলেছেন, আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের দশাও এই রকমই। . শিল্প উৎপদানের দিক থেকে কথাটা দিনের পর দিন প্রায় দিবালোকের মতোই স্পষ্ট হয়ে এসেছে। আধুনিক ধনতন্ত্রের যুগে শিল্প উৎপাদনের এমন এক বিরাট ও বিশাল সম্ভাবনা দেখা দিলো যে, শেষ পর্যন্ত ধনতান্ত্রিক সমাজের কাঠামোর মধ্যে তার স্থান আর হয় না,—এই উৎপাদন শক্তির চাপেই ধনতন্ত্রের সমাজ যেন চিড় খেয়ে চুরমার হয়ে যায়! তাই আজ প্রাচুর্যের মধ্যেও নির্মম হাহাকার, তাই পৃথিবীর বুক জুড়ে একটা মহাযুদ্ধের ঘা শুকোতে না শুকোতে কানে আসে আর একটা মহাযুদ্ধের উন্মত্ত দামামা।

শিল্প উৎপাদনের বেলায় যে-কথা, নরনারীর সম্পর্কের বেলাতেও সেই কথাই। আধুনিক মহাজনী যুগ নরনারীর সম্পর্কেও গভীর ও আমূল বিপ্লব এনেছে, এনেছে এমন এক সম্ভাবনা যা অতীতের আর কোনো যুগে কল্পনাই করা যেতো না। অথচ, এই সম্ভাবনার যেটা মূল কথা তা আজকের সমাজের ভিত্তিতে কখনোই সফল হতে পারে না।

এঙ্গেল্‌স্ বলছেন, ধনতান্ত্রিক সমাজের গভীরে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তারই আণবিক সংস্করণ হলো আজকের নরনারী-সম্পর্কের অন্তর্দ্বন্দ্ব। জীববিজ্ঞানের দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি এই কথাটাই আরো স্পষ্টভাবে বোঝাতে চান। জীবের দেহ অসংখ্য ক্ষুদ্র কোষ

দিয়ে তৈরি। কিন্তু জীবদেহের যে ক'টি মূল লক্ষণ, প্রতিটি কোষের মধ্যেও সেই ক'টি লক্ষণ চোখে পড়ে। আজকের সমাজকে যদি জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে প্রতিটি বিশিষ্ট পরিবারকে জীবকোষের মতো মনে করতে হবে: সমগ্রভাবে সমাজের মূলে যে-অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রতিটি পরিবারের মধ্যেই তা প্রতিফলিত।

এই অন্তর্দ্বন্দ্বের আসল চেহারাটা কি রকম? একদিকে মুক্ত যৌনপ্রণয়ের দাবি আর এক দিকে শোষণবৃত্তির তাড়নায় সেই দাবির অনিবার্য ব্যর্থতা। কথাটা ভালো করে বুঝতে হলে প্রথমে 'যৌনপ্রণয়ের দাবি' নিয়ে আলোচনা করা দরকার। নরনারীর সম্পর্কের মূলে থাকবে প্রেম বা ভালোবাসা: একটি মেয়ের পক্ষে একটি ছেলেকে স্বাধীনভাবে ভালোবাসার অধিকার আর একটি ছেলের পক্ষে একটি মেয়েকে স্বাধীনভাবে ভালোবাসার অধিকার—এই স্বাধীন ভালোবাসার ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হবে তাদের সম্পর্ক। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক। তাই, ব্যক্তিগত প্রণয়ের দাবি হলো, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের মূলে থাকবে পরস্পরের প্রতি মুক্ত ও স্বাধীন প্রেম। কথাটা হয়তো আজকের দিনে আমাদের কাছে বড় বেশি ঘরোয়া হয়ে গিয়েছে এবং ব্যবহারিক জীবনে এ-দাবির বিফলতা বড় বেশি গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। তাই, একদিকে এই বিফলতার কথাটা আমরা সব সময় ঠিকমতো অনুভব করতে পারি না এবং অপরদিকে যখন শুনি ব্যক্তিগত প্রণয়ের কথাটা আধুনিক যুগের আগে মানুষের মাথাতেই আসেনি, তখন আমাদের মনে অবিশ্বাস জাগতে চায়। অথচ, মোহমুক্তভাবে ইতিহাসের আলোচনা করলে স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায় যে, মুক্ত যৌনপ্রণয়ের কথাটুকু এবং তারই ভিত্তিতে সহজ স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক গড়বার স্বপ্ন খুব বেশি দিনের পুরোনো নয়। কিন্তু এই স্বপ্নকে সফল করা সম্ভবই নয় ধনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে। তাই, মুক্ত যৌনপ্রণয়কে বাস্তবে সফল করবার দাবি ধনতন্ত্রকে পরিবর্তন করবার দাবিরই অপরদিক! ধনতন্ত্রের আওতায় বাস্তব জীবনে এই স্বপ্নভঙ্গের কথাটা পরে তোলা যাবে। প্রথমে দেখা যাক মুক্ত যৌনপ্রণয়ের ধারণাটা মানুষের মনে জন্মালো কখন থেকে।

মর্গানের গবেষণা অনুসরণ করে এঙ্গেল্‌স্ দেখাচ্ছেন, সভ্যতা গড়ে ওঠবার আগে পর্যন্ত মানুষের ইতিহাসে দুটি স্তর মানা দরকার। এই দুটি স্তরের নাম দেওয়া হয়েছে বন্য আর বর্বর স্তর। অর্থাৎ, মানুষের ইতিহাসে মোটের উপর তিনটি প্রধান যুগ: বন্য, বর্বর ও সভ্য। বর্বর যুগ শেষ হয়ে সভ্যতা শুরু হবার সময় থেকে লিখিত ইতিহাসের শুরু। আগের যুগ দুটির কথা—বন্য আর বর্বর দশার কথা—কিছুটা বা টিকে আছে জ্ঞাতি-নির্ণয়ের ভাষার মধ্যে, অতীত যুগের স্মৃতি হিসেবে। কিন্তু এ-সম্বন্ধে বেশির ভাগ খবর পাওয়া যায় আজো পৃথিবীর আনাচে-কানাচে যে-সব অসভ্য ও আদিম জাতি বেঁচে আছে—সভ্যতার অভিযানে আজো যারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি—তাদের জীবন ও সমাজকে স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করলে।

বন্যদশার শুরুতে মানুষ সবেমাত্র চার পা ছেড়ে দু'পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। হাতে তার স্থূল আর ভোঁতা হাতিয়ার। প্রাণ ধারণের জন্যে যেটুকু খাবার যোগাড় না করলেই নয়, তার প্রায় সবটুকুর জন্যেই প্রকৃতির মুখ চেয়ে বেঁচে থাকতে হয়। কিন্তু সবেমাত্র চার পা ছেড়ে দু'পায়ে উঠে দাঁড়ালেও মানতেই হবে পশুর রাজ্যকে পিছনে ফেলে মানুষ এগিয়ে এসেছে। তাই পশুর সঙ্গে মানুষের দলের তফাত ক্রমশই স্পষ্ট হতে লাগলো। পশুরা খাদ্যের সন্ধানে শুধু হন্যে হয়ে ঘুরতেই জানে, কিন্তু মানুষ শুরু করলো দল বেঁধে, একসঙ্গে মিলে প্রকৃতিকে জয় করতে। দলের মধ্যে অবশ্য সকলেই সমান—ঝোঁকটা ব্যক্তির উপর নয়, দলের উপর। সাধারণভাবে জীবন যাপনের বেলায় যে-কথা যৌনজীবনের বেলাতেও সেই কথাই। অর্থাৎ, এই দশায় যৌনসম্পর্কটাও দলগত সম্পর্কই। শুধু একজন বিশেষ পুরুষের সঙ্গে একজন নির্দিষ্ট নারীর সম্পর্ক নয়, দলের মধ্যে সমস্ত পুরুষের সঙ্গেই সমস্ত নারীর সম্পর্ক। আধুনিক যুগের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হবে তখন প্রত্যেক পুরুষের বহু পত্নী আবার প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই বহু পতি। তাই এর নাম দেওয়া হয় দলগত বিয়ে। অবশ্যই, আজকের দিনের নীতিবাগীশ মহল অতীত যুগের এই দলগত যৌনসম্পর্কের কথাটা উড়িয়ে দিতে চায়। ভাবখানা যেন এই যে,

মানবজাতির কপাল থেকে অতীত কলঙ্কের এই চিহ্ন মুছে ফেলা দরকার। কিন্তু, মনে রাখতে হবে, অতীত যুগের যৌনসম্পর্কে যে-অবাধ মুক্তি তার স্বরূপ আমাদের পক্ষে আজকের দিনে বুঝতে পারাই কঠিন, কেননা সহস্র বছর ধরে আমাদের কাছে যৌনমুক্তির একমাত্র বিকাশ দেখা দিয়েছে ব্যভিচার আর গণিকালয়ের হুল্লোড়ে। এঙ্গেল্‌স্ তাই বলছেন, গণিকালয় থেকে সংগ্রহ করা দৃষ্টিভঙ্গির হাত থেকে আমরা যতক্ষণ না মুক্তি পাই ততক্ষণ আমাদের পক্ষে অতীত যুগের যৌনমুক্তিকে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারাই সম্ভব নয়।

অবশ্যই, মানুষেরই এই বন্যদশা স্থির ও নিশ্চল অবস্থা নয়। এই দশার মধ্যেই নিম্ন স্তর থেকে উচ্চ স্তরের দিকে একটানা অগ্রগতি, আর শেষ পর্যন্ত বন্য অবস্থা ছেড়ে অসভ্য অবস্থায় উঠে আসবার চেষ্টা। বন্যদশায় যে যৌনসম্পর্ক মোটের উপর তা দলগত যৌনসম্পর্কই, যদিও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই দলগত যৌনসম্পর্কে পরিবর্তন দেখা দিতে লাগলো। আদিম যুগের নির্বিচার যৌনসম্পর্কের সঙ্গে তার অনেকখানি তফাত। এই পরিবর্তনের মূল কথা হলো আদিম মানুষের অভিজ্ঞতায় অজাচারের অবাঞ্ছনীয় ফলাফল ধরা পড়া। যার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক আছে তারই সঙ্গে যোনমিলনের নাম হলো অজাচার, ইংরেজীতে বলা হয় incest। অজাচার যে ঠিক কেন অবাঞ্ছনীয় আদিম মানুষের পক্ষে তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবার কথা নিশ্চয়ই নয়। তবু যত অস্পষ্টভাবেই হোক তাদের অভিজ্ঞতায় নিশ্চয়ই ধরা পড়েছিল যে, অজাচারের ফলে সন্তানের জন্ম হলে নতুন বংশের পক্ষে, অতএব পুরো দলের পক্ষেই, পঙ্গু হয়ে যাবার সম্ভাবনা। এঙ্গেল্‌স্ বলেছেন, অজাচারের এই অবাঞ্ছনীয় ফলাফল আবিষ্কার আদিম মানুষের পক্ষে একটি মস্ত বড় আবিষ্কার।

অজাচার আবিষ্কার করবার পর মানুষ নির্বিচার যৌনজীবনকে শুধরে নিতে লাগলো। শুধরে নেবার প্রধান দুটি স্তর। এক হলো, দলের মধ্যে পিতা-কন্যা আর মাতা-পুত্রের যৌনমিলন বন্ধ করা এবং দ্বিতীয় স্তর হলো ভাই-বোনদের মধ্যে যৌনসম্পর্ক বর্জন করা। এই দুই ধাপে শুধরে নেবার পর দলগত যৌনসম্পর্কের

যে-রূপ সেইটেই বন্যদশার যৌনজীবনের চরম সামাজিক রূপ: পুরো একদল নারীর সঙ্গে পুরো একদল পুরুষের বিবাহ-সম্পর্ক, অর্থাৎ প্রত্যেক পুরুষেরই বহু পত্নী এবং প্রত্যেক নারীরই বহু পতি, তবে দলের মধ্যে মা-বাবার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের এবং ভাই-বোনদের মধ্যে যৌনসম্পর্ক বন্ধ।

আদিম যুগের এই স্মৃতি আমাদের দেশের প্রাচীন পুঁথি আর ঐতিহ্যের মধ্যে টিকে আছে। এবং তার থেকেই প্রমাণ হয়, অন্যান্য দেশের মতো, আর্যজাতির বন্যদশার প্রথম অবস্থায় ছিল নির্বিচার যৌনসম্পর্কই। তখনো মানুষ অজাচার আবিষ্কার করেনি, মা-বাবার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের বা ভাইবোনদের মধ্যে যৌনসম্পর্কের অবাঞ্ছনীয় ফলাফল মানুষের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েনি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে, সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রজাপতি নিজের দুহিতাকে বিয়ে করলেন! মৎস্য ও বিষ্ণু পুরাণেও ব্রহ্মা সম্বন্ধে ওই কথাই। হরিবংশেও (আমাদের দেশের আর একটি প্রাচীন পুঁথি) এই জাতীয় নানান ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। বশিষ্ঠ প্রজাপতির কন্যা ছিলেন শতরূপা; বয়ঃপ্রাপ্তির পর শতরূপা হলেন বশিষ্ঠ প্রজাপতির পত্নী। মনু বিয়ে করলেন নিজের মেয়ে ইলাকে, জহ্নুর সঙ্গে বিয়ে হলো জহ্নুর কন্যা জাহ্নবী গঙ্গার। এর চেয়ে জটিলতর কাহিনী হরিবংশেই পাওয়া যায়: দশ-ভাই প্রচেতা (প্রজাপতি বিশেষ) মিলে এক পুত্রের জন্ম দিলেন, নাম সোম! মরীশা নামে সোমের একটি মেয়ে হলো; মরীশার গর্ভে এবং দশ-ভাই প্রচেতা ও সোমের ঔরসে যে-পুত্র জন্মালো তার নাম দক্ষ-প্রজাপতি। পরে এই দক্ষ-প্রজাপতি সাতাশটি কন্যার জন্ম দিলেন এবং সন্তান উৎপাদনের জন্য সাতাশজনকেই উপহার দিলেন পিতা সোমের কাছে। আবার, মহাভারতে বলা হয়েছে, ব্রহ্মার ডান পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে জন্ম হলো দক্ষের আর বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে তাঁর ভগ্নির, দু'জনের মিলনে ষাটটি মেয়ে জন্মালো। দক্ষের দুই ভাই ছিলেন,

মরীচি ও ধর্ম। ষাটটি মেয়ের মধ্যে দশটিকে বিয়ে করলেন ধর্ম, মরীচির ছেলে কশ্যপ বিয়ে করলেন সতেরোটিকে, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রাচীন পুঁথিতে ভাইবোনদের মধ্যে যৌনসম্পর্কের স্মৃতিও বিরল নয়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ থেকে একটা নমুনা দেওয়া যাক: প্রজাপতির এক কন্যার নাম সীতাসাবিত্রী আর এক কন্যার নাম শ্রদ্ধা এবং প্রজাপতির পুত্রের নাম ছিল সোম। সীতাসাবিত্রী সোমকে পেতে চাইলেন, চাইলেন সোমের ঔরসে নিজের গর্ভে একটি সন্তান। কিন্তু সোমের আকর্ষণ শ্রদ্ধার দিকে। তাই সীতাসাবিত্রী বাবার কাছে উপদেশ চাইলেন, কি করা যায়। ভাইকে বশ করবার জন্যে প্রজাপতি সীতাসাবিত্রীকে একটি মাতুলি দিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এই মাতুলির সাহায্যে সীতাসাবিত্রীর মনস্কামনা পূর্ণ হলো।

অজাচারের ফলাফল সম্বন্ধে মানুষের অভিজ্ঞতা যত স্পষ্ট হতে লাগলো দলগত যৌনসম্পর্কের মধ্য থেকে ততই বাদ পড়তে লাগলো অজাচার। প্রথম স্তরে মা-বাবার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের যৌনসম্পর্ক বর্জন। তাই এই যুগের বর্ণনায় বলা হয়েছে, নিজের কন্যার সঙ্গে মিলিত হবার আশায় প্রজাপতি এক হরিণের ছদ্মবেশ ধারণ করলেন আর তাঁর কন্যা ধারণ করলেন রোহিত হরিণের ছদ্মবেশ। কিন্তু এমনতরো মিলনের বিরুদ্ধে দেবতারা তখন বড়ো বেশি সজাগ হয়েছেন, তাই ছদ্মবেশ সত্ত্বেও দেবতারা টের পেয়ে গেলেন এবং এঁদের সহবাস সম্পূর্ণ হবার আগেই দেবতাদের তীর এসে বিদ্ধ করলো প্রজাপতিকে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে, এই ঘটনার পর প্রজাপতি ও তাঁর কন্যা আকাশে নক্ষত্র হয়ে স্থান পেলেন। ভাইবোনদের মধ্যে যৌনমিলন বন্ধ করা নিশ্চয়ই আরও কষ্টসাধ্য হয়েছিল। এ-কথা ঋগ্বেদের যম ও যমীর উপাখ্যানে প্রতিফলিত। যমের বোন যমী আপন গর্ভে যমের কাছ থেকে সন্তান চাইলেন; কিন্তু যম তাতে সাহস পান না, কারণ বরুণের দৃষ্টি অত্যন্ত সজাগ এবং সেই দৃষ্টির কাছে ব্যাপারটা ধরা পড়লে দেবতারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবেন। যমী কিন্তু তর্ক তুলে বললেন: না, এতে বরং দেবতারা সন্তুষ্টই হবেন। শেষ পর্যন্ত যে কি হলো তা অবশ্য জানা যায়নি, কেননা এই উপাখ্যানের শেষ অংশ হারিয়ে গিয়েছে।

প্রাচীন পুঁথির এই সব উপাখ্যানকে আদিম যুগের নির্বিচার যৌনসম্পর্কের স্মৃতি ছাড়া আর কি বলা যায়? ক্রমশ অবশ্য এই নির্বিচার যৌনসম্পর্ক থেকে অজাচার বাদ পড়েছে। এ সব কথা শুনলে শুধু যে আজকের দিনে আমরাই অবাক বোধ করি তাই নয়, ব্যাস এবং বৈশম্পায়নের মুখে এই জাতীয় কথা শুনতে শুনতে রাজা জনমেজয়ও অত্যন্ত অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু বৈশম্পায়ন আর ব্যাস অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলাতেই উত্তর দিয়েছিলেন, এসব কথা 'পুরাতন ইতিহাস' মাত্র। বস্তুত, দলগত বিয়ে শেষ হবার অনেক পরে পর্যন্ত প্রাচীনদের স্মৃতি থেকে অতীতের এই যৌনসম্পর্কের কথা মুছে যায়নি। তাই এক-বিবাহ প্রচলিত হবার পরেও যখনই প্রয়োজনের খাতিরে এই এক-বিবাহের গণ্ডিকে শিথিল করা দরকার হয়েছে তখনই প্রাচীনেরা অতীতকালের নজির তুলেছেন। যেমন ধরুন, পাণ্ডু-কুন্তি সংবাদ। পুত্রলাভের আশায় অসুস্থ পাণ্ডু তাঁর দুই পত্নী কুন্তি ও মাদ্রীকে অনুরোধ করলেন ভিন্ন পুরুষ নিয়োগ করতে। এই প্রস্তাবে কুন্তি আপত্তি তুললে পর পাণ্ডু অতীত যুগের নজির তুলে একটি দীর্ঘ উপদেশ দেন। আবার কুন্তির যখন কৈশোর তখন সূর্য এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার ইচ্ছে নিয়ে। মনের বাসনা সত্ত্বেও কুন্তির সাহস হচ্ছিলো না, কারণ যৌনসম্পর্ক প্রসঙ্গে সমাজে তখন অনেক রকম বিধিনিষেধ জারি হয়েছে। তাই সূর্য অতীত দিনের কথা বলে, প্রাচীনদের নিদর্শন তুলে, কুন্তির সংকোচ ও ভয় দূর করলেন। ভীষ্মের মুখেও শুনতে পাওয়া যায় প্রাচীন যুগ নিয়ে এই ধরনের নজির। ভীষ্মের ভাই মারা যাবার পর তাঁর মা বিধবা পুত্রবধূকে অন্যের নিয়োগে পুত্রলাভ করতে নির্দেশ দিলেন এবং প্রাচীন যুগের নজির তুলেই জননীর কথা সমর্থন করলেন ভীষ্ম।

আজকালকার দিনে এই দলগত যৌনসম্পর্কের ব্যাপারটা আমাদের কাছে নেহাতই কদর্য আর কুৎসিত মনে হতে পারে। তার আসল কারণ, বহু শতাব্দী ধরে যৌনমুক্তি বলতে মানুষ

শুধুই ব্যভিচার আর গণিকা-সম্ভোগই বুঝতে শিখেছে। অথচ, অতীত যুগের যে-যৌনমুক্তি তার ভিত্তিতে দারিদ্র্য আর অভাব যতই প্রকট হোক না কেন, তার মধ্যে লুকোচুরি নেই, নোংরামি নেই, দ্বন্দ্ব নেই, তাই অসুস্থতাও নেই। আসল কথা হলো, বহু দীর্ঘদিন ধরে শ্রেণীসমাজের মানুষ নারী বলতে যা বুঝেছে আদিম মানুষ মোটেই তা বোঝেনি। শ্রেণীসমাজে নারী হলো আরো পাঁচ রকম উৎপাদনের উপায়ের মতে একরকম উৎপাদনের উপায় মাত্র, আর না হয় তো আর পাঁচ রকম উপভোগ্য পণ্যের মতো একরকম উপভোগ্য পণ্য মাত্র। এই দু'মুখো ধারণার সঙ্গে যৌনমুক্তির কথাটা একটুও খাপ খায় না। আদিম শ্রেণীহীন সমাজে যৌনমুক্তি সম্ভব ছিল কারণ তখন নারী বলতে মানুষের ধারণা একেবারে অন্যরকম। মানুষ তখন চার পা ছেড়ে দু'পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে আর আগেকার ফালতু দুটো পা তার হাত হয়েছে। সেই হাতে মানুষ ধরেছে হাতিয়ার। দুনিয়ার আর কোনো জানোয়ারের হাত বলে অঙ্গ নেই, আর কোনো জানোয়ার জানে না হাতিয়ার ধরতে। তাই এই হাতের গৌরবেই মানুষ স্বতন্ত্র হলো বাকি সব জানোয়ার থেকে। কিন্তু আদিম মানুষের সেই প্রথম হাতিয়ার বড় স্থূল, বড় ভোঁতা। অথচ, পৃথিবীর বুকে টিকে থাকতে হলে প্রয়োজন প্রকৃতির সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম। আর অত স্থূল, অত ভোঁতা হাতিয়ার হাতে প্রকৃতির সঙ্গে অমন অবিরাম সংগ্রাম একা একা করবার কথাই ওঠে না। তাই দল বেঁধে এক সঙ্গে সংগ্রাম—এক সঙ্গে বাঁচা। দল বেঁধে, এক সঙ্গে মিলে প্রকৃতির কাছ থেকে যেটুকু সম্পদ আদায় করা যায় তার উপর দলের সবাইকার সমান অধিকার। দলের মধ্যে তাই সকলেই সমান। এই আদিম অবস্থায় মানুষের মেহনতে জাতিভেদ দেখা দেয়নি, দেখা দেবার কথা নয়। মেহনতের মর্যাদায় স্ত্রী-পুরুষে তফাত নেই। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কাজের ধরনে পার্থক্য দেখা দিয়েছে বহু যুগ আগেই, কিন্তু ধরনে পার্থক্য মানেই মর্যাদার প্রভেদ নয়। পুরুষেরা জঙ্গলে শিকার করতো, মাছ ধরতো, যোগাড় করতো ফলমূল, গাছগাছড়া; মেয়েদের উপর ভার ছিল শিশুপালন আর খাবার তৈরি আর পরনের 'কাপড়' বোনা বা

সেলাই করা। কিন্তু তাই বলে ঘরের বাইরে পুরুষের মেহনত আর ঘরের মধ্যে নারীর মেহনত, এ-দু'-এর মধ্যে গৌরবের বা মর্যাদার তফাত একটুও নয়। দু'রকম দায়িত্বই সামাজিকভাবে সমান। কিংবা, যা একই কথা, সামাজিক মেহনতের দায়িত্বে স্ত্রী-পুরুষ সমানে সমান। কিন্তু শ্রেণীসমাজ দেখা দেবার পর থেকে এই সহজ সাম্য ভেঙে গেল, আর দিনের পর দিন মেয়েরা বঞ্চিত হতে থাকলো সামাজিকভাবে মেহনতের মর্যাদা থেকে।

শ্রেণীসমাজের কথায় পরে আসা যাবে; আপাতত আদিম যুগে সমাজে নারীর স্থান নিয়ে আলোচনাটুকু শেষ করা যাক। দলগত জীবনে নারীর গৌরব অন্য একদিক থেকেও সুপ্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য। বিয়ে যখন দলগত তখন সন্তানের মা-বাবার মধ্যে একমাত্র মা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়াই সম্ভব। তাই মাতৃসত্তা, যদিও আদিম সমাজের মাতৃসত্তা বলতে সম্পত্তি-উত্তরাধিকারের কথাটা বাদ দিয়ে চিন্তা করতে হবে। কেননা তখনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি দেখা দেয়নি, তাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারের কথাও ওঠে না। মাতৃসত্তা বলতে প্রধানতই বুঝতে হবে নারীর গৌরবময় প্রতিপত্তির কথাই। এই মাতৃসত্তা আজো পৃথিবীর আনাচে কানাচে অনেক আদিম জাতির মধ্যে টিকে রয়েছে এবং প্রাচীন পুঁথির মধ্যে টিকে আছে এর স্মৃতি।

তারপর, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে মানুষের হাতিয়ার অনেক উন্নত, অনেক ধারালো হয়ে উঠেছে। তার এই উন্নত হাতিয়ারের কল্যাণেই মানুষ শেষ পর্যন্ত বন্য দশাকে পেছনে ফেলে উঠে এল বর্বরতার স্তরে। বন্য দশায় মানুষের প্রাণ বাঁচতো জঙ্গল থেকে যোগাড় করা ফলমূল আর শিকার করা পশু-মাছ খেয়ে। কিন্তু বর্বর অবস্থার মাঝামাঝি দশায় পৌঁছে কোনো কোনো জায়গায় মানুষ শিখলো পশুপালন আর কোনো কোনো জায়গায় চাষবাস। তাই, মানুষের সম্পদ বেড়ে গেল অনেক, অনেকখানি। আর শেষ পর্যন্ত মানুষের সম্পদ রূপান্তরিত হলো

সম্পত্তিতে; আদিম সাম্যের অবস্থা ভেঙে গিয়ে দেখা দিলো শ্রেণীসমাজের সূচনা। বর্বর অবস্থার শেষাশেষিই মানব সমাজের উপর ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রভাবটা প্রকট হয়ে পড়ে।

বন্য দশা শেষ হয়ে বর্বর অবস্থায় পৌঁছবার মুখে যে মাঝামাঝি স্তর সেই স্তর থেকেই দেখা গেল মানুষের উৎপাদন শক্তিতে পরিবর্তনের দরুন যৌনসম্পর্কেও পরিবর্তন। দলগত বিয়ের বদলে যে নতুন ধরনের যৌনসম্পর্ক গড়ে উঠলো চলতি কথায় তাকে 'জুড়িবিয়ে' বলা চলে। বর্বর অবস্থায় এই জুড়িবিয়েই মানুষের যৌনসম্পর্কের বিশিষ্টরূপ।

বন্য দশায় নির্বিচার যৌনসম্পর্ক থেকে অজাচার বাদ পড়বার পর যে ধরনের দলগত বিয়ে প্রবর্তিত হয়েছিল তার মধ্যে ক্রমশ নিশ্চয়ই একজন পুরুষের কাছে অন্যান্য পত্নীদের মধ্যে একটি পত্নী প্রধানা হয়ে উঠেছিল এবং একজন নারীর কাছে অন্যান্য স্বামীদের মধ্যে একটি স্বামীই হয়ে উঠেছিল প্রধান: অর্থাৎ, একটি পুরুষের সঙ্গে একটি নারীরই সম্পর্ক দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। অজাচারমূলক বিধিনিষেধ যতই জোরালো হতে লাগলো ততই পুরুষ এবং নারীর যৌনজীবনের গণ্ডি সংকীর্ণ হয়ে আসা স্বাভাবিক। এই সব কারণের প্রভাবে শেষ পর্যন্ত দলগত বিয়ের বদলে দেখা দিলো জুড়িবিয়ে: পুরো একদল পুরুষের সঙ্গে একদল মেয়ের সম্পর্ক আর নয়; তার বদলে একটি পুরুষের সঙ্গে একটি নারীরই সম্পর্ক। তবু এই কাঠামোয় সম্পত্তি সঞ্চয়ের ফলে ও সম্পত্তির উপর পুরুষের অধিকার জন্মাবার ফলে ক্রমশ ব্যভিচার ও বহু নারী সম্ভোগে পুরুষের অধিকার দেখা দিলো, যদিও নারীর পক্ষে এই জাতীয় ব্যবহার অমার্জনীয় অপরাধ বলেই নিন্দিত হলো। তাই জুড়িবিয়ের অবস্থায় একটি নারী যতদিন একটি পুরুষের সঙ্গে রয়েছে ততদিন তার পক্ষে অন্য কারুর সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক ঘটলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা, যদিও পুরুষের বেলায় তা নয়। তবুও, জুড়িবিয়েতে বিবাহবিচ্ছেদ অনেক সহজ—পুরুষ এবং নারী দু'জনের মত হলেই এই বিবাহবন্ধন থেকে দু'জনেই মুক্তি পাবে এবং আগেকার মাতৃসত্তা অনুযায়ী ছেলেমেয়েদের উপর কর্তৃত্ব থাকবে নারীরই।

যেমন ধরা যায়, ভীম আর হিড়িম্বার সম্পর্ক, কিংবা চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের সম্পর্ক, ঋষি যবৎক্রতু ও নাগী যবৎক্রতুর সম্পর্ক, কিংবা মেনকা-বিশ্বামিত্রের সম্পর্ক। আসলে আমাদের দেশে আগেকার যুগে যাকে গন্ধর্ব-বিয়ে বলা হতো, তা খুব সম্ভব একরকম জুড়িবিয়েই।

কিন্তু বন্য যুগের দলগত বিয়েকে সরিয়ে জুড়িবিয়ে এমন কিছু রাতারাতি দেখা দেয়নি। তা ছাড়া জুড়িবিয়ে চালু হবার পরও অনেক জায়গায় দেখতে পাওয়া যায় মাঝে মাঝে আদিম যুগের দাবি নতুন ধরনের যৌনসম্পর্ককে সাময়িকভাবে টলিয়ে দিচ্ছে। কোনো কোনো নৃতত্ত্ববিদ্ অসভ্য জাতিদের মধ্যে কয়েকটি অদ্ভুত উৎসবের বর্ণনা দেন। এক রকম উৎসব হলো: বছরের একটা সময়ে এক জায়গায় অনেক নরনারী নির্বিচার মিলনের জন্য একত্রিত হয়। এর পিছনে নিশ্চয়ই অতীতকালের যৌনমুক্তির স্মৃতি আছে। ভারতবর্ষের হো এবং সাঁওতাল, পাঞ্জা ও কোতার পভৃতি জাতিগুলির মধ্যে এই জাতীয় উৎসব নৃতত্ত্ববিদদের চোখে পড়েছে।

তাছাড়া, বহুর সঙ্গে যৌনসম্পর্ক ছেড়ে শুধু একের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হবার আগে অনেক জায়গাতেই নারীকে প্রথমে মন্দিরে গিয়ে বহু পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। যেন সাময়িক সমর্পণ দিয়ে আজীবন সমর্পণের মূল্য চোকানো। ব্যাবিলোনিয়ায় বছরে একটা করে সময় প্রত্যেক মেয়েকেই মন্দিরে গিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হতো। মধ্য প্রাচ্যের অনেক দেশে প্রথা ছিল বিয়ের আগে প্রত্যেক মেয়েকে মন্দিরে গিয়ে কিছুদিন ধরে মুক্ত যৌনজীবন যাপন করতে হবে। আবার অন্যান্য কোনো কোনো জাতির মধ্যে ধর্মের এই মুখোশটা নেই, বিয়ের আগে পর্যন্ত প্রত্যেক মেয়ে মুক্ত যৌনজীবন যাপন করতে বাধ্য। মালয় এবং ভারতবর্ষের অনেক আদিম জাতির মধ্যে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। আবার কোনো কোনো জাতির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় যে, বিয়ের রাতে বধূর সঙ্গে প্রথম সহবাসের অধিকার স্বামীর নয়, বরযাত্রীদের। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকোতে পারবার পরই স্ত্রী স্বামীর কাছে যেতে পায়।

অন্যদের বেলায় এই ব্যবস্থা একটু-আধটু শুধরে নিতে দেখা গিয়েছে: বিয়ের রাতে বরপক্ষের প্রত্যেকেই বধুর উপর অধিকার স্থাপন করে না, সকলের বদলে একজন—বরপক্ষের তরফ থেকে একজন প্রতিনিধি যেন। অনেক দেশেই পুরোহিতরা এই ব্যবস্থার সুযোগ নিতে শিখলো, তাই এই সেদিন পর্যন্ত য়ুরোপের নানান জায়গায় পুরোহিতরা 'প্রথম রাতের অধিকার' আদায় করেছে। আজো আমাদের দেশে 'গুরুপ্রসাদী প্রথা' কোথাও প্রচলিত আছে কি না জানি না, তবে কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে প্রচলিত ছিল সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

দলগত বিয়ে উঠে যাবার পরও দলগত বিয়ের স্মৃতি রাতারাতি মুছে হায়নি। তারই প্রকাশ এই সব প্রথার মধ্যে। এইখানে মনে রাখা দরকার যে, যে-সামাজিক গড়নের পক্ষে দলগত বিয়ে স্বাভাবিক সেই গড়ন ভেঙে যাবার পর মেয়েদের মধ্যেই জুড়িবিয়ের তাগিদটা সবচেয়ে বেশি দেখা দিয়েছিল। সেইটেই স্বাভাবিক। কেননা, নতুন অর্থনৈতিক শক্তির প্রভাবে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন দেখা দেবার পর, ছোট ছোট আদিম সামাগোষ্ঠীগুলি ভেঙ্গে দিয়ে যতই জনাকীর্ণ নতুন মানব-বসতি দেখা দিতে লাগলো ততই পুরনো যুগের স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক থেকে বাদ পড়তে লাগল আদিম আর বুনো আর সরল সহজ ভাব। ফলে যৌনমুক্তি নারীর কাছে আর মুক্তি রইলো না, পরিণত হতে লাগলো বন্ধনে। মেয়েদের পক্ষে এই অবস্থায় যৌনমুক্তি হয়ে দাঁড়ালো নির্যাতন মাত্র। এবং মেয়েদের অবস্থা যতই এইভাবে শোচনীয় হয়ে উঠলো ততই তাদের মধ্যে যৌনমুক্তির নামে যে-প্রচ্ছন্ন নির্যাতন সেই নির্যাতনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টা ফুটে ওঠাই স্বাভাবিক। এক পুরুষের সঙ্গে ঘর বাঁধাতেই তারা পেলো এই নিষ্কৃতির সন্ধান। আমাদের দেশের প্রাচীন পুঁথিতে সুদর্শন-ওঘবতীর যে উপাখ্যান তার মধ্যে পরিচয় রয়েছে এই অবস্থায় নারী যখন বহুর উপভোগ্য হতে আপত্তি তুলেছে তখন স্বামীর মনে অস্বস্তির ভাব। ঋষি সুদর্শন আশ্রম ছেড়ে কিছুদিনের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন। এই সময়ে আশ্রমে এলেন এক ব্রাহ্মণ অতিথি। সুদর্শনের স্ত্রী ওঘবতী প্রথা অনুযায়ী শুধু যে অতিথির সেবা-যত্ন করলেন তাই নয়, অতিথির

সঙ্গে রাত্রি বাসও করলেন। সুদর্শন আশ্রমে ফিরে আসবার পর এই ঘটনা শুনে অত্যন্ত প্রীত বোধ করলেন—প্রীত, কারণ সেই যুগে মেয়েদের মনে এইভাবে উপভোগ্য হবার বিরুদ্ধে যে পুঞ্জীভূত বিরোধ, ওঘবতী সে-বিরোধের পরিচয় দেননি।

দলগত বিয়ে থেকে জুড়িবিয়ের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা মেয়েদের মধ্যেই দেখা দেওয়া স্বাভাবিক, পুরুষের মধ্যে নয়। পুরুষ আজো বহুকে উপভোগ করবার আকাঙ্ক্ষা ছাড়তে পারেনি। দেবদাসী-প্রথা থেকে শুরু করে গণিকাপ্রথা পর্যন্ত সর্বত্রই এর প্রমাণ। মেয়েরা জুড়িবিয়ের ব্যবস্থা চালু করবার পর পুরুষেরা আরো এক পা এগিয়ে এক-বিবাহ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হলো—এই এক-বিবাহ অবশ্য শুধুই মেয়েদের বেলায় প্রযোজ্য, পুরুষদের বেলায় নয়। সভ্য যুগের এক-বিবাহের কথায় একটু পরে ফিরে আসবো।

জুড়িবিয়ের সঙ্গে আধুনিক বিয়ে বা এক-বিবাহের তফাতটা মনে রাখতে হবে। জুড়িবিয়ের অবস্থায় পুরুষের উচ্ছৃঙ্খলতার সুযোগ যদিও বেশি তবুও নারী পুরুষের দাসী হয়নি। প্রথমত, দু'পক্ষের মত হলেই এই বিয়ে ভেঙে দেওয়া সম্ভব, বিয়ে তাই কারুর পক্ষেই বন্ধন নয়। দ্বিতীয়ত, সন্তানের উপর অধিকার নারীরই, বিয়ে ভাঙলেও সন্তান থাকে মা'র কাছে। অর্থাৎ, মাতৃসত্তার পুরো উচ্ছেদ হয়নি জুড়িবিয়ের অবস্থায়। তাছাড়া, অবারিত যৌনসম্পর্কের দাবি যখন নারীর পক্ষে দুর্বিসহ হয়ে দাঁড়াচ্ছিলো তখন নারীরই মধ্যে তাগিদ দেখা দিলো একপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবার। তবুও নারীর পক্ষে এই পথে মুক্তি খুঁজতে গিয়ে অনেকখানিই পুরুষের অধীনে এসে পড়তে হলো—জুড়িবিয়ের অবস্থাতে পুরুষের পক্ষে ব্যভিচার অপরাধ নয়, অপরাধ হলো নারীর পক্ষে যৌনমুক্তি।

বর্বর অবস্থার মাঝামাঝি থেকেই মানুষ শিখলো পশুপালন আর পশুপালনের অঙ্গ হিসেবেই শেষ পর্যন্ত কৃষি। কেননা, প্রথম দিকটায়

গৃহপালিত পশুর জন্যে খাবার যোগাড় করবার আশাতেই বুনো যব প্রভৃতির চাষ শুরু হলো, আর তারপর বুঝতে পারা গেল এই শস্য শুধু পশুর খাদ্য নয়, মানুষের খাদ্য হিসেবেও চমৎকার। মানুষের ইতিহাসে অতিবড় আশ্চর্য এই আবিষ্কার! খাদ্যের আশায় মানুষকে আর বনে বনে শিকারের পেছনে ছুটতে হয় না, গাছের শেকড় আর ফলের সন্ধানে হন্যের মতো ঘুরে বেড়াতে হয় না। খাদ্যের যোগাড় এল মানুষের হাতের মুঠোয়। এক কথায়, মানুষের উৎপাদন শক্তি বেড়ে গেল প্রায় অবিশ্বাস্যভাবে। আর এমনভাবে, উৎপাদন শক্তি বেড়ে যাবার দরুনই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে দুটি আমূল আর গভীর পরিবর্তন দেখা দিলো। এক হলো ক্রীতদাস-প্রথার সূত্রপাত, আর এক হলো নারীর উপর পুরুষের প্রতিপত্তি। পুরুষের এই প্রতিপত্তিকে দাসপ্রথারই অপরদিক বলা যেতে পারে; কেননা এরই দরুন নারী হয়ে দাঁড়ালো পুরুষের কাছে দাসী-বাঁদীরই সামিল।

উৎপাদনের উপায়ে উন্নতি দেখা দেবার কেন এই পরিণাম? প্রথমত ধরা যাক দাসপ্রথা। উৎপাদনের উপায়ে উন্নতি না হলে দাসপ্রথা সম্ভবই নয়। কেননা, তার আগে পর্যন্ত একজন মানুষ প্রাণপণ মেহনত করে যতটুকু খাদ্য উৎপাদন করতে পারে তার সবটুকুই খরচ হয়ে যায় কোনো মতে তার নিজের পক্ষে বেঁচে থাকবার জন্যেই। উৎপাদনের উপায় যতদিন অনুন্নত আর স্থূল ততদিন পরের মেহনত নিজের কাজে নিয়োগ করবার কথা ওঠে না, কেননা পরের মেহনত দিয়ে যেটুকু উৎপাদন তার সবটাই তার প্রাণধারণের জন্যে অনিবার্য। কিন্তু উৎপাদন শক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ালো অন্যরকম: নিছক নিজের পক্ষে বেঁচে থাকবার জন্যে যতটুকু জিনিস দরকার তার চেয়ে বেশি জিনিস উৎপাদন করতে শিখলো মানুষ। আর তাই একজন মানুষের পক্ষে আর একজন মানুষকে নিজের কাজে নিয়োগ করবার সম্ভাবনা দেখা দিলো। এর আগে পর্যন্ত বন্দী শত্রুদের হয় মেরে ফেলা, আর না হয় নিজের দলে নিয়ে নেওয়া হতো। এ ছাড়া তৃতীয় পথ ছিল না। কিন্তু পশুপালন আর কৃষি কাজ শেখবার পর বন্দী শত্রুদের ক্রীতদাস করে রাখবার সম্ভাবনা দেখা দিলো। পশুপালন আর

কৃষির কাজে তাদের শ্রম নিয়োগ করলে উৎপাদন বাড়বে অনেকখানি। এই অনেকখানি থেকে ক্রীতদাসকে শুধু ততটুকুই দেওয়া হবে যতটুকু না হলে তার পক্ষে নেহাত বাঁচাই অসম্ভব—বাকিটা যাবে নিয়োগকারীর ভাণ্ডারে। নিয়োগকারীরা ঠিক কারা? দলের পুরুষরা। আদিম বন্য অবস্থাতেই পুরুষ আর নারীর মধ্যে কাজের তফাত দেখা দিয়েছিল—ঘরের বাইরে খাবার যোগাড় করা ছিল পুরুষদের কাজ, ঘরের ভিতর শিশুপালন, খাবার তৈরি, কাপড় বোনা প্রভৃতি ছিল মেয়েদের কাজ। তাই, এই দু'রকম কাজের জন্যে যা কিছু জিনিস-পত্তর আর হাতিয়ার তখনকার দিনে সম্ভব তা শুধু পুরুষের কবলেই; কেবল গৃহপালনের জন্যে প্রয়োজনীয় হাতিয়ারের উপর অধিকার নারীর। ফলে, উৎপাদনের উপায়ে অমন আশ্চর্য উন্নতি দেখা দেবার দরুন শক্তি আর প্রতিপত্তি বাড়লো পুরুষদেরই, তারাই এই নতুন উৎপাদন-উপায়ের মালিক হলো। এর আগে পর্যন্ত পুরুষ আর নারীর মধ্যে মেহনতের ধরনে তফাত থাকলেও সে-তফাত মর্যাদার তফাতে পরিণত হয়নি; হলো উৎপাদনের উন্নতি দেখা দেবার পর। ভেঙ্গে গেল আগেকার যুগের সাম্য অবস্থা, কেননা এই সাম্যের ভিত্তি ছিল স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে মেহনতের মর্যাদার সাম্য। তার বদলে ফুটে উঠতে লাগলো পুরুষের প্রাধান্য।

পুরুষের প্রাধান্য—পিতৃ প্রাধান্য। জুড়িবিয়ের অবস্থাতেই সন্তানের মা-বাবার মধ্যে স্পষ্টভাবে বাবাকে চিনতে পারবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। এ-সম্ভাবনা ছিল না আদিম দলগত বিয়ের বেলায়। উৎপাদনের উপায় উন্নত হবার পর, পুরুষের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হবার পর, পুরুষ স্বভাবতই চাইলো পিতৃত্বের দাবিকে মাতৃত্বের দাবির চেয়ে বড় করতে। কেননা, পুরুষই হয়েছে সম্পদের অধিকারী; কিংবা, যা একই কথা, সম্পদ পরিণত হয়েছে সম্পত্তিতে। আর পিতৃত্বের দাবি ক্ষুণ্ণ হলে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে যে-ব্যবস্থা হবে পুরুষের পক্ষে তা সন্তোষজনক হতেই পারে না। মাতৃসত্তা ভেঙ্গে গিয়ে স্থান হলো পিতৃসত্তার। মাতৃসত্তার এই পরাজয়, এঙ্গেল্‌স্‌ বলেছেন, দুনিয়ার ইতিহাসে নারীজাতির সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক পরাজয়।

জুড়িবিয়ের অবস্থাতেও অন্তত নিজের সন্তানের উপর তার যে-অধিকার ছিল সেই অধিকার হলো লুপ্ত। নারীরা সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হলো সব রকম সামাজিক মর্যাদা থেকে।

তারপর, দিনের পর দিন, মানুষের ধন-উৎপাদন শক্তি আরো বেড়ে চললো, আর শেষ পর্যন্ত এই উৎপাদন শক্তির প্রসাদেই মানুষ বর্বর দশা পেছনে রেখে উঠে এল সভ্য অবস্থায়। সভ্যতার স্তরে শোষণ আর ব্যক্তিগত সম্পত্তির বনিয়াদ অনেক বেশি মজবুত হলো আর তাই সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে করতে হলো অনেক পাকা ব্যবস্থা। একেবারে নিখুঁত উত্তরাধিকারী চাই, তাই দরকার পড়লো একেবারে নিখুঁত এক-বিবাহ। অবশ্যই নারীর পক্ষে এক-বিবাহ—কেননা, পুরুষ যদি লাম্পট্য আর ব্যভিচার করে বেড়ায়ও তাহলেও সতীসাধ্বী স্ত্রীর গর্ভে তার যে-পুত্র জন্মাবে সেই পুত্রের পিতৃ-নির্ণয় নিয়ে কোনো রকম গোলযোগ হবার ভয় নেই। অপর পক্ষে, নারীর যৌনজীবনে বিন্দুমাত্র মুক্তি থাকলেই উত্তরাধিকারী পুত্রের পিতা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়। এক-বিবাহ মানে তাই বরাবরই স্ত্রীর পক্ষে এক-বিবাহ, কেননা এক-বিবাহের পিছনে যে আসল তাগিদ তা নির্ভুল উত্তরাধিকারী পাবার তাগিদ! সভ্যতার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত নরনারীর যৌনসম্পর্কের আসল রূপ এই এক-বিবাহই। এর ভিত্তি তাই বরাবরই পুরুষের আধিপত্য। তাই, সভ্যযুগের পুরুষ কোথাও বা প্রকাশ্যেই বহু বিবাহ করতে পারে, বহু রক্ষিতা রাখতে পারে; তার পক্ষে গণিকাগমন মৌখিকভাবে নিন্দিত হলেও আইনত অপরাধ নয়—আইনত অপরাধ হয় তখনই যখন সে কারুর বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে চায়, কেননা শুধুমাত্র এই ব্যবহারে শ্রেণীসমাজে এক-বিবাহের যে-আসল প্রয়োজন সেই প্রয়োজন সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে।

বর্বর-দশার জুড়িবিয়ের সঙ্গে সভ্য অবস্থার এক-বিবাহের তফাতটা আসলে তাই নারীর স্বাধীনতার তফাত। জুড়িবিয়ের

মধ্যে—অন্তত, জুড়িবিয়ের প্রথম দশায়—নারীর যৌনজীবনে মুক্তি ছিল অনেকখানি। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই যদি বিবাহ-বিচ্ছেদ চাইতো তাহলে সম্ভব হতো এই বিচ্ছেদ। এবং বিচ্ছেদের পর সন্তানের উপর অধিকার থাকতো স্ত্রীরই। কিন্তু এক-বিবাহের বেলায় তা নয়। স্বামী খুশি হলেই স্ত্রীকে বিদায় করতে পারে, ত্যাগ করতে পারে, এমন কি স্ত্রীকে ত্যাগ না করেও রাখতে পারে দাসী করে, যেতে পারে গণিকার ঘরে; কিন্তু স্ত্রীর পক্ষে মোটেই তা সম্ভব নয়। সভ্যতার প্রথম দিকে স্ত্রীর পক্ষে বিবাহ-বিচ্ছেদ পাওয়া তো কোনো মতেই সম্ভব ছিল না, তারপর আধুনিক আলোকপ্রাপ্ত দেশে আইনত, কাগজে-কলমে, যদিই বা তা সম্ভব হলো তবু অর্থনৈতিক কারণের চাপে বাস্তব ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই তা অসম্ভব। এক-বিবাহের যুগে নেহাত বেআইনী ব্যভিচার ছাড়া, কদর্যতার আশ্রয় ছাড়া, স্ত্রীর পক্ষে যৌনমুক্তি অসম্ভব।

আধুনিক আলোকপ্রাপ্ত যুগে এক-বিবাহের প্রকৃত রূপ নিয়ে আলোচনা তোলবার আগে প্রাচীন সভ্যতার এক-বিবাহের দুটি চরম নিদর্শনের উল্লেখ করা যাক: গ্রীক সমাজ ও ভারতীয় সমাজ।

এথেন্স-কে কেন্দ্র করে গ্রীক সভ্যতার যে-রূপ সেই রূপকেই তার চরম রূপ বলে স্বীকার করা হয়। এথেনীয় সভ্যতায় মানুষের যৌনসম্পর্কটা কি রকম? প্রথমে বিবাহিতা স্ত্রীর কথাটা ভাবা যাক। স্ত্রীদের জন্যে অন্তঃপুর, সেখানে অতিথি বা আগন্তুকদের পক্ষে পৌঁছনোই অসম্ভব। ক্রীতদাসীদের পাহারা, বাড়ির বাইরে পা বাড়াবার উপায় নেই। অন্তঃপুরেও প্রহরীর ব্যবস্থা। প্রাচ্যদেশে তো অন্তঃপুরের জন্যে খোজা প্রহরীর ব্যবস্থা ছিল। গ্রীকদের মধ্যে এই উদ্দেশ্যে ডালকুত্তার নিয়োগও সাহিত্যে পাওয়া যায় (এ্যারিস্টোফেনিসের সাহিত্য)। সে-যুগের নাট্যকার ইউরিপিডিস বিবাহিতা স্ত্রীকে গৃহস্থালীর একটি সামগ্রী হিসেবেই বর্ণনা করেছেন। গ্রীক সমাজের একদিকে স্ত্রীর সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখবার আশায় তাকে এইভাবে বন্দিনী ও ক্রীতদাসীর সামিল

করে ফেলা আর অপরদিকে ব্যাপকভাবে গণিকাপ্রথার প্রশ্রয়। গ্রীক সমাজে যে-ক'জন নারী বিদ্যা ও গুণের দিক থেকে স্মরণীয়া হতে পেরেছেন তাঁরা সকলেই গণিকা! সামাজিকভাবে মর্যাদা পেতে হলে নারীর পক্ষে বিবাহিতা স্ত্রী হওয়া চলবে না,—গণিকা হতে হবে—একটা সভ্যতায় নরনারীর সম্পর্ককে বিচার করবার পক্ষে শুধু এই ঘটনাটুকুই কি যথেষ্ট অর্থব্যঞ্জক নয়? গ্রীক যুগের পুরুষ নিজের স্ত্রীর সঙ্গে প্রণয় সম্পর্ককে লজ্জার বিষয়ই মনে করতেন; প্রণয় বলতে শুধু গণিকার সঙ্গে। স্ত্রীর সঙ্গে প্রণয় সম্ভবই নয়; কেননা শুধুমাত্র উত্তরাধিকারী উৎপাদনের জন্যেই স্ত্রীর প্রয়োজন, উৎপাদনের উপায় ছাড়া স্ত্রীকে আর কোনো রকমে মর্যাদা দিতে যাওয়া ভ্রান্ত ও অর্থহীন। বস্তুত, গ্রীক যুগের পুরুষ প্রণয়জীবন থেকে নারীর স্বাভাবিক স্থানকে এমন নির্মমভাবে বাদ দিতে চেয়েছিল যে, অধঃপতনটা উল্টে এসে পুরুষের যৌনজীবনকেও বিকৃত করে তুললো। তাই গ্রীক সভ্যতায় সমকামিতার অমন ঢালাও প্রশ্রয়—পুরুষের পক্ষে সমকামিতা।

ভারতবর্ষের ইতিহাসও এদিক থেকে স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে সমাজ স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে একেবারে খোলাখুলি কথা: পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা, পুত্র পিণ্ড-প্রয়োজনম্। অর্থাৎ, স্ত্রী হলো পুত্র উৎপাদনের উপায় মাত্র, পিণ্ডের প্রয়োজনে পুত্র। কিন্তু এই পুত্রের পক্ষে বিশুদ্ধ হওয়া দরকার, তাই দরকার হাজার রকম বিধি-নিষেধ দিয়ে স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষা করা। অতএব মনু বলছেন: 'প্রজাবিশুদ্ধর্থম স্ত্রীয়ন্ রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ'। স্ত্রীর চারদিকে পাহারার পাঁচিল গাঁথতে হবে, নইলে সন্তানের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করা যাবে না। ব্যক্তিগত সম্পত্তিই যে-সমাজের ভিত্তি, এই কথা হলো সেই সমাজের মনের কথা, যদিও অপর কোনো দেশের আইনকর্তাদের মুখে কথাটা এমন খোলাখুলিভাবে, প্রকাশিত হয়নি।

সভ্যতা শুরু হবার পর আমাদের দেশে মাতৃসত্তা সরে গিয়ে যখন পিতৃসত্তার জন্যে জায়গা করে দিলো, তখন সমাজে নারীজাতির স্থান ঠিক কি রকম হয়ে পড়লো তার নমুনা পাওয়া যায় গৌতম-গৌতমী, জমদগ্নি-রেণুকা, প্রভৃতির উপাখ্যান থেকে।

গৌতমের অনুপস্থিতিতে ইন্দ্র এলেন গৌতমীর কাছে এবং উভয়ে সহবাস করলেন। এই কথা জানতে পারার পর গৌতম রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন এবং ছেলেকে বললেন মা-র মাথা কেটে ফেলতে! জমদগ্নির চোখে পড়লো তাঁর স্ত্রী চিত্ররথ গন্ধর্বের দিকে প্রণয়ভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন; সঙ্গে সঙ্গে জমদগ্নি তাঁর পুত্র পরশুরামকে বললেন মা-র মাথা কেটে ফেলতে। পরশুরামের কুঠারে কাটা পড়লো রেণুকার মাথা। এই জাতীয় উপাখ্যানের সঙ্গে সুদর্শন-ওঘবতী উপাখ্যানের তুলনা করলেই বুঝতে পারা যায় শ্রেণীসমাজে স্ত্রীর স্থান কিসে পরিণত হলো। শুধু স্ত্রী নয়, নারী মাত্রেরই, কন্যারও। মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে গলভ-এর যে উপাখ্যান তাতে দেখতে পাওয়া যায় শ্রেণীসমাজে মানুষ কী ভাবে নিজের মেয়েকেও ভাড়া খাটাতে কসুর করেনি—মেয়েরা আর মানুষ নয়, তারা হয় উৎপাদনের উপায়মাত্র, আর না হয় তো উৎপন্ন পণ্যমাত্রে পরিণত হয়েছে। গুরুগৃহে শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর গলভ সমস্যায় পড়লেন: কী গুরুদক্ষিণা দেওয়া যায়? গলভ গিয়ে জয়ন্তীর সাহায্য চাইলেন এবং জয়ন্তী নিজের কন্যা মাধবীকে দিলেন এই উদ্দেশ্যে। তারপর গলভ মাধবীকে পরপর তিনজন রাজার কাছে ভাড়া দিলেন—প্রত্যেক রাজাই মাধবীকে উপভোগ করে এবং তার গর্ভে একটি করে সন্তান লাভ করে মাধবীকে ফিরিয়ে দিলেন। বিনিময়ে গলভ পেলেন দু'শ' ঘোড়া। এই দু' শ' ঘোড়া এবং মাধবীকে গুরুর কাছে দক্ষিণা হিসেবে দান করলেন গলভ। গুরু বিশ্বামিত্র ভোগ করলেন মেয়েটিকে এবং শেষ পর্যন্ত তার গর্ভে একটি সন্তান পাবার পর মাধবীকে ফেরত দিলেন গলভ-এর কাছে। গলভ মাধবীকে ফেরত দিলেন জয়ন্তীর কাছে। জয়ন্তী তখন স্বয়ম্বর-সভা ডেকে মাধবীর বিয়ের আয়োজন করতে গেলেন। কিন্তু এত দিনে মাধবীর মনে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা দেখা দিয়েছে: সকলকে প্রণাম জানিয়ে মাধবী স্বয়ম্বর-সভা থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে চলে গেলেন, গেলেন সোজা বনের দিকে। বনে গিয়ে প্রার্থনা আর উপবাস—নারীর জীবনে যে-গ্লানি দেখা দিয়েছে তার হাত থেকে নারীকে মুক্ত করবার জন্যে প্রার্থনা?

এই আধুনিক নরনারীসম্পর্কের আসল ভিত্তি হলো শোষণ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা এবং সভ্যতা শুরু হবার সময় থেকেই শোষণ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির দিগ্বিজয় শুরু হয়েছে। সভ্যতা যত এগিয়েছে ততই প্রকট হয়ে পড়েছে এগুলির দাবি। এঙ্গেল্স্ তাই বলছেন: "ইতিহাসে যখন প্রথম শ্রেণীসংঘাত দেখা দিলো তখন তার পাশাপাশিই দেখা দিলো এক-বিবাহের মাধ্যমে পুরুষ এবং নারীর মধ্যে সংঘাত; প্রথম শ্রেণীশোষণের পাশাপাশিই দেখা দিলো নারীর উপর পুরুষের দাপট। ঐতিহাসিকভাবে এক-বিবাহ এক বিরাট অগ্রগতি, সন্দেহ নেই; কিন্তু সেই সঙ্গেই মনে রাখতে হবে, এই এক-বিবাহই, দাস-প্রথা ও ব্যক্তিগত ঐশ্বর্যের পাশাপাশি এক নতুন যুগ এনেছে,—আজ পর্যন্ত চলেছে সেই যুগের জের— যে-যুগে প্রত্যেক অগ্রগতিই আবার একদিক থেকে আপেক্ষিক অধঃগতি মাত্র, যে-যুগে একদল মানুষের উন্নতি আর উৎকর্ষের পাশেই থাকে আর একদলের দুঃখ ও নিষ্পেষণ। এক-বিবাহ যেন কোষ আকারে সভ্য সমাজ এবং এরই মধ্যে আমরা দেখতে পাই সেই সব বিরোধ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব, যা উত্তরকালে সমগ্র সমাজের মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠলো।"

আদিম ও বর্বর যুগের মুক্তির বদলে শৃঙ্খলা ও দাসত্ব— নারীর পক্ষে দাসত্ব। তবুও যৌনমুক্তি-র তাগিদ মানুষের মন থেকে নিঃশেষে মুছে যাবার নয়। এ-তাগিদ টিকে রইল সভ্য যুগেও, এক-বিবাহের আড়ালেও, কিন্তু সহজ আর স্বাভাবিকভাবে নয়; কেননা সভ্যযুগের যৌনসম্পর্ক দাসত্বশৃঙ্খলের সম্পর্ক। শৃঙ্খল ও দাসত্ববন্ধনের কাঠামোর মধ্যে যৌনমুক্তির যে-তাগিদ তা বিকৃত ও বিকলাঙ্গ হতে বাধ্য। তাই সভ্যতা শুরু হবার পর থেকেই সমাজে এক-বিবাহ প্রবর্তিত হবার পর থেকেই, ছায়ার মতো তার পেছু পেছু চলেছে গণিকাবৃত্তি ও ব্যভিচার। স্বামীর পক্ষে গণিকাগমন, স্ত্রীর পক্ষে গোপন ব্যভিচার—কেননা, দাসত্বশৃঙ্খলের কাঠামোর মধ্যে যৌনমুক্তির তাগিদ এই দুটি বিকৃত পথে আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য। বিবাহ সম্পর্কের বাইরে কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা, পুরুষের পক্ষে নগদ মূল্য বিনিময়ে আর স্ত্রীর পক্ষে প্রবঞ্চনার অন্তরালে। তফাতের মধ্যে এই যে, পুরুষের বিকৃত যৌনমুক্তি—

গণিকাগমন—সামাজিকভাবে স্বীকৃত: মুখে যদিই বা নিন্দিত তবু কার্যক্ষেত্রে একে নিঃসংকোচে মেনে নেবারই লক্ষণ। কিন্তু মেয়েদের বেলায় তা নয়। সমাজে শাসন-অনুশাসনের যত রকম হাতিয়ার আছে তার প্রায় সবই এর বিরুদ্ধে উদ্যত। কেননা, একে যদি প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাহলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণীসমাজের ভিত্তিই টলে ওঠে। অথচ, মজা এই যে, অনুশাসনের চোখ রাঙানি দিয়ে যৌনমুক্তির তাগিদকে কোনোমতেই উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়নি, সম্ভব হয়নি নারীর জীবনে ব্যভিচার বন্ধ করা। তাই শেষ পর্যন্ত প্রায় নাচার হয়েই নেপোলিয়ন খোলাখুলি ভাবে আইন করলেন: বিবাহ দশায় যে-সন্তানের জন্ম, বিবাহিত স্বামীকেই তার বাবা বলে স্বীকার করতে হবে। তিন হাজার বছর ধরে এক-বিবাহ চালু করবার চেষ্টার তাহলে এই হলো চরম পরিণাম?

শ্রেণীসমাজের এক-বিবাহ। শ্রেণীসমাজের মূলে যে-দ্বন্দ্ব তারই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ এক-বিবাহের মধ্যে। এক-বিবাহ তার বিপরীতে পর্যবসিত, এক-বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য লাঞ্ছিত ও বিকৃত হতে বাধ্য! যতই দিন যেতে লাগলো ততই এ-কথা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগলো। আর শেষ পর্যন্ত এই বিয়ে, এঙ্গেলস্-এর ভাষায় "প্রায়ই পরিণত হয় সবচেয়ে স্থূল গণিকাবৃত্তিতে, কখনো বা উভয়ের দিক থেকেই, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু স্ত্রীর পক্ষেই। সাধারণ গণিকার সঙ্গে স্ত্রীর তফাত শুধু এই যে, দিনমজুরের মতো সাধারণ গণিকা খুচরো খুচরো ভাবে নিজের দেহকে ভাড়া খাটায় আর স্ত্রী বিক্রী করে নিজেকে একবার, একই সঙ্গে, বাঁদীদের মতো। এই জাতীয় সমস্ত বিয়ে সম্বন্ধেই ফ্যুরিয়রের কথাটা প্রযোজ্য: ব্যাকরণ অনুসারে দুটি নেতিবাচক শব্দ মিলে যেমন একটি অস্তিত্ববাচক শব্দ সৃষ্টি করে তেমনি বিবাহ-নীতিতেও দুটি গণিকাবৃত্তি সৃষ্টি করে সদাচার!

তবুও ঐতিহাসিকভাবে এক-বিবাহ একটা প্রকাণ্ড অগ্রগতিই। দাসত্বের কথা, শৃঙ্খলের কথা, সমস্ত কথা সত্য হলেও সভ্য সমাজে এক-বিবাহের যেটা সবচেয়ে উন্নত রূপ, তার মধ্যে একটি সম্ভাবনা

দেখা গেল, যে-সম্ভাবনা অতীতের আর কোনো যুগে, আর কোনো রকম সম্পর্কের মধ্যে দেখা যায়নি। এই সম্ভাবনা হলো ব্যক্তিগত যৌনপ্রণয়ের সম্ভাবনা। একটি পুরুষের পক্ষে সহজ ও সুস্থভাবে একটি মেয়েকে ভালোবাসার সম্ভাবনা; আবার মেয়েটির পক্ষে পুরুষটিকে ভালোবাসার সম্ভাবনা—এই কথাই হলো ব্যক্তিগত যৌনপ্রণয়ের কথা। এই সম্ভাবনা দেখা দিলো এক-বিবাহ চালু হবার পর, তার আগে নয়। তবু, মনে রাখতে হবে, গত তিন হাজার বছর ধরে যে-সভ্যতা, যে এক-বিবাহ তার কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তিগত যৌনপ্রণয়ের এই দাবি সফল হতে পারে না, সার্থক হতে পারে না, শুধুমাত্র অলীক সম্ভাবনা হিসেবেই থেকে যায়। কেননা, ব্যক্তিগত যৌনপ্রণয় সার্থক হতে পারে শুধুমাত্র সহজ সাম্যের ভিত্তিতে, স্বাধীনতার ভিত্তিতে। কিন্তু মানুষের শ্রেণীসমাজে স্বাধীনতা নেই—অর্থনৈতিক জীবনে স্বাধীনতা নেই, তাই সমাজনৈতিক জীবনেও নয়, যৌনজীবনেও নয়: শ্রেণীসমাজ হলো শোষণ আর শাসনের সমাজ; উৎপাদনের উপায়গুলো যে-সব মুষ্টিমেয় মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে স্বীকৃত হয়েছে তারা শোষণ করছে অগণিত জনগণকে। বাকি পাঁচ রকম উৎপাদনের উপায়ের মতো নারীও তার কাছে নির্ভুল উত্তরাধিকারী উৎপাদন করবার উপায়মাত্র। আর, না হয় তো, পরের মেহনত দিয়ে তৈরি পণ্য নিয়ে কেনা-বেচা করাই যেহেতু এ-সমাজের চরম আদর্শ, সেই হেতু নারীদেহও হয়ে দাঁড়ায় নগদ মূল্যের পণ্য বিশেষ—গণিকা। যেদিক থেকেই দেখা যাক না কেন, শ্রেণীসমাজে যৌনজীবনের সহজ ও স্বাধীন সাম্যের কথা ওঠে না। নারীর উপর পুরুষের চরম আধিপত্য। তাই এই সমাজের কাঠামোয় মুক্ত ও স্বাধীন যৌনজীবনের সুযোগ নেই, ফলে ব্যক্তিগত যৌনপ্রণয়ের দাবি ব্যর্থ ও লাঞ্ছিত হতে বাধ্য। তবু, এক-বিবাহের ভিত্তিতেই প্রথম দেখা দিলো ব্যক্তিগত যৌনপ্রণয়ের সম্ভাবনা। আদিম সাম্যাবস্থায় ছিল দলগত যৌনসম্পর্ক, তার মধ্যে ব্যক্তিগত যৌনপ্রণয়ের কথাই ওঠে না। তারপর জুড়িবিয়ের অবস্থাতেও নয়। কেননা জুড়িবিয়ের দশায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির সূত্রপাত দেখা দিয়েছে। সমাজে নারীর প্রতিষ্ঠায়

ধরেছে ভাঙন। তারপর শ্রেণীসমাজ ও সভ্যতার যুগ। কিন্তু শ্রেণীসমাজেরও ইতিহাস আছে, আছে যুগ পরিবর্তন। শ্রেণীসমাজের প্রথম দিকে, সামন্ত যুগের আগে পর্যন্ত, এক-বিবাহ প্রচলিত হলেও ব্যক্তিগত যৌনপ্রণয়ের দাবি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি : সে-যুগের মানুষের কাছে যতটুকু প্রকাশ্য ও সামাজিক যৌনজীবন ততটুকুর মধ্যে কর্তব্য আর দায়িত্ব হলো প্রধান কথা, প্রেম নয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক প্রধানতই কর্তব্যের সম্পর্ক, ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগের স্থান তার মধ্যে নেই! বিয়ের মূলে প্রেমের তাগিদ নয়। বরং বিয়ের ফলে যতটুক সান্নিধ্যের আকর্ষণ ততটুকুর নামই ভালোবাসা। তাছাড়া বিয়ের ব্যাপারে মেয়েদের ইচ্ছাকেও যে একটা জরুরী বিষয় বলে গণ্য করা দরকার, সে-চেতনাই নেই। প্রণয় যতটুকু ততটুকু নর্তকীর সঙ্গে, গণিকার সঙ্গে—অর্থাৎ স্বীকৃত সামাজিক ব্যবস্থার পাশে ভণ্ডামির পর্দা খাটিয়ে, আড়াল করে। আর, তাছাড়া অবশ্য সমাজে যাদের মানুষ বলে গণ্য করবার দরকার নেই সেই সব নরনারীদের মধ্যে---রাখালদের মধ্যে বা এমন কি ক্রীতদাসের মধ্যে। তাই সে-যুগের লোকসঙ্গীত প্রভৃতিতে এর স্মৃতি কিছুটা টিকে আছে। মোটের উপর, প্রকাশ্য সমাজের শিখরে কোথাও নয়। সমাজের শিখরে প্রেম বলে যদিই বা কিছু থাকে তাহলে তা ব্যভিচারের রূপান্তর।

কথাটা আরো পরিষ্কার হয়ে উঠলো মধ্যযুগের পর থেকেই। মধ্যযুগে ব্যক্তিগত প্রণয়ের দাবি স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ রূপ গ্রহণ করলো। তবুও সামাজিক গণ্ডির মধ্যে নয়, ব্যভিচারের আশ্রয়েই। আমাদের দেশে 'কথাসরিৎসাগর', 'মালবিকাগ্নিমিত্র', 'মালতীমাধব', 'দশকুমার', প্রভৃতি গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য হলো এই ব্যভিচারই। নায়ক-নায়িকার দৌত্যকার্যে মনোনিবেশ করলো জৈন-বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীরা। শেষ পর্যন্ত ঘরের বৌ সামলে রাখাই প্রায় দায় হয়ে দাঁড়ালো, এমন কি মহর্ষি বাৎসায়ন পর্যন্ত শঙ্কিত হয়ে বললেন : সতী নারীর পক্ষে ভিক্ষুনী, শ্রমণা, ক্ষপনা প্রভৃতির সঙ্গে মেশাটা বিপজ্জনক।

অবশ্য অপরদিকে এই বাৎসায়নই পরস্ত্রীকামী রাজা ও রাজতুল্য ব্যক্তির পক্ষে কি ভাবে উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা সবচেয়ে

সহজ সে-উপদেশ দিতে ভোলেননি। ব্যক্তিগত যৌনপ্রণয়ের কথা বাৎসায়নের কামসূত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে সন্দেহ নেই; কিন্তু সহজ স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের ব্যাপারে ততখানি নয় যতটা হলো সামাজিক ব্যবস্থার অন্তরালে।

ইওরোপেও মধ্যযুগে ব্যক্তিগত যৌনপ্রণয়ের কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইওরোপেও সহজ স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের সঙ্গে, সামাজিকভাবে স্বীকৃত যৌনজীবনের সঙ্গে, প্রণয়ের সম্পর্কটা শিথিল। অর্থাৎ, সামাজিক যৌনজীবনের সঙ্গে ব্যক্তিগত যৌনপ্রণয়ের বোঝাপড়া হতে পারেনি। মধ্যযুগ হলো বীরত্বের যুগ; কিন্তু বীরপুরুষদের প্রেয়সীরা প্রায়ই পরস্ত্রী। ব্যক্তিগত যৌনপ্রণয় বলতে যা কিছু তা প্রায়ই বিবাহিত জীবনের বাহিরে। এই কথার ভালো নমুনা সে-যুগের 'ভোরের গান,' বা 'Songs of the Dawn' গানগুলির মূল বিষয়-বস্তু; বীরপুরুষ তাঁর প্রেয়সীর সঙ্গে নিশি যাপন করছেন, প্রেয়সী অবশ্যই পরস্ত্রী; বাইরে মোতায়েন আছে প্রহরী, আকাশে উষার প্রথম চিহ্ন ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বীর নাইটকে ডাক দিচ্ছে প্রহরী, পাছে তিনি ধরা পড়ে যান।

তারপর ধনতন্ত্রের যুগ। ব্যক্তিগত যৌনপ্রণয়ের দাবি এই যুগে স্পষ্ট ও নির্ভিকভাবে মাথা তুলে দাঁড়ালো। ধনতন্ত্রের যুগেই মানুষ প্রথম ভাবলো বিবাহের মূলে, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের মূলে থাকবে যৌনপ্রণয়—পুরুষ এবং স্ত্রীর মধ্যে সহজ সুস্থ ভালোবাসা। ভালোবাসার দাবি ভণ্ডামির আশ্রয়ে নয়, ব্যভিচারের গণ্ডিটুকুর মধ্যে নয়, গণিকাগৃহের হুল্লোড়ের আড়ালে নয়—পরিষ্কারভাবে, খোলাখুলিভাবে, বিবাহ-সম্বন্ধের অঙ্গ হিসেবেই, বিবাহ-সম্বন্ধের মূল প্রেরণা হিসেবেই। তবু শ্রেণীসমাজেরই চরম রূপ এই ধনতন্ত্র। তাই এর ভিত্তিতে শোষণ আর লুণ্ঠনের চরম আয়োজন। ফলে, ধনতন্ত্রের আওতায় ব্যক্তিগত যৌনপ্রণয়ের দাবি যে-রকম স্পষ্টভাবে মাথা তুলে দাঁড়ালো সেই রকম নির্মমভাবেই তা রূপান্তরিত হলো গ্লানি এবং কদর্যতায়। শ্রেণীসমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব: এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে অগ্রগতির অপর পিঠেই অধোগতি। ধনতন্ত্র যেসব বিরাট বিপ্লবী সম্ভাবনাকে ডাক দিয়েছে সেই সব সম্ভাবনাকেই

পরিণত করেছে ব্যর্থ পরিহাসে। তাই, সেই সব সম্ভাবনা ধনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে বাস্তবে পরিণত হতে পারে না। বরং তাদের পক্ষে বাস্তবে পরিণত হবার দাবি ধনতন্ত্রের কাঠামোকে ভেঙে চৌচির করে দিতে চায়। ব্যক্তিগত যৌনপ্রণয়ের বেলাতেও এই কথা। ধনতন্ত্রই প্রথম স্পষ্ট ও নির্ভুল দাবি তুললো ব্যক্তিগত যৌনপ্রণয়ের এবং ধনতন্ত্রের আমলেই সবচেয়ে নগ্নভাবে দেখা গেল নারী কেমনভাবে উৎপাদনের উপায়মাত্রে, বা নগদ মূল্যের পণ্যমাত্রে পরিণত হয়েছে। এঙ্গেল্‌স্ বলছেন, "আধুনিক সংসার মাত্রেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নারীকে দাসীতে পরিণত করবার উপর নির্ভর করছে। আর এই রকম এক-একটি সংসারকে অণু হিসেবে ব্যবহার করেই গড়ে উঠেছে আধুনিক সমাজ। আজকের দিনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষকে উপার্জন করতে হয়, সংসারের ভরণপোষণ তারই উপর নির্ভর করছে; অন্তত সম্পত্তির মালিক শ্রেণীর মধ্যে সর্বত্রই এই কথা। এরই ফলে, সংসারে তার স্বাভাবিক প্রতিপত্তি—সে-প্রতিপত্তির জন্যে বিশেষ কোনো আইনের দরকার পড়ে না। সংসারের মধ্যে সে হলো মালিক আর স্ত্রী হলো শ্রমিকের প্রতিনিধি।"

অবশ্যই আধুনিক পৃথিবীতে শুধুমাত্র এই মালিকশ্রেণীটুকুই নয়। এ ছাড়া রয়েছে শ্রমিকশ্রেণী, তারাই হলো সমাজের অসংখ্য জনগণ। তার বেলায় কিন্তু অন্য কথা: তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত বলেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির গ্লানি থেকেও মুক্ত। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ঔদ্ধত্যেই, ব্যক্তিগত সম্পত্তির চাহিদাতেই, সংসারে স্ত্রীর উপর পুরুষের প্রতিপত্তি। ফলে, মেহনতকারীদের শ্রেণীতে যৌনপ্রণয়ের স্পষ্ট ও নির্ভীক স্বাক্ষর। আজকের দিনে বিশেষ করে মজুরশ্রেণীর মধ্যেই স্বামী-স্ত্রীর প্রতি সহজ ও স্বাভাবিক যৌন আকর্ষণ হওয়া সম্ভব; কিংবা, যা একই কথা, যৌন আকর্ষণ অপর কোনো হিসেব-নিকেশের গোলামী করতে বাধ্য নয়। নরনারীর যৌনপ্রণয়ের দিক থেকে ইতিহাসে যে সম্ভাবনা—সবচেয়ে বিস্ময়কর ও বিরাট সম্ভাবনা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির তাড়নামুক্ত সুস্থ ও সহজ যৌন আকর্ষণের ভিত্তিতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের সম্ভাবনা—তা একমাত্র আধুনিক মজুরশ্রেণীর মধ্যেই

সম্ভব। তার আসল কারণ, আজকের দিনে একমাত্র মজুরশ্রেণীর মধ্যে সামাজিকভাবে মেহনতের মর্যাদায় স্ত্রী-পুরুষ সমানে সমান হতে পেরেছে। আর, এই শ্রেণীর মধ্যে মেহনতের দিক থেকে স্ত্রী-পুরুষের সহজ সাম্য বর্তমান বলেই, এখানে সম্ভব যৌনমুক্তি। আদিম যুগে স্ত্রী-পুরুষের সাম্যের মূলে ছিল মেহনতের মর্যাদায় উভয়ের সমান ভাব। কিন্তু আদিম যুগের এই সাম্য দারিদ্র্যের সাম্য, অভাবের চাপে সাম্য। প্রাচুর্যের উচ্ছ্বাসে সাম্য নয়। অথচ, আধুনিক যুগে মানুষের মুঠোয় এসেছে বিস্ময়কর ও প্রায় অবিশ্বাস্য উৎপাদন শক্তি; ব্যক্তিগত মালিকানার শাসনে সেই উৎপাদন শক্তি অবশ্য সংকুচিত ও বিড়ম্বিত, তবুও ব্যক্তিগত মালিকানার এই গ্লানিকে উচ্ছেদ করা গেলে এই অবিশ্বাস্য উৎপাদন শক্তি পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী গড়তে পারে, প্রাচুর্যে টলমল সেই পৃথিবী!

দৈত্যের মতো বিরাট কারখানা। সেখানে স্ত্রী-পুরুষের মেহনত সমান মর্যাদা পেতে পারে। ধনতন্ত্রের দৌলতে কৃষিতে ও পশুপালনের কাজেও আশ্চর্য কৌশল ও যন্ত্রশক্তির প্রয়োগ। সেখানেও স্ত্রী-পুরুষের মেহনত সমান মর্যাদা পেতে পারে। কিন্তু, —আর এইটেই হলো জরুরী কথা,—ধনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে নয়, শ্রেণী শোষণের ভিত্তিতে নয়। কেননা, যতদিন উৎপাদনের উপায়গুলো ব্যক্তিগত মানুষের কবলে, আর তারই জোরে পরের মেহনত দিয়ে তৈরি জিনিস লুঠ করবার ব্যবস্থা, ততদিন মজুর নারীর যৌনজীবনেও মূল সামাজিক গ্লানি একদিক থেকে প্রতিফলিত: তার ঘরের কাজ আর কারখানার কাজে, সংসারের মেহনত আর সামাজিক মেহনতে, সামঞ্জস্য নেই। তাই, ঘরের কাজে মন দেবার সময় সামাজিক মেহনত থেকে সে বাদ পড়ে, অর্থ উপার্জনে অক্ষম হয়; আবার সামাজিক মেহনতে যতক্ষণ সে নিযুক্ত ততক্ষণ ঘরের কাজে মন দেবার উপায় তার নেই। অথচ, আধুনিক ধনতন্ত্রই পৃথিবীর চেহারাকে এমনভাবে বদল করে চলেছে যে, দিনের পর দিন সংসারের মেহনত আর সমাজের মেহনতের মধ্যে তফাত ক্ষীণ হয়ে আসছে। যেমন ধরুন, রান্নাবান্না

আর শিশুপালন। সংসারের কাজ বলতে পনেরো আনার বেশিই তো এই। অথচ, শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে উন্নতি যত বাড়ছে ততই ঘরের হেঁসেলে নারীর কাজ হয়ে দাঁড়াচ্ছে হালকা; বাড়ছে হোটেলে খাবার পাট। দিনের পর দিন মানুষ বুঝছে ঘরে ঘরে স্বতন্ত্রভাবে শিশুপালনের চেয়ে এক জায়গায়—শিশুপালন কেন্দ্রে (nursery-তে)—শিশুর পালন শুধু যে মায়ের প্রয়োজনের খাতিরে বাঞ্ছনীয় তাই নয়, শিশুর নিজের কল্যাণের খাতিরেও।

যৌনজীবনের ইতিহাসের একটা খসড়া করা গেল।

আমাদের পিছনে এক শ্রেণীহীন সমাজের স্মৃতি, আমাদের সামনে আজ নিঃশ্রেণীক সমাজের আহ্বান, আর মাঝখানটুকুতে আমরা, আমরা যারা শ্রেণীসমাজের মানুষ। যতদিন আদিম শ্রেণীহীন সমাজ ছিল ততদিন ছিল যৌনমুক্তি। যৌনমুক্তির প্রধান নির্ভর ছিল সমাজে নারীর স্বাধীন ও মুক্তসত্তা আর নারীর এই মুক্তির মূলে ছিল সামাজিক মেহনতের মর্যাদায় পুরুষের সঙ্গে তার সহজ সাম্য অবস্থা। কিন্তু এই নিঃশ্রেণীক সমাজের ভিত্তিটা নেহাতই দারিদ্র্যের ভিত্তি, অভাবের চাপে সব মানুষ সমান, প্রাচুর্যের উচ্ছলতায় নয়। সে-যুগের যৌনমুক্তিও তাই অভাবের আশ্রয়েই বাস্তব হতে পেরেছিল। দল বেঁধে একসঙ্গে বাঁচা, তাই যৌনসম্পর্কও একান্তই দলগত। তবু অভাবের চাপে হলেও সাম্য-জীবন, এবং সাম্য-জীবনের যেটা বৈশিষ্ট্য সেটা প্রকাশ পেয়েছিল আদিম মানুষের মধ্যেও। তারপর, মানুষের উৎপাদন শক্তি বাড়লো, বন্য দশা থেকে বর্বর অবস্থাকে পেরিয়ে মানুষ উঠে এল সভ্যতার স্তরে। সভ্যতার মুখোমুখি অবস্থা থেকেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতিপত্তি আর তারই চাপে এক-বিবাহ। পুরুষের প্রতিপত্তি আর নারীর দাসীভাব দিয়েই গাঁথা হয়েছে এই এক-বিবাহের বনিয়াদ, সেদিক থেকে মানুষের যৌনসম্পর্কের চরম পরাজয়ের পরিচয় এই এক-বিবাহের মধ্যে। কিন্তু সভ্যতার উন্নতির দরুন শেষ পর্যন্ত এক-বিবাহই মানুষের যৌনজীবনে

আনলো বিরাট বিপ্লবী সম্ভাবনা। ভালোবাসার সম্ভাবনা, ব্যক্তিগত যৌনপ্রণয়ের সম্ভাবনা। অবশ্য শ্রেণীসমাজের কাঠামোয় ওই সম্ভাবনা সার্থক হতে পারে না, কেননা এর বাস্তব সার্থকতা নির্ভর করছে নরনারীর মধ্যে সহজ সাম্যসম্পর্কের উপর। এই সহজ সাম্য শ্রেণীসমাজে সম্ভব নয়, তাই আজকের সমাজে যৌনপ্রণয়ের দাবি বিপরীতে পর্যবসিত—এক-বিবাহের উল্টো পিঠে তাই সবচেয়ে খোলাখুলি আর নির্লজ্জ গণিকাবৃত্তি আর ব্যভিচার! যতদিন সামাজিক মেহনতের মর্যাদায় নরনারী সমান ছিল ততদিন ছিল নারীর মুক্তি ও স্বাধীনতা। আজও সমাজের যেখানে মেহনতের মর্যাদায় নরনারী সমান হতে পারে সেখানে নারীর জীবনে সহজ মুক্তি। তাই, আজকের দিনে সত্যিই যদি ব্যক্তিগত যৌনপ্রণয়কে মর্যাদা দিতে হয় তাহলে প্রধান কাজ হবে সামাজিক মেহনতের মর্যাদা নারীর কাছে ফিরিয়ে আনা।

আজ আমাদের সামনে এক নিঃশ্রেণীক সমাজের আহ্বান! সেই সমাজের ভিত্তিতে আদিম যুগের মতো অভাব আর দারিদ্র্য নয়, তার বদলে প্রাচুর্যই। সেখানে যৌনজীবনের মুক্তি, কিন্তু আদিম যুগের মতো দলগত যৌনজীবন নয়,—সহজ ও স্বাভাবিক ভালোবাসার ভিত্তি, যৌনপ্রণয়ের ভিত্তি। সেও এক রকমের এক-বিবাহই, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির দাবতে এক-বিবাহ নয়। এই এক-বিবাহ থেকে সম্পত্তির গ্লানি মুছে যাবে, কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হবে কোন্ নতুন গৌরব? এঙ্গেল্‌স্ বলছেন, "সে প্রশ্নের মীমাংসা করবে নতুন যে-মানুষ গড়ে উঠবে; যে-দলের পুরুষরা জীবনে একবারও নগদ মূল্যের বিনিময়ে বা সামাজিক শক্তির প্রভাবে কোনো নারীর সমর্পণ কিনতে পারেনি, আর যে দলের নারীরা শুধুমাত্র প্রেমের তাগিদ ছাড়া আর কোনো তাগিদে কখনো কোনো পুরুষের কাছে নিজেদের সমর্পণ করতে বাধ্য হয়নি, কিংবা অর্থনৈতিক ফলাফলের ভয়ে যাকে সে ভালোবেসেছে তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে সাহস পায়নি বলে হটে গিয়েছে। সেই ধরনের মানুষের দল যখন দেখা দেবে তখন আমরা তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে আজ কী ভাবি-না-ভাবি সে-কথায় বিন্দুমাত্র মন দেবার দরকার তারা অনুভব করবে না।"

দুই : নতুন পৃথিবী

কী অভিজ্ঞতা ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মেয়েরা

তাহলে, নরনারীর সম্পর্ককে সুস্থ ও স্বাভাবিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রথম প্রয়োজন হলো মেয়েদের মুক্তি। অবশ্য মেয়েদের মুক্তি শুধুমাত্র পারিবারিক জীবনের প্রয়োজনেই নয়, সমগ্র সমাজের প্রয়োজনেই। ১৮৬৬-র আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী সম্মেলনে মার্কস বলেছিলেন—মেয়েদের নানান রকম অর্থনৈতিক বন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়া না গেলে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে মজুরশ্রেণীর সংগ্রাম ব্যর্থ হবে। উপস্থিত বিশেষ করে যৌনজীবন নিয়েই আলোচনা, তাই সুস্থ ও সহজ যৌনজীবনের পক্ষে মেয়েদের মুক্তি যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন—বিশেষ করে সেই কথারই উল্লেখ করছি।

এখানে একটা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার: সোবিয়েৎ দেশে মেয়েদের মুক্তিকামনার মূলে রয়েছে প্রয়োজন-বোধ, প্রয়োজনের তাগিদ। শুধু সুস্থ পারিবারিক জীবনের জন্যে প্রয়োজন নয়, ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর অভিযানের জন্যেও। আর এই অভিযানই যেহেতু সোবিয়েৎ সমাজের মূল কথা, সেই হেতু মেয়েদের মুক্তি ওদের কাছে সামাজিক অগ্রগতির জন্যেই প্রয়োজন, নতুন পৃথিবীর ভিত্ গাঁথবার জন্যেই প্রয়োজন!

এই প্রয়োজন-বোধের কথাটা খুব জরুরী। কেননা, পৃথিবীর আর কোনো দেশে আর কোনো যুগে নারীর মুক্তি এমন একান্তভাবে প্রয়োজন হিসেবে স্বীকৃত হয়নি। অন্য দেশে, অন্য যুগে নারীর মুক্তির কথা উঠেছে,—কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে নয়, হৃদয়াবেগের তাগিদে, হয় তো ভাবরাজ্যের কোনো এক মতবাদের খাতিরে। কিন্তু হৃদয়াবেগের দাবিটা নেহাতই খুশির ব্যাপার, মর্জির ব্যাপার। ভাবরাজ্যের চাহিদা বড়-জোর ব্যক্তিবিশেষের মনের চাহিদা। অথচ, প্রয়োজনের চাহিদাটা অন্য রকম;

তার মধ্যে খুশি-অখুশির কথা নেই, মর্জি-অমর্জির কথা নেই। শখ না-হয় না মেটালেও চলে, কিন্তু প্রয়োজনকে না মিটিয়ে উপায় নেই। প্রয়োজনের চাহিদা মেটাতে গেলে শিরদাড়া সোজা করে উঠে দাঁড়াতে হয়, এগোতে হয় বাস্তবের পথ ধরেই!

প্রয়োজনের তাগিদ উঠেছে বলেই মেয়েদের মুক্তির জন্যে সোবিয়েৎ দেশ বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার সাহায্য নিয়েছে। পৃথিবীর আর কোনো দেশে আর কোনো যুগে এমন ব্যাপার সম্ভবই হয়নি। অন্য দেশে, অন্য যুগে শুনতে পাওয়া গিয়েছে মানব জাতির কল্যাণ কামনা। শোনা গিয়েছে পরোপকারের কথা, দয়াধর্মের কথা। মানবাত্মার মুক্তিকল্পে অনেক উচ্ছ্বাস, অনেক অলঙ্কার। কবিতায় আর গানে, গল্পে আর উপন্যাসে, প্রবন্ধে আর বক্তৃতায়, নানান ভাবে। হৃদয়বানেরা দাতব্য করেছেন, পাঠশালা খুলেছেন, হাসপাতাল খুলেছেন, খুলেছেন অনেক রকম নারীউন্নয়ন সমিতি। কিন্তু সোবিয়েৎদের মুখে একেবারে অন্য কথা: "আমরা শুধুই অর্থনৈতিক ভিত্তিতে নতুন করে মানব-সমাজ গড়ছি না, আমরা মানবজাতির মেরামত করছি বৈজ্ঞানিক সূত্র অনুসারে"। মস্কো স্পোর্টিস ক্লাবে লেখা আছে এই কথা আর এই কথার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে সোবিয়েতের মূলনীতি।

বৈজ্ঞানিক সূত্র অনুসারে মানবজাতিকে মেরামত করা! আর, ওয়েব-দম্পতি বলছেন, 'রাশিয়ার জনগণকে নতুন করে গড়তে গিয়ে লেনিন ও তাঁর সহকারীরা কাজ শুরু করলেন ইভকে নিয়ে, আদমকে নিয়ে নয়।' অর্থাৎ মানবজাতিকে মেরামত করতে গিয়ে সোবিয়েৎ প্রথম দৃষ্টি রাখলো মানবীর প্রতি, মেয়েদের প্রতি, পুরুষদের প্রতি নয়। কেননা, মেয়েদের মুক্তি বাদ দিয়ে মানবজাতির মেরামতটা শুধুই ফাঁকা কথা, হৃদয়াবেগের কথা, বিজ্ঞানের কথা নয়।

বিজ্ঞানের উপর এই ঝোঁক, বাস্তবের প্রতি এই দৃষ্টি—এই দিক থেকেই সোবিয়েৎ দেশের সঙ্গে বাকি সব যুগের একেবারে মৌলিক তফাত। অন্যান্য দেশে বড় জোর আইন পাশ করানো গেল মেয়েদের মুক্তি নিয়ে: কিন্তু আইনটা নেহাতই আটকা রইল পুঁথির পাতায়। আইন পাশ করানো আর বাস্তবে আইনকে প্রয়োগ করা, জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ করে তোলা—এ-দু'-এর

মধ্যে অন্যান্য দেশে মস্ত ব্যবধান। আইনজীবীদের তহবিলে টাকা ঢেলে এই ব্যবধানকে হয়তো খানিকটা পূরণ করা সম্ভব, কিন্তু টাকা ঢালাটা সম্ভব হয় না অধিকাংশের পক্ষেই; তাই, প্রায়ই আইন থাকে আদালতের অলঙ্কার হয়ে, মাটির পৃথিবীতে যারা বাঁচছে তাদের জীবনে সে-আইন সমৃদ্ধি আনতে পারে না। যেসব দেশে নারীমুক্তির জন্যে আইন পাশ করানো সম্ভবও হয়েছে, সেই সব দেশের বেলাতেই এই কথা। তাছাড়া মেয়েদের মুক্তি নিয়ে আইন পাশই বা হয়েছে ক'টা দেশে? কিন্তু সোবিয়েতের বেলায় একেবারে অন্য কথা। গঠনতন্ত্র গড়বার সময় ওরা ঠিক করলো: "সমস্ত রকম অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য সার্বজনীন ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ইউ. এস. এস. আর-এর মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকাব পাবে। এই সমান অধিকার কাজে পরিণত করবার সম্ভাবনা নিম্নোক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত: মেয়েদের পক্ষে পুরুষদের সঙ্গে সমান কাজ করবার অধিকার, সমান বেতন পাবার, বিশ্রাম পাবাব ও অবসর বিনোদনের অধিকার, সামাজিক বীমা এবং শিক্ষা, মা ও শিশুর স্বার্থকে রাষ্ট্রব্যবস্থা দ্ববা রক্ষা করা, বড় পরিবারেব মা আর অবিবাহিতা মা-কে রাষ্ট্রীয় অর্থ সাহায্য, পুরো বেতনে মাতৃত্বের ছুটি এবং অত্যন্ত ব্যাপকভাবে মাতৃসদন (maternity homes), শিশুসদন (nurseries) ও খেলাঘর (kinder-garten)-এর জাল বিস্তার করা।" আসলে কিন্তু শুধু গঠনতন্ত্রে এই ক'টি কথা লিখে রাখা নিয়ে উচ্ছ্বাস করবার বিশেষ কিছু নেই; অনেক দেশের গঠনতন্ত্রেই অনেক রকম ভালো ভালো কথা লেখা থাকে। সোবিয়েৎ দেশের বৈশিষ্ট্য হলো মেয়েদের মুক্তির জন্যে শুধু কয়েকটি ভালো ভালো আইন পাশ করিয়েই ওরা ক্ষান্ত হয়নি, গঠনতন্ত্রে কিছু সাধুবাক্য লিখে রেখেই ওরা নিশ্চিন্ত আত্মপ্রসাদে কাল যাপন করতে রাজী নয়। ওদের কাছে সবচেয়ে বড় কথা, বাস্তবের কথা। তাই শুধু আইন করা নয়, আইনকে বাস্তব সমাজে সফল করা। দু'-একটা খুচরো নমুনা তোলা যায়। ওদের দেশে আইন হলো: গ্রামে বা শহরে যেখানেই হোক না কেন, কোনো মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হলে (সে মেয়ের বিয়ে হোক আর নাই হোক) রাষ্ট্রের কাছ থেকে বিনা

পয়সায় নিম্নোক্ত সুবিধে-সুযোগ পাবে: (১) অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় চিকিৎসামূলক যত্ন ও তদারক, (২) প্রসবের জন্যে প্রসব-হাসপাতালে জায়গা, (৩) পুরো বেতনে বারো থেকে ষোল সপ্তাহের ছুটি, (৪) সব সময় চিকিৎসামূলক সাহায্য ও তদারক, (৫) স্বাস্থ্যের দিক থেকে যখনই সে সম্পূর্ণভাবে কাজের উপযুক্ত হবে তখনই তার নিজের চাকরিতে যোগ দিতে পারার অধিকার, (৬) কাজে যোগ দেবার পর নবজাতককে স্তন্যদানের জন্যে প্রতি সাড়ে তিন ঘণ্টা অন্তর আধঘণ্টা করে ছুটি, (৭) নবজাতকের জামা-কাপড় কেনবার জন্যে নগদ টাকা, (৮) সন্তান জন্মাবার পর থেকে এক বছর ধরে তার খাদ্য বাবদ মাসে মাসে নগদ টাকা, (৯) মা যতক্ষণ কাজ করবে ততক্ষণ শিশুকে সামলাবার জন্য খেলাঘরের (criche) সুযোগ, দু'মাস বয়েস থেকে পাঁচ বছর বয়েস পর্যন্ত শিশুরা এই সব খেলাঘরে মানুষ হবে। আইনত প্রত্যেক ভাবী মা-ই এই সব সুযোগ-সুবিধে পেতে পারেন। কিন্তু আইনকে বাস্তবে পরিণত করবার ব্যবস্থা? কোনো ভাবী মা যাতে এই সব সুযোগ-সুবিধে থেকে বঞ্চিত না হন তার ব্যবস্থা? সোবিয়েৎ দেশে তার ব্যবস্থা নানামুখী—মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার থেকে শুরু করে প্রচারের সাহায্যে আইনগুলি সম্বন্ধে প্রত্যেক মেয়েকে সচেতন করা পর্যন্ত! শুধু তাই নয়। প্রসব-হাসপাতালে একটি করে আইন-বিভাগ, সেই বিভাগে অভিজ্ঞ আইনজ্ঞ হাজিরি দিচ্ছেন; অন্তঃসত্ত্বা কোনো নারী যাতে আইনত কোনোরকম সুযোগ-সুবিধে থেকে বঞ্চিত না হন সেই দিকে দৃষ্টি রাখাই হলো এই বিভাগের একমাত্র কর্তব্য। বলাই বাহুল্য, সোবিয়েৎ দেশের মেয়েকে এই বিভাগের পরামর্শ নগদ মূল্য দিয়ে কিনতে হয় না।

কিংবা ধরুন, গাঁয়ের কথা। গাঁয়ে যখন ফসলের সময় তখন সব মানুষই ব্যস্ত। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উপর অসম্ভব কাজের চাপ। এই হাঙ্গামার মধ্যে অন্তঃসত্ত্বা মেয়ের পক্ষে সব রকম সুযোগ-সুবিধে ঠিক মতো লাভ করতে পারার অসুবিধা আছে। সোবিয়েৎ দেশে তাই ফসলের সময় গাঁয়ে গাঁয়ে এক-একটি ভ্রাম্যমান (flying squad) ডাক্তার দল তাঁবু ফেলে। সেই দলে ডাক্তার, নার্স ছাড়াও থাকে আইনজ্ঞ মেয়েরা। ডাক্তারির

দিক ছাড়াও এই সব ভ্রাম্যমান দলের একটা বিশেষ কাজ হলো প্রদর্শনীর আয়োজন করা, পুঁথিপত্র বিতরণ করা আর কোনো মেয়েই যাতে আইনত কোনো সুযোগ-সুবিধে থেকে বঞ্চিত না হয় বিশেষ করে সেইদিকে দৃষ্টি রাখা।

কিংবা ধরুন, শহরের কথা। অনেক জায়গাতেই প্রাক্-প্রসব ক্লিনিক। গর্ভনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে সমস্ত মেয়েকে উপদেশ দেওয়া থেকে শুরু করে নানান রকম কাজ এই ক্লিনিকের। এই ধরনের কেন্দ্র থেকে প্রত্যেক ভাবী মাকে একটা করে কার্ড দেওয়া হয় এবং এই কার্ডের সাহায্যে ভাবী মা পায় নিম্নোক্ত সুযোগ-সুবিধে : (১) ট্রামে সব আগে ওঠার অধিকার ও ঢাকা জায়গায় প্রথমে বসতে পাবার অধিকার, (২) দোকান-হাট করতে গিয়ে কিউ বা প্রতীক্ষমাণদের সারকে পেরিয়ে সব আগে জিনিষপত্র কিনতে পাবার অধিকার, (৩) বাড়তি রেশন, (৪) যে-দোকান বা দপ্তরে মেয়েটি কাজ করে সেখানে শুধু হালকা ধরনের কাজ করতে পাবার অধিকার, (৫) পুরো মাইনেয় তু'মাস ছুটি....ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই রকম খুঁটিনাটি নিয়ে অনেক কথাই তোলা যায়। কিন্তু সোবিয়েৎ দেশে মেয়েদের মুক্তি সম্বন্ধে এর চেয়ে অনেক বেশি জরুরী—কেননা, অনেক বেশি মৌলিক ও প্রাথমিক—সে-কথা বিশেষ করে সেই কথাটির আলোচনা তোলা দরকার।

গত পরিচ্ছেদে ইতিহাসের জবানবন্দি আলোচনা করবার সময় আমরা দেখেছি সভ্য দেশে ও সভ্য যুগে মেয়েদের জীবনে যে এত গ্লানি তার আসল কারণটা কী। আদিম বর্বর যুগে মেয়েদের জীবন গ্লানির জীবন ছিল না, গ্লানির বদলে গৌরবেরই জীবন। সে-যুগ মাতৃসত্তার যুগ। কিন্তু সভ্যতা শুরু হবার পর থেকেই, শ্রেণীসংগ্রাম আর শোষণের ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবার সময় থেকেই, মেয়েদের জীবন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গ্লানির জীবনে পরিণত হলো। তার আসল কারণ, মেয়েরা বাদ পড়লো সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় মেহনতের মর্যাদা থেকে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি আর শ্রেণীবিভাগ দেখা দেবার পর সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় উৎপাদনের উপায়গুলো এল শুধুমাত্র পুরুষদের কবলে, তাই সামাজিক মেহনতের যে-গৌরব তাতে জুটলো

শুধু পুরুষদের অধিকার। আর, এই অধিকারটুকুর জোরেই তারা প্রভুত্ব বিস্তার করলো মেয়েদের উপর। মেয়েদের কাজ হলো নেহাতই ঘর-সংসারের কাজ, সামাজিক মেহনতের সঙ্গে এই কাজের যোগ নেই। এঙ্গেল্‌স্ দেখিয়েছেন, আধুনিক ধনতন্ত্রের যুগে মানুষের উৎপাদন শক্তি যখন অভাবনীয়ভাবে বেড়ে গিয়েছে, শুধুমাত্র তখনই, এই বিরাট উৎপাদন-শক্তির ভিত্তিতেই, সমাজের কাজ আর ঘর-সংসারের কাজ, এ-দু'-এর মধ্যে হারিয়ে যাওয়া মিল নতুন উন্নত স্তরে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আর, সেই মিলটুকু খুঁজে পেলে পর নারী ফিরে পাবে সামাজিক মেহনতের মর্যাদা। সেই মর্যাদার ভিত্তিতেই আসবে মেয়েদের প্রকৃত মুক্তি, আর তারই ফলে সুস্থ ও স্বাভাবিক যৌনসম্পর্ক—ব্যক্তিগত প্রণয়। শুধু ব্যক্তিগত প্রণয়টুকুই নয়, মার্কস্ বলেছিলেন, ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে মজুরশ্রেণীর প্রকৃত বিজয়।

সোবিয়েৎ দেশে মেয়েদের মধ্যে সামাজিক মেহনতের মর্যাদা ফিরিয়ে আনবার পরিকল্পনা। কল্পনা নয়, পরিকল্পনা। পৃথিবীর অন্য দেশে, অন্য যুগে, নারীর মুক্তি নিয়ে আন্দোলন হয়েছে কিন্তু আর কোনো দেশে আর কোনো যুগে এমন নির্ভুল ইতিহাসবোধের উপর নির্ভর করে, এমন নিখুঁত বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার সাহায্যে মেয়েদের মুক্তির কথাই ওঠেনি।

সামাজিক মেহনতের মর্যাদা মেয়েদের মধ্যে ফিরিয়ে আনা। ঘর-সংসারের কাজ আর সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় উৎপাদনের কাজ, এ-দু'-এর মধ্যে তফাতটা মুছে দিতে পারলে তবেই তা সম্ভব। কেমনভাবে মোছা যাবে? সোবিয়েৎ দেখলো, ঘর-সংসারের কাজও যদি সামাজিক কাজে পরিণত করা যায় তাহলে সামাজিক কাজের সঙ্গে ঘর-সংসারের কাজের আর কোনো গরমিল থাকবে না। সোবিয়েৎ পরিকল্পনায় এইটে একটা আশ্চর্য ও অভাবনীয় দিক; পৃথিবীর আর কোনো দেশে, আর কোনো যুগে মেয়েদের মুক্তির আশায় এমনতরো পরিকল্পনা আর কখনো করা হয়নি। ব্যাপারটাকে তাই আর একটু বিশদভাবে বলবার চেষ্টা করি।

মেয়েরা যদি ঘরের কাজে বাঁধা থাকতে বাধ্য হয় তাহলে তাদের পক্ষে সামাজিক মেহনতের মর্যাদা পাওয়া একেবারেই

অসম্ভব। হেঁসেল ঠেলে আর ছেলে মানুষ করে যাদের উদয়াস্ত দিন কেটে যায় তারা কেমন করে অংশীদার হবে ক্ষেত খামারের কাজে, কেমন করে কারখানায় আর আপিসে তারা চাকরি করবে, গবেষণা করবে ল্যাবরেটারী আর লাইব্রেরীতে? অথচ, যদি এমন হয় যে, ঘর-সংসারের যত রকম কাজ তা সামাজিক কাজে পরিণত করা গেল, তাহলে? তাহলে মেয়েদের মুক্তি দু'দিক থেকে। এক হলো, যে সব মেয়েরা এই পরিবর্তন সত্ত্বেও এই জাতীয় কাজে মেহনত করবে তারা আর শুধু নিজেদের সংসারের কাজটুকুর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হবে না, তারাও অংশ গ্রহণ করবে সামাজিক কাজেই; কেননা কাজগুলোরই জাত-বদল হয়েছে, ব্যক্তিগত সংসারের কাজ পরিণত হয়েছে সামাজিক কাজে। আর দ্বিতীয়ত, বাকি মেয়েরা মুক্তি পাবে আপন আপন সংসারের সংকীর্ণ গণ্ডিটুকু থেকে; তাদের সাংসারিক কাজের ঝক্কিটা গ্রহণ করেছে সমাজ, তাই তারা নিজেরা সমাজের অন্যান্য কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারবে। ফলে, সংসারের কাজকে যদি সামাজিক কাজে পরিণত করা যায় তাহলে দু'দিক থেকেই মেয়েরা মর্যাদা পাবে সামাজিক মেহনতের। এই মর্যাদা আনবে তাদের প্রকৃত মুক্তি, পুরুষের সঙ্গে বাস্তব সাম্য। এইখানে অন্যান্য উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে সোবিয়েতের আসল তফাতটা স্পষ্টভাবে মনে রাখতে হবে। ধনতন্ত্রের কৃপায়, ইংরাজ-মার্কিন প্রভৃতি দেশের মেয়েরাও নানাভাবে আপিস-আদালতে কাজের দিকে পা বাড়াতে পেরেছে। বস্তুত, এমন কোনো দিক খুব কমই আছে যেখানে তারা পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিতে কসুর করে। তবু, অন্যান্য দেশের বেলায় সামাজিক মেহনতের সঙ্গে সাংসারিক মেহনতের অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘোচেনি; ঘুচেছে একমাত্র সোবিয়েৎ রাশিয়ায়। তাই অন্যান্য উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের মেয়ের পক্ষে সামাজিক মেহনতের দিকে এগোতে গেলে সংসারের কথাটা অল্পবিস্তর বাদ দিয়েই এগোতে হয়। কেননা, তাদের দেশে সংসারের কাজ সামাজিক কাজে পরিণত হতে পারেনি। ফলে, তাদের সামনে যেন দু'মুখো পথ, সংসার ধর্মের আর সামাজিক শ্রমের পথ। দুটো পথের মধ্যে একটাকে ধরে এগোতে গেলে অপরটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কিন্তু সোবিয়েৎ দেশে সংসারের কাজও সামাজিক কাজে রূপান্তরিত; অর্থাৎ সংসারের ভার নিয়েছে সমাজ। তাই, সামাজিক কাজের দিকে এগোলে সংসারে ভাঙন ধরবার ভয় নেই। অপরপক্ষে, যারা রান্নাবান্না বা শিশুপালন নিয়েই থাকতে চায় তাদের পক্ষেও সামাজিক মেহনত থেকে বাদ পড়বার আশঙ্কা নেই। কেননা, এই জাতীয় কাজ আজ আর ব্যক্তিগত সংসারের কাজ নয়, সামাজিক কাজে রূপান্তরিত হয়েছে।

বিষয়টা নিয়ে আর একটু খুঁটিয়ে আলোচনা করা যাক। ঘরের কাজ বা সংসারের কাজ বলতে চৌদ্দ আনাই হলো রান্নাবান্না আর ছেলেপুলে মানুষ করবার কাজ; আর বাকি দু'আনার মধ্যে পড়ে কাপড়-জামা কাচা, সেলাই-বোনা-মেরামত ইত্যাদি। কেমন করে এইগুলিকে সামাজিক কাজে পরিণত করা সম্ভব? শহরের পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে, যদি বড় বড় যৌথ খাবারঘর খোলা যায়, যদি খোলা যায় অজস্র শিশুপালন কেন্দ্র, ধোপাখানা, মেরামতখানা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং সেগুলি যদি সামাজিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়, তাহলেই কি সংসারের কাজকে সামাজিক কাজে পরিণত করা যাবে না? আত্মীয়-স্বজনের রোগের শুশ্রূষা করা, আঁতুড় তোলা, এ-সমস্তই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে সাংসারিক কাজ হয়ে রয়েছে। দেশজুড়ে যদি অনেক, অজস্র হাসপাতাল খোলা যায় তাহলে সাংসারিক কাজ কি সামাজিক কাজেই পরিণত হবে না?

সোবিয়েৎ সমাজ গড়বার শুরু থেকেই দেখা দিলো এই প্রচেষ্টা। লেনিন বললেন: "শ্রমিক শাসিত সরকার, কমিউনিস্ট পার্টি ও সংঘগুলি নরনারীর সেকেলে ধারণাগুলি দূর করবার জন্যে, অসাম্যবাদী মনস্তত্ত্বকে বিনাশ করবার জন্যে কোনো রকম চেষ্টারই কসুর করছে না। আইনের দিক থেকে অবশ্যই পুরুষ এবং নারীর মধ্যে সম্পূর্ণ সাম্য রয়েছে। এবং এই সাম্যকে বাস্তবে পরিণত করবার আন্তরিক ইচ্ছার পরিচয়ও সর্বত্রই পাওয়া যাচ্ছে। আমরা মেয়েদের নিয়ে আসছি অর্থনীতি, আইনসভা ও সরকারের মধ্যে। যাতে তারা কাজকর্মের শক্তি আর সামাজিক শক্তি বাড়াতে পারে, সেইজন্যে সমস্ত শিক্ষায়তনে প্রবেশের পথ তাদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। আমরা প্রতিষ্ঠা করছি যৌথ রান্নাঘর, সাধারণের খাবারঘর,

ধোপাখানা, শিশুদের রাখবার জায়গা, শিশুদের খেলাঘর (Kinder-gartens), ছেলেমেয়েদের বাড়ি—সবরকম শিক্ষালয়। এক কথায়, স্বতন্ত্র সংসারের অর্থনৈতিক ও শিক্ষামূলক কাজকে সামাজিক কাজে পরিণত করবার চেষ্টায় আমরা সত্যিই উঠে পড়ে লেগেছি। তার দরুন মেয়েরা মুক্তি পাবে বহুদিনকার পুরোনো ঘর-সংসারের একঘেঁয়ে কাজ থেকে এবং পুরুষের আধিপত্য থেকে। ফলে, মেয়েরা নিজেদের প্রতিভা এবং রুচিকে পুরোমাত্রায় কাজে লাগাতে পারবে। ঘর-সংসারের আবহাওয়ার চেয়ে ভালো আবহাওয়ায় ছেলেমেয়েকে মানুষ করা সম্ভব হবে। পৃথিবীতে মেয়ে-মজুরদের স্বার্থরক্ষার জন্যে যত রকম আইন, তার মধ্যে সবচেয়ে উন্নত আইন আমাদেরই দেশে এবং শ্রমিক সংঘের কর্মীরা এই আইনকে কাজে নিয়োগ করে। আমরা খুলে চলেছি প্রসব-হাসপাতাল, শিশু এবং মায়ের জন্য হাসপাতাল, মাতৃবিদ্যার ক্লিনিক, শিশুপালন সম্বন্ধে প্রচার, কেমন করে নিজের সম্বন্ধে এবং শিশু সম্বন্ধে যত্ন নিতে হয় তার প্রদর্শনী এবং এই ধরনের অন্যান্য ব্যাপার। যেসব মেয়েরা বেকার হয়েছে বা যাদের উপযুক্ত কাজ দেওয়া সম্ভব হয়নি তাদের ভরণ-পোষণের জন্যে আমরা রীতিমতো চেষ্টা করে চলেছি।”

বিশেষ করে মনে রাখতে হবে, সোবিয়েৎ দেশের এই চেষ্টা হৃদয়াবেগের তাগিদে নয়, প্রয়োজনের তাগিদে। মহিলা-মঙ্গল ওদের কাছে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবার স্বপ্নের অংশ নয়, সোবিয়েৎ সমাজ প্রতিষ্ঠা করবার অনিবার্য অঙ্গ। লেনিন বলেছিলেন, “মেহনতকারী জনগণের অর্ধেকটা—শ্রমিকশ্রেণীর মেয়েরা—যতদিন না পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার পায়, যতদিন তারা সংসারে দাসী হয়ে থাকতে বাধ্য হয় ততদিন সমাজতন্ত্রের জয় অসম্ভব।” আর ইতিহাসের কাছে স্পষ্ট শিক্ষা পেয়ে সোবিয়েৎ নেতৃত্ব বুঝতে পেরেছিল, নারীকে সামাজিক মেহনতের মর্যাদা ফিরিয়ে না দিলে পুরুষের সঙ্গে তার সমান অধিকার বাস্তবে পরিণত করা একান্তই অসম্ভব।

বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে মেয়েদের কাছে ফিরিয়ে আনা সামাজিক মেহনতের মর্যাদা। এর ফলাফলটা কী রকম হয়েছে

তা সামান্য কিছু হিসেবপত্র থেকেই আন্দাজ করা সম্ভব। গত মহাযুদ্ধ শুরু হবার মুখে সোবিয়েৎ দেশে সর্বশুদ্ধ ১১,০০০,০০০ মেয়ে কল-কারখানা, চলাচল ব্যবস্থা আর নির্মাণ কাজে যোগ দিয়েছে; এদের মধ্যে ১৭০,০০০ হলো ইঞ্জিনিয়ার আর টেকনিসিয়ান। চার হাজার মেয়ে সোবিয়েৎ ইউনিয়নে ইঞ্জিন চালাবার কাজে নিযুক্ত। মনে রাখতে হবে সোবিয়েৎ দেশে কায়েম হয়েছে মজুর-রাজ; সুবিধা-ভোগী শ্রেণী বলে যদি কিছু থাকে তাহলে মজুরশ্রেণীই। তাই মজুরের জীবন বলতে আমরা যে দুঃখ-দুর্দশার পাহাড়কে বুঝতে অভ্যস্ত হয়েছি সোবিয়েৎ দেশে ঠিক তার উল্টো। দ্বিতীয়ত, মেয়েদের পক্ষে মেহনতের মর্যাদাটা ঠিক কেমনতরো তা-ই আমরা স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না। কেননা, আমাদের দেশ এখনও পর্যন্ত ধনতন্ত্রের পর্যায়েই ভালো করে উঠে আসতে পারিনি। অনুন্নত দেশের গোঁড়ামি কাটেনি আমাদের মন থেকে। তাই, দিদিমা-ঠাকুমার মতোই আমরা আজও প্রায় মনে করে বসি, ইঞ্জিনিয়ার আর ইঞ্জিন ড্রাইভার হওয়াটা নেহাতই মেয়ে-মর্দানীর লক্ষণ। মেয়েরা হলো মায়ের জাত, বোনের জাত; আমাদের মনে তাদের সম্বন্ধে যে চিরকল্যাণী মূর্তির স্বপ্ন সেই স্বপ্ন ইঞ্জিন আর উড়োজাহাজ চালাবার শব্দে বার বার যেন ভেঙে যেতে চায়।

তাই এই কল্যাণী মূর্তির কথাটা নিয়ে একটু স্পষ্টভাবে চিন্তা করা দরকার। এর মধ্যে চৌদ্দ আনাই আসলে অন্ধতা! শোষকশ্রেণী যুগ যুগ ধরে এই অন্ধতাকে প্রচার করেছে মেয়েদের সহজ মনুষ্যত্বটুকু থেকে বঞ্চিত করে রাখবার আশায়। মেয়েমানুষ ঠিক মানুষ নয়, হেঁসেল ঠেলে, আর কচি ছেলের কাঁথা কেচে তাদের দিন কাটুক, কপালে জুটুক তার শ্বশুর-শাশুড়ী থেকে শুরু করে ননদ-দেওরের গঞ্জনা; সে যদি এই গ্লানির জীবনকে ঠেলে ফেলে মানুষের মর্যাদা পেতে চায় তাহলে চিরন্তনী কল্যাণী মূর্তির দোহাই পেড়ে তাকে দাসীত্বের সুরে বেঁধে রাখা হোক। হয়তো, অবস্থাপন্ন ঘরে এত কষ্টের কথা ওঠে না, হয়তো নারী সেখানে সেজে-গুজে পটের বিবিটিই হয়ে থাকে। কিন্তু যতবড় পটের বিবিই হোক না কেন, তার আসল

অবস্থা হলো দাসী-বাঁদীর অবস্থাই। কেননা, শেষ পর্যন্ত সে পরান্নজীবীই, সমাজে তার স্বাধীন-সত্তা নেই; সামাজিক মেহনত থেকে সে বঞ্চিত। বড় লোকের ঘরে পড়লে অন্তঃপুরের দিবানিদ্রায় তার মেদ-বৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু মর্যাদার সম্ভাবনা যা, তা ওই অন্তঃপুরের পাঁচিল ঘেরা জায়গাটুকুর মধ্যেই। ইতিহাসে তার স্থান নেই, বিপুলা পৃথিবীতে তার স্থান নেই, পোষা আর আদুরে পশুর চেয়ে তার মর্যাদা খুব বেশি নয়। তাছাড়া, এই পটের বিবি সমাজে সত্যিই আর ক'জন? অধিকাংশ মেয়ের কপালেই হাড়ভাঙা খাটুনী, সে-খাটুনীর যে-মর্যাদা, তা নেহাত ঠুনকো বাগ্‌ময় মর্যাদা, সনাতন কল্যাণী মূর্তির মর্যাদা! আসল মর্যাদা নেই এ-খাটুনীর, কেননা এ-খাটুনী সামাজিক খাটুনী নয়, সংসারের খাটুনী, অন্তঃপুরের খাটুনী। অর্থাৎ সামাজিক মেহনত আর সাংসারিক মেহনতের মধ্যে একটা চীনে-পাঁচিল দাঁড় করানো আছে বলেই সংসারের মেহনত যত হাড়মাস কালি করা মেহনতই হোক না কেন, সমাজে তার প্রতিষ্ঠা নেই এতটুকুও।

বিপ্লবের আগে—বছর চল্লিশের কথাও হবে না—রুশ দেশেও মেয়েদের এই অবস্থাই ছিল। সে যুগে গাঁয়ের মেয়েদের সম্বন্ধে স্তালিন যে বর্ণনা দিয়েছেন আমাদের দেশের মেয়েদের উপস্থিত অবস্থার সঙ্গে সে বর্ণনা মিলিয়ে দেখুন:

"আগেকার দিনের মেয়েদের ঠিক কী রকম অবস্থা ছিল তা একবার ভেবে দেখা যাক। বিয়ের আগে পর্যন্ত মেয়েকে সবচেয়ে অধম চাকরাণী মনে করা হতো। বাপের সংসারে সে গতর খাটাতো, উদয়াস্ত গতর খাটাতো, তবু বাপ তাকে ধমকে বলতো, 'মনে রাখিস, তুই আমার অন্ন ধ্বংস করিস!' বিয়ের পর স্বামীর সংসারে সে গতর খাটাতো, স্বামীর যেমন মর্জি তেমনিভাবেই। তবু স্বামী তাকে ধমক দিয়ে বলতো, 'মনে রাখিস, তুই আমার অন্ন ধ্বংস করিস!' গ্রামের মধ্যে মেয়েদের অবস্থাই ছিল সবচেয়ে অধম।"

বিপ্লবের আগে রুশ দেশে যেসব মেয়েরা কারখানায় কাজ করতো তাদের অবস্থাও একই রকম। দেশের একটা আইন দেখলেই সমস্ত মেয়ের অবস্থাটা আঁচ করা যায়। জার আমলে

১০৭ ধারার আইন ছিল: "স্বামীই পরিবারের প্রধান কর্তা, স্ত্রীর কর্তব্য হলো স্বামীর অনুগত হওয়া।" তবু এত অসম্ভব নির্যাতন সত্ত্বেও, খোদ রুশ মেয়েদের অবস্থা উজবেক, তুর্কমেনিয়া, তাজিক, আজারবইজান প্রভৃতি জায়গায় মেয়েদের তুলনায় যেন স্বর্গের অপ্সারাদের মতো। তাহলে এই সব মেয়েদের দশাটা সহজ মনুষ্যত্বের কতখানি নিচে তা কল্পনা করা যায়। মধ্য এশিয়ার মেয়েরা ট্রান্সককেসিয়ার মেয়েদের প্রতি চিঠি লিখছে: "বোখারার জমিকে সিক্ত করেছে অনেক মেয়ের চোখের জল। সারাজীবন ধরে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই চোখের জল—একে কখনও ভোলা যায় না।—আমীর আমলের বোখারায় প্রত্যেক মেয়েদের পাঁচজন করে প্রভু: তার প্রথম ও প্রধান প্রভু হলো বিধাতা বা ভগবান, দ্বিতীয় প্রভু আমীর, তৃতীয় প্রভু মনিব, অর্থাৎ জমি আর জলের মালিক, চতুর্থ প্রভু হলো মোল্লা আর পঞ্চম প্রভু তাব স্বামী! নগদ টাকায় আমাদের বিক্রি করা হতো, বিনিময় করা হতো যে কোনো পণ্যের সঙ্গে। আমরা ছিলাম আমাদের স্বামীদের ক্রীতদাসী।" তখনকার দিনে রুশ দেশে স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে মারধোর করাটা যে নেহাতই সহজ আর স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল এ-কথা আজকের দিনে প্রায় সমস্ত যৌনবিজ্ঞানীই উল্লেখ করে থাকেন। স্ত্রীর সতীত্বে কোনো রকম সন্দেহ জাগলে স্বামীরা স্ত্রীদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে গরুর গাড়িতে বেঁধে চাবকাতে চাবকাতে গ্রাম ঘুরিয়ে আনতো। অথচ বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলবার কাজে এই মেয়েরাই এগিয়ে এসেছে পুরুষের পাশাপাশি, সমানে সমান হয়ে। এই দেশেই ১৯৩৫ সালে, বিপ্লবের আঠারো বছর পরে, দেশের যত শিক্ষক আর যত ডাক্তার তার মধ্যে তিনভাগের দু'ভাগ হলো মেয়েরাই, কৃষিবিদ্যায় যারা বিশেষজ্ঞ তাদের মধ্যে একটা মস্ত বড় অংশ মেয়েরা। বিজ্ঞানের প্রায় প্রত্যেক বিভাগে গবেষণার কাজে পুরুষদের অনুপাতে মেয়েদের সংখ্যা বড় কম নয়। কারখানার ওস্তাদ কারিগরদের মধ্যে তিনভাগের এক-ভাগ হলো মেয়েই। পুরো পাঁচ বছর ধরে তারা বিশেষজ্ঞ হবার শিক্ষা পেয়ে থাকে। এমন কি সৈন্য ও নৌবাহিনীতেও যোগ দিয়েছে মেয়েরা। হিসেবের তালিকা খুবই

দীর্ঘ করা যায়। সোবিয়েৎ দেশে কত মেয়ে রাষ্ট্র-পরিচালনার সবচেয়ে দায়িত্বশীল কাজে স্থান পেয়েছে, কত মেয়ে পেয়েছে স্তালিন পুরস্কার, লেনিন সম্মান (Order of Lenin), রেড ব্যানার, হিরো অফ সোশ্যালিস্ট লেবারের সম্মান, পিপলস আর্টিস্টের সম্মান, অনার্ড আর্টিস্টের সম্মান,—তারও তালিকা খুব কম হবে না। কিন্তু সংখ্যা গণিতের হিসেব দিতে যাওয়ায় অসুবিধেও আছে। কেননা, ওদের দেশে একটার পর একটা পাঁচ-বছরী পরিকল্পনার কৃপায় দিনের পর দিন সামাজিক মেহনতের মর্যাদায় মেয়েরা এত দ্রুত এগিয়ে চলেছে যে, আজকের হিসেব আর আগামী কালের হিসেবে অনেকখানি তফাত হয়ে যায়।

বিপ্লবের আগেকার রাশিয়া আর সোবিয়েৎ রাশিয়া, একই দেশে যেন দুটো পৃথিবী। বস্তুত, পৃথিবীই আজ যেন দুটো স্পষ্ট ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে: একভাগের সামনে আদর্শ হলো শ্রেণী-শোষণ, মোটামুটিভাবে বললে প্রাক্-বিপ্লব রুশ দেশের আদর্শই। আর একভাগের আদর্শ হলো সমাজতন্ত্রের আদর্শ, সোবিয়েতের আদর্শ। 'পরের মেহনত লুঠ করবার ভিত্তিতে সমাজ', আর 'মেহনতের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করবার ভিত্তিতে সমাজ'—দুটো আদর্শের মধ্যে যেন আকাশ-পাতাল তফাত। পূর্ব ইওরোপে রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশের জনগণ বেছে নিয়েছে সোবিয়েতের আদর্শ; ওদের দেশেও আয়োজন হলো মেয়েদের প্রকৃত মুক্তির। এশিয়ায় চীন দেশের মানুষ বেছে নিলো সোবিয়েতের পথ আর তাই ওদের গঠনতন্ত্রে লেখা হলো: "চীনের পিপলস রিপাবলিক সামন্ত প্রথার উচ্ছেদ করলো, যে-প্রথা অনুসারে মেয়েদের পায়ে শৃঙ্খল। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা-দীক্ষা এবং সামাজিক দিক থেকে মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার পাবে। বিয়ের ব্যাপারে পুরুষ এবং নারীর স্বাধীনতা আইনত প্রবর্তিত করা হবে।" চীন দেশের মতো পেছিয়ে পড়ে থাকা দেশের পক্ষে কথাগুলো যে কতখানি বিপ্লবী তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারাই কঠিন। তাছাড়া মনে রাখতে হবে সাম্যবাদ শুধু কথায় আস্থা রাখে না; বাস্তবে প্রয়োগ ছাড়া শুধু কথার কোনো মূল্যই নেই তার কাছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রেম

বাকি পৃথিবীতে নরনারীর সম্পর্ক সম্বন্ধে মোটের উপর দু'রকম মনোভাব প্রচলিত। এক হলো, সংযম বা ব্রহ্মচর্যের মনোভাব; আর এক হলো বেপরোয়া সম্ভোগ বা ডন-জুয়ানের মনোভাব।

সংযম বা ব্রহ্মচর্য—অর্থাৎ, ও-ব্যাপারটা মোটেই ভালো নয়; যেন এক necessary evil, সৃষ্টিকে বজায় রাখবার পক্ষে এক অনিবার্য কুশ্রীতা। তাই জীবন থেকে একে যতখানি বাদ দেওয়া যায় ততই মঙ্গল, যৌন স্পৃহাকে অবদমন করার মধ্যেই মনুষ্যত্বের বিকাশ। এ-প্রবৃত্তি যেন আগুনের মতো, যত ইন্ধন যোগাবে ততই দাউ দাউ করে জ্বলবে। তাই সমাজের একটা প্রধান সমস্যা হলো, কতরকম বিধিনিষেধের বন্ধনে একে বেঁধে রাখা সম্ভব। যাঁরা তা পারলেন না তাঁরা জাতিকুলের হিসেব মিলিয়ে শুভবিবাহ করুন আর তারপর পাঁজি উল্টে শুভক্ষণ দেখে মিলিত হোন ধর্মপত্নীর সঙ্গে।

আমাদের এই অনুন্নত—অতএব পিছিয়ে-পড়া—দেশে ব্রহ্মচর্যের আদর্শটা আজও মহান আদর্শ বলে স্বীকৃত। এর মস্ত বড় নিদর্শন হলেন গান্ধীজী। তিনি অবশ্য পাঁজি দেখে দিন-ক্ষণ মিলিয়ে মৈথুন করবার নির্দেশ দেননি; কিন্তু পৃথিবীর আর কোনো দেশে বিংশ শতাব্দীর আর কোনো নেতা গান্ধীজীর মতো ব্রহ্মচর্যের আদর্শ নিয়ে উচ্ছ্বাস করতে পারেন, বা খুঁটিনাটির ব্যবস্থা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারেন, এ-কথা প্রায় কল্পনার অতীত। এমন কি, স্বামী-স্ত্রীর জীবন থেকেও যৌনমিলনের আদর্শকে কিভাবে কতখানি বর্জন করা দরকার এ-নিয়েও মহাত্মার উপদেশ আজকের পৃথিবীতে এক অতি অপরূপ বিস্ময়!

অপরদিকে আর একটা আদর্শ: সেটাকে সংক্ষেপে ডন-জুয়ানী আদর্শ বলছি, যদিও এ-আদর্শের প্রচারকরা নানান ভাষায়, নানান

রকম অলঙ্কারের আড়ালে নিজেদের বক্তব্যকে পেশ করে থাকেন। ব্রহ্মচর্যের একেবারে বিপরীত আদর্শ—এবং এর চরম বাস্তব বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় আজকের দিনের মার্কিন দেশে। যৌন আনন্দকেই জীবনের একটা চরমতম লক্ষ্য করে তোলা, মার্কিন দেশের সাধারণ ব্যবসায়ী বিজ্ঞাপন আর জনপ্রিয় পত্রিকার মলাট থেকে শুরু করে এমন কি দৈনন্দিন ভাষা ব্যবহারের মধ্যেও এই মনোভাব প্রকট হয়ে উঠেছে।

সোবিয়েৎকে বাদ দিলে আজকের দিনে বাকি সভ্য দুনিয়ায় প্রধানত এই দুটো আদর্শ। সন্ন্যাসীর আদর্শ আর ডন-জুয়ানের আদর্শ, ব্রহ্মচর্যের আদর্শ আর রুদ্ধশ্বাস হুল্লোড়ের আদর্শ। সোবিয়েতের আদর্শ এই দু'রকমের এক রকমও নয়। ওদের আদর্শ হলো সুস্থ ও সহজ যৌনমুক্তির আদর্শ—ব্রহ্মচর্যও নয় আবার কাম-সর্বস্বতাও নয়।

সুস্থ যৌনমুক্তির আদর্শ বলতে ঠিক কী বোঝায় এ-কথা ১৯২১ খৃস্টাব্দে লেনিন অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় নির্ণয় করে গিয়েছেন। কিন্তু লেনিনের এই উক্তিগুলি ঠিকমতো বুঝতে হলে সোবিয়েৎ পরিকল্পনায় নীতিবিজ্ঞান-এর নতুন অভিব্যক্তি সম্বন্ধে দু'-একটা সাধারণ কথা আলোচনা করে নেওয়া দরকার।

প্রথমত, সোবিয়েৎ পরিকল্পনায় ব্রহ্মচর্য নিয়ে কোনোরকম উচ্ছ্বাসের অবকাশ থাকতে পারে না। জীবনকে চেয়েছে ওরা, সুস্থ আর সর্বাঙ্গীন জীবনকে; জীবনকে বঞ্চিত করায় ওদের কোনোরকম আস্থা থাকবে কেমন করে? ওয়েব-দম্পতি বলছেন, সোবিয়েৎ সমাজে সত্যিই যদি কোনোরকম নতুন নীতিবিজ্ঞান গড়ে উঠে থাকে তাহলে তার মূল কথা হলো সমস্ত সমাজের, সমস্ত মানুষের, positive health of body and mind, শরীর-মনের বাস্তব স্বাস্থ্য। পৃথিবীর অধিকাংশ নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে সোবিয়েৎ নীতিবিজ্ঞানের প্রধান তফাত এইখানেই। অন্যান্য নীতিশাস্ত্রের ঝোঁকটা নেতিবাচক, negative: কি কি করা উচিত নয় প্রধানত তারই আলোচনা। সোবিয়েৎ নীতিবিজ্ঞানে ঝোঁকটা অস্তিত্ববাচক: কেমন করে পুরো সমাজের সমস্ত মানুষ জীবনে সর্বাঙ্গীন পূর্ণতা আনতে পারবে তার দিকেই নজর। ওয়েব-দম্পতি

তাই লিখছেন, সোবিয়েৎ সমাজে নীতিকথা আর নেতিবাচক নয়, প্রধানতই অস্তিত্ববাচক।

আর তাই, ব্রহ্মচর্যের মাহাত্ম্য, ত্যাগধর্মের মাহাত্ম্য, অবদমনের মাহাত্ম্য, সোবিয়েৎ পরিকল্পনায় স্থান পায়নি। কেননা, এই ধরনের কথা জীবনকে খর্ব করবার কথা, সংকীর্ণ করবার কথা। মার্কস্‌বাদের মূল কথার সঙ্গে, সোবিয়েৎ বিপ্লবের মূল প্রেরণার সঙ্গে, ত্যাগের আদর্শ খাপ খায় না। আধুনিক পৃথিবীতে ধন উৎপাদনের অভাবনীয় শক্তি মানুষের কবলে এসেছে, তবু উৎপন্ন ধন বণ্টন করবার অব্যবস্থার ফলে জনগণের অভাব আর দৈন্য দিনের পর দিন যেন বেড়েই চলেছে। তাই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চাই। এমন ব্যবস্থা চাই যাতে সকলের জীবন প্রাচুর্যে টলমল করে ওঠে—বিপ্লবের আহ্বান আসলে এইটেই। এর মধ্যে তাই ত্যাগধর্মের আদর্শ কেমন করে জায়গা পাবে?

যৌনজীবনের বেলাতেও ওরা তাই ব্রহ্মচর্যের কথাকে আমল দিতে মোটেই রাজী নয়। নরনারীর যৌনসম্পর্ক হবে সুস্থ আর সহজ সম্পর্ক। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, সোবিয়েৎ সমাজে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতাকে, অস্থিরতাকে প্রশ্রয় দেবার ব্যবস্থা। আসলে, পেশাদার অপপ্রচারকেরা এই কথা নিয়েই সোবিয়েতের কুৎসা করেন—সোবিয়েৎ দেশে নাকি লাম্পট্য আর রিরংসার বান ডেকেছে। অথচ, সোবিয়েৎ পরিকল্পনায় ব্রহ্মচর্যের স্থান যে-রকম থাকতে পারে না সেই রকমই থাকতে পারে না উচ্ছৃঙ্খলতা বা লাম্পট্য নিয়ে কোনোরকম উচ্ছ্বাস। তার কারণটা ধর্মমূলক বা নীতিশাস্ত্রমূলক নয়, বিজ্ঞানমূলক। কেননা, যৌনজীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা আর যাই হোক মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। পুরো সমাজের, সব মানুষের বাস্তব স্বাস্থ্যের দিকেই যে-দেশের একমাত্র নজর সে-দেশের পক্ষে এইরকম একটা মানসিক অস্বাস্থ্যকে প্রশ্রয় দেবার প্রশ্নই ওঠে না। সোবিয়েৎ দেশ নীতি-বাগীশের দেশ নয়, জীবনের কোনো বাস্তব উপভোগকে ওরা সাধু বাক্যের নামাবলী দিয়ে ঢাকা রাখতে চায় না। তবু ওরা ভুলতে রাজী নয় যে, বৈজ্ঞানিক মূলসূত্র অনুসারে ওরা মানবজাতিকে মেরামত করবার কাজে কোমর বেঁধেছে. তাই বিজ্ঞানের দিক

থেকে যেটা বিকার, স্বাস্থ্যবিদ্যার দিক থেকে যেটা অসুস্থতা তাকে ওরা আমল দেবে কেমন করে?

যৌনবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা সম্বন্ধে ওদের দেশে যে ব্যবস্থা তার মধ্যেই এই দুটো ভঙ্গি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। ওয়েব-দম্পতি বলছেন: "সোবিয়েৎ সেন্সর ব্যবস্থা (গ্লাভলিট) অশ্লীলতা (Pornography)-কে প্রশ্রয় দিতে একেবারেই রাজী নয়। কিন্তু যৌনক্রিয়া, রোগ ও কামবিকার সম্বন্ধে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভাষায় এবং শরীরতত্ত্ববিদ্ ও চিকিৎসক-চিন্তাশীলের পক্ষে সমস্ত রকম কথা আলোচনা করবার আর ছাপাবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। এ-জাতীয় বর্ণনা ও আলোচনা অশ্লীলতার কাছ ঘেঁষলেই সেন্সর ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে তা বন্ধ করে দেবে। অশ্লীলতার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত এ-বিষয়ে যে-কোনো জিনিষ, যে-কোনো ভাবে ও যে-কোনো মূল্যে প্রকাশিত হতে পারে।" ঝোঁকটা যদি বিজ্ঞানের উপর থাকে তাহলে যৌনবিজ্ঞানের আলোচনা সম্বন্ধে ঠিক এই রকম ভঙ্গিটা হওয়াই স্বাভাবিক নয় কি? ব্রহ্মচর্যবাদীদের মতো যৌনবিজ্ঞানের আলোচনা সম্বন্ধে আঁৎকে ওঠা নয়, আবার পর্নোগ্রাফি বা অশ্লীলতা সম্বন্ধেও নির্বিকার থাকা নয়। কেননা, পর্নোগ্রাফি বা অশ্লীলতাটা হলো অবৈজ্ঞানিক, মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, যেমন ক্ষতিকর সাধুবাক্যের অন্তরালে যৌনজীবনের কথাটা ঢেকে রাখবার চেষ্টা। সোবিয়েৎ সমাজ কী রকম সহজ ও শান্তভাবে যৌনজীবন সম্বন্ধে স্পষ্ট ও বৈজ্ঞানিক ধারণার প্রয়োজনকে স্বীকার করে নিয়েছে সে-সম্বন্ধে ওয়েব-দের আর একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করা যায়। ওরা বলছেন: "ইউ.এস এস.আর-এ শারীরিক কোনো ক্রিয়াকে—এমন কি রতিবিহার ও প্রজনন ব্যাপারকেও—নীতিবাগীশের মতো চেপে যাবার বা অগ্রাহ্য করবার চেষ্টা নেই। প্রকৃতিরাজ্যের নগ্নতার মতোই মানুষের নগ্নতায় অভ্যস্ত হয়ে শিশুরা বড় হয় এবং ক্রমশ তারা শেখে ব্যবহারের কোন কোন দিক সঙ্গীদের সামনে উপযুক্ত নয়, কেননা এগুলো হলো ব্যক্তিগত জীবনের দিক; তবু তাদের কখনো এই কথা শেখানো হয় না যে, শরীরের এমন কোনো ক্রিয়াকলাপ আছে যাকে কুৎসিত বলা দরকার।"

বলাই বাহুল্য, সোবিয়েৎ সমাজে যৌনবিষয়ে আলোচনা সম্বন্ধে এই যে দৃষ্টিভঙ্গি, এর মূলে রয়েছে সোবিয়েৎ পরিকল্পনার একটা বিশেষ আদর্শ। সে আদর্শকে বর্ণনা করেছি সুস্থ ও যৌনমুক্তির আদর্শ বলে। ১৯২১-এ—অর্থাৎ বিপ্লবের বছর চারেক পরে—স্বয়ং লেনিন এই আদর্শের কথা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন।

জার্মানীতে একদল তরুণ বিপ্লবী কর্মী মনে করেছিলেন: আর কী, বিগত যুগের সবরকম সংস্কারই তো আমরা ঝেঁটিয়ে ফেলে দিতে চলেছি। ফলে, যৌনজীবন সম্বন্ধেই বা কোনোরকম বাচ-বিচার থাকবে কেন? অবশ্যই সুস্থ যৌনজীবনের বিরুদ্ধে যেসব বিধিনিষেধের শাসন সেগুলোর হাত থেকে বিপ্লবী কর্মী মুক্ত হতে চাইবেন বই কি? এ-কথায় নিশ্চয়ই কোনো ভুল নেই যে, শ্রেণীসমাজের গ্লানিকে যতদিন না কাটিয়ে ওঠা যায় ততদিন মানুষ শ্রেণীহীন সমাজের দিকে এগোতে পারবে না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, যৌনজীবনে কোনো রকম বাচ-বিচার থাকবে না, যুবকের দল শুধু বেপরোয়ার মতো ফুর্তি খুঁজে বেড়াবে। একদল যুবক কিন্তু তাই মনে করতো। তারা একরকম যুক্তি-তর্ক দিয়ে সমর্থন করতে চাইতো নিজেদের কথা। যুক্তিটা মোটামুটি এই: প্রেম করা বলে ব্যাপারটা "এক গেলাস জল" পান করার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। খিদে পেলেই মানুষ খাবার খায়, তেষ্টা পেলেই জল পান করে,—তেমনি কামনা জাগলেই করবে সহবাস, এর জন্যে আর কিছু বিচারের কথা অপ্রাসঙ্গিক। ফলে, তাদের কাছে মুক্তির অর্থ দাঁড়ালো উচ্ছৃঙ্খলতা।

মুক্তি মানে অবশ্যই অনুশাসনের বোঝায় নুয়ে পড়া বোঝাবে না। তবু মুক্তি আর উচ্ছৃঙ্খলতা—এ দুটো এক কথাও কখনোই হতে পারে না। তা যদি হতো তাহলে সম্পূর্ণ উন্মাদ ব্যক্তিকেই আমরা বলতাম সবচেয়ে মুক্ত পুরুষ। নিয়মের সঙ্গে মুক্তির সম্পর্কটা ঠিক কি তা ভেবে দেখতে হবে। প্রকৃতির নিয়মকে প্রাণপণে অমান্য করবার, উড়িয়ে দেবার চেষ্টাকেই কি প্রকৃত মুক্তি বলা হবে? না, প্রকৃতির নিয়মকে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে, সবচেয়ে সহজভাবে চিনতে পারার, স্বীকার করতে পারার নাম হবে মুক্তি? যে-মানুষ

আকাশের নিয়ম জানলো, বাতাসের নিয়ম জানলো, জানলো পৃথিবীর আকর্ষণের নিয়ম, সেই পারলো উড়োজাহাজ বানিয়ে আকাশ পাড়ি দিতে। সে কি নিয়মগুলো অগ্রাহ্য করলো? সে যদি বলতো: 'মাধ্যাকর্ষণ আমি মানি নে, মানি নে আকাশ-বাতাসের নিয়ম'—তাহলে তার পক্ষে আকাশ-বিহারের মুক্তি কোনোদিনই সম্ভব হতো না, বরং তার দিন কাটতো পাগলা গারদের অন্ধকূপে। মুক্তি মানে নিয়মকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা নয়, নিয়মকে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে চিনতে পারা, স্বীকার করতে পারা। রোগের কারণ হলো বীজাণু—এই নিয়মকে যে-লোক তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চায় তার পক্ষে রোগের হাত থেকে মুক্তি পাবার আশা নেই। আর যে-লোক এই নিয়মকে মানে, সবচেয়ে স্পষ্ট ও সহজভাবে স্বীকার করতে পারে, সেই লোকই মুক্তি পায় রোগের হাত থেকে।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই কথা। যৌনজীবনের বেলাতেও এই কথাই। যৌনজীবনের ক্ষেত্রে মুক্তির আদর্শটা কী হবে তা একটু খুঁটিয়ে আলোচনা করা দরকার। অনুশাসনের বোঝায় নুয়ে পড়া নিশ্চয়ই নয়। যে শোষণ-ব্যবস্থাকে কায়েম রাখবার আশায় যৌনজীবনের উপর অজস্র অনুশাসনের চাপ, সেই শোষণ-ব্যবস্থাকে দূর করবার সঙ্গে সঙ্গে অনুশাসনগুলোও শিথিল হয়ে যেতে বাধ্য। সোবিয়েৎ পরিকল্পনা নারীকে সামাজিক মেহনতের মর্যাদা ফিরিয়ে দেবার জন্যে কোনো রকম ব্যবস্থাকেই অগ্রাহ্য বা তুচ্ছ করেনি। মেয়েরা সামাজিক মেহনতের মর্যাদা ফিরে পেলে যৌনজীবনের উপর থেকে অবাঞ্ছিত অনুশাসন আপনিই উবে যাবে। তাই, অনুশাসন-দৈত্যের প্রাণ-ভোমরাকে সোবিয়েৎ পরিকল্পনা দ'লে মারবার ব্যবস্থা করলো মেয়েদের কাছে সামাজিক মেহনতের মর্যাদা ফিরিয়ে দিয়ে। কিন্তু এ তো শুধু একটা দিকের কথা। এর অপর দিক? অপর দিকে নিশ্চয়ই যৌনজীবনের মূল নিয়মকে সুস্থ ও সহজভাবে চিনতে পারার কথা। এই দিকটার কথা দীর্ঘভাবে আলোচনা করা দরকার, না হলে লেনিনের বক্তব্যকে ভুল বোঝবার সম্ভাবনা থেকে যাবে।

যৌনজীবনের মূল নিয়মগুলোকে সুস্থ ও সহজভাবে চিনতে

হবে, স্বীকার করতে হবে। নিয়মগুলোর স্পষ্টই দুটো দিক, এক হলো সামাজিক দিক আর এক হলো ব্যক্তিগত দিক।

প্রথমত, সামাজিক দিক। মানুষ শেষ পর্যন্ত সামাজিক জীবই, শ্রেণীসমাজকে ভেঙে শ্রেণীহীন সমাজের দিকে এগোতে চাইবার সময় সমাজকে অস্বীকার করবার কথা তো ওঠেই না, বরং সমাজের উপর ঝোঁকটা অনেক বেশি করে পড়বার কথা। কেননা, শ্রেণীসমাজের মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হতে পারে, থাকতে পারে শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু শ্রেণীহীন সমাজের দিকে মানুষ যতই এগোতে চায় ততই সে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতরভাবে বুঝতে পারে দশের উন্নতি বাদ দিয়ে একের উন্নতি সম্ভবই নয়, দশের সুখকে বাদ দিয়ে কেউই একা সুখী হতে পারে না। জীবনের প্রত্যেকটি দিকের বেলাতেই এই কথা: তাই যৌনজীবনের বেলাতেও। অবশ্যই মানুষ কামপ্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করে প্রকাশ্যভাবে নয়, প্রকটভাবে সমাজকে দেখিয়ে নয়। তবুও এই কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থতার সামাজিক দিকগুলোকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। কেননা, প্রথমত, কোনো সুস্থ মানুষই আত্মরতিতে মগ্ন থাকতে পারে না; আত্মরতি যৌনজীবনের একটা উপাদান হলেও কেউ যদি একান্তভাবে আত্মরতি-পরায়ণ হয় তাহলে তাকে উন্মাদই বলতে হবে। অর্থাৎ, মানুষের স্বাভাবিক কামপ্রবৃত্তি অপর কোনো পাত্র বা পাত্রীকে চাইতে বাধ্য,—সমাজের অপর ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে তাই কারুরই যৌনজীবন সুস্থ ও সার্থক হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থতার সহজ ও স্বাভাবিক পরিণাম হলো সন্তানের জন্ম; এবং এই সন্তানজন্মের দিক থেকে ভেবে দেখলে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় সামাজিক ভালোমন্দের সঙ্গে কামপ্রবৃত্তি কী রকম ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত। আর এই দিক থেকে, সামাজিক ভালোমন্দের সঙ্গে যৌনপ্রবৃত্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দিক থেকে—মানতেই হবে যৌনজীবনে মানুষ সব রকম বিচার-বিবেচনাকে ঠেলে ফেলে বেপরোয়ার মতো শুধু ফুর্তির তালে ঘুরতেই পারে না। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, সোবিয়েৎ সমাজেও মানুষের আনন্দকে খর্ব করা হবে, নীতিমূলক বা কর্তব্যমূলক কয়েকটি বিধিনিষেধ দিয়ে। সোবিয়েৎ সমাজে সামাজিক ভালোমন্দের

সঙ্গে যৌনজীবনের সঙ্গতি রক্ষা করার আসল তাগিদ হলো মানুষের আনন্দেরই তাগিদ। যৌনজীবনের উদ্দেশ্যটা কী? সুস্থ উপভোগ, পূর্ণাঙ্গ আনন্দ; সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি তাই হয় তাহলে ভালো করে ভেবে দেখা দরকার আনন্দ আর উপভোগ সবচেয়ে সুস্থ আর সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ কেমন করে হতে পারে? দশের সুখের সঙ্গে নিজের সুখের নিটোল সঙ্গতি না হলে কোনো মানুষই পূর্ণাঙ্গ সুখের অধিকারী হতে পারে না। আর তাই, তার যৌনজীবনেও দশের কথাটা, সমাজের কথাটা, সে ঠেলে রাখতে পারে না— কোনো কল্পিত নীতিকথার খাতিরে নয়, কোনো ধর্মমূলক কর্তব্য-বুদ্ধির তাগিদে নয়, শেষ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ সুখের তাগিদেই। সোবিয়েৎ পরিকল্পনায় তাই সামাজিক দিকটার উপর এত বেশি ঝোঁক

তারপর ব্যক্তিগত দিকটার কথাও ধরা যাক। যৌনপ্রবৃত্তির মূল নিয়মটা ঠিক কি? নির্বিচারে বহুকে উপভোগ করবার চেষ্টায় দৌড়নো? নিশ্চয়ই নয়; কেননা ওটা একরকম অসুস্থতাই।

প্রেম যেখানে সুস্থ আর সহজ সেখানে আস্ফালনের উৎসাহটা নেই; কিন্তু প্রেম যেখানে অসুস্থ আর পঙ্গু সেইখানেই আস্ফালনের আবরণ দিয়ে দুর্বলতা ঢেকে রাখবার দরকার পড়ে। তাই এই আস্ফালন, এই বেপরোয়া ব্যবহারের তাগিদ,—এর মধ্যে আনন্দের আস্বাদ জোটবার সম্ভাবনা নেই। প্রেম যেন এই ক্ষেত্রে একটা উত্তেজক ওষুধ, যেন মাদক দ্রব্য, মাতালের কাছে যেমন মদ। এই ওষুধ, এই মাদক দ্রব্যের কাছ থেকে উত্তেজনা না পেলে মন যেন অসহায় বোধ করে, নেতিয়ে পড়তে চায়। যাদের আমরা মাতাল বলি, মদ্যপান তাদের কাছে সুস্থ উপভোগ নয়, তার বদলে একরকমের বাধ্যতামূলক দাসত্ব। তাই মদ না পেলে এরা হন্যে হয়ে ওঠে, জীবনের আর কোনো অর্থ ই এরা খুঁজে পায় না। মদের অভাব এদের সত্তাকে টলিয়ে দিতে চায়, পঙ্গু অকর্মণ্য করে রাখে।

মদ্যপানের বেলায় যে কথা, প্রেমের বেলাতেও সেই কথা। প্রেমের পেছনেও শুধু সহজ প্রবৃত্তির তাগিদ থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে, থাকতে পারে একরকম অসুস্থ ও বাধ্যতামূলক তাগিদ। যে প্রেমের পেছনে সহজ প্রবৃত্তির তাগিদ, তাকেই বলতে হবে সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রেম। সেখানে কাঙালের ভাব

ফুটে উঠবে না—কাঙালের খিদে আর সুস্থ মানুষের খিদে, এ-দু'-এর মধ্যে জাতের তফাত আছে। পেট ভরলেও কাঙালের খিদে চোকে না। প্রেমের তাগিদ যেখানে কাঙালপনার রূপ নিয়েছে, মাতলামির রূপ নিয়েছে, সেখানে প্রেমিকের মনের পেছনে সহজ প্রবৃত্তির সুস্থ তাগিদ নেই, আছে অসুস্থতার তাগিদ। তাই প্রেমিক এখানে প্রেমিকাকে চায় না, প্রেম চায় না, চায় মাত্র প্রেমিকার সংখ্যা! কাঙালের যেমন খাবারের দিকে মন থাকে না, থাকে পরিমাণটার দিকে। প্রেম যেন তার কাছে একরকম চিকিৎসাপদ্ধতি, অসুস্থ এক মনোভাবের চিকিৎসা। প্রেম যেখানে সহজ ও সুস্থ প্রেমিকের মনে সেখানে শক্তির সচ্ছলতা; আর তাই, এই সচ্ছলতার নির্ভরেই তার মন বহুমুখী আনন্দের, বহুমুখী সৃজনীর পথে এগোতে পারে। কিন্তু শুধু হন্যের মতো নারী অন্বেষণে যার মন আটকে রয়েছে, নারী তার কাছে হলো জীবনের একমাত্র অবলম্বন, মাতালের কাছে যেমন মদ, কোকেন-সেবীর কাছে যেমন কোকেন। তার মনের শক্তি এত ক্ষীণ, এমন দুর্বল যে, এই অবলম্বনকে বাদ দিয়ে সে যেন বাঁচতেই পারে না। তার মনের আসল রূপটা তাই রুগ্ন: দৈন্যের রূপ, অভাবের রূপ, করুণ ও অসহায়। তার প্রেমকে তাই প্রেমই বলা চলে না—বরং কাঙালের খিদের মতো এ-প্রেম একরকম অসুস্থতা।

লেনিন তাই স্পষ্টই বুঝেছিলেন, যে-যুবকদল প্রেমকে এমন তথাকথিত সোজা ব্যাপারে পরিণত করে তোলবার আস্ফালন করছে, তারা আসলে জীবনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত এক অসুস্থ আদর্শ নিয়েই বড়াই করছে। তাই, ব্যক্তিগত আনন্দের দিক থেকেও, এই 'এক গ্লাশ জল' মার্কা মতবাদকে উৎসাহ দেবার কিছু নেই। এটা যৌনমুক্তির কথা নয়, পঙ্গু মনোভাবের কথা। তাছাড়া, সামাজিক দিক থেকে তো যৌনমুক্তি বলতে বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খলতা বোঝাতে পারেই না।

বিপ্লবী মহিলা ক্লারা জেটকিন লেনিনকে প্রশ্ন করেছিলেন, প্রেম সম্বন্ধে ওই 'এক গ্লাশ জল' মার্কা মতবাদ নিয়ে অনেকে যে হৈ চৈ বাধিয়েছে সে সম্বন্ধে তাঁর মত কী? উত্তরে লেনিন অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তাঁর মতবাদ ব্যক্ত করেন এবং জনসাধারণের মধ্যে এই

নিয়ে অনেক আলোচনা আর তর্ক হবার পর শেষ পর্যন্ত সোবিয়েৎ সমাজ লেনিনের এই উক্তির মধ্যেই যৌনজীবনের প্রকৃত আদর্শকে স্বীকার করে নেয়।

"আমার মতে এই 'এক গ্লাশ জল' মার্কা মতবাদ একেবারে পুরোপুরি মার্কস্‌বাদ-বিরোধী এবং তাছাড়া অসামাজিকও। যৌনজীবনের বেলায় শুধুমাত্র সরল ও প্রাকৃতিক লক্ষণের দিকে নজর রাখলেই চলবে না, সাংস্কৃতিক লক্ষণ সম্বন্ধেও ভেবে দেখতে হবে, দেখতে হবে সেগুলো উন্নত না অবনত ধরনের। 'পরিবারের উৎস' নামের বইতে এঙ্গেল্‌স্‌ দেখিয়েছেন সাধারণ যৌনপ্রবৃত্তি ব্যক্তিগত যৌনপ্রণয়ের রূপে উন্নীত ও সংস্কৃত হয়ে উঠবার তাৎপর্য কত গভীর!....তৃষ্ণাকে নিবারণ করতে হবে, নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় একজন স্বাভাবিক মানুষ কি রাস্তার ধারে শুয়ে নর্দমায় মুখ ডুবিয়ে জল পান করবে, কিংবা অনেক ঠোঁটের এঁটো লেগে যে গেলাশের কানাটা চটচটে হয়েছে সেই গেলাশ থেকে জল পান করবে? তবু সামাজিক দিকটার কথাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জল পানটা অবশ্যই ব্যক্তিগত ব্যাপার। প্রেমের বেলায় দুটি মানুষের জীবন নিয়ে কথা, এবং একটি তৃতীয় জীবন—নতুন একজনের জীবন--এর মধ্য থেকে গড়ে ওঠে। এই কারণেই এর এতখানি সামাজিক গুরুত্ব।....

"কমিউনিস্ট হিসেবে এই 'এক গ্লাশ জল' মার্কা মতবাদ সম্বন্ধে আমার এতটুকুও সহানুভূতি নেই, যদিও এর নামটা বেশ রঙচঙে—'প্রেমের চরিতার্থতা'। মোটের উপর, এই মুক্ত প্রেমের কথাটা নতুনও নয়। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই, গত শতাব্দীর মাঝামাঝি এই কথাটা নিয়েই 'হৃদয়ের মুক্তি' নাম দিয়ে রোমান্টিক সাহিত্যে প্রবল উচ্ছ্বাস করা হয়েছিল। বুর্জোয়া অভ্যাস-জীবনে 'মাংস-র মুক্তি' মাত্রে পরিণত হয়েছিল এই কথা। তখন তবু কথাটা প্রচার করার পেছনে ছিল অনেক বেশি প্রতিভার পরিচয়—আর অভ্যাসের কথাটা, ওটার কথা আমি বিচার করতে পারবো

না। কমিউনিজম ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠা করবে না; তার বদলে আনবে জীবনের আনন্দ, জীবনের শক্তি—এবং সুচরিতার্থ প্রণয়-জীবন এই আনন্দ আর শক্তিকে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। আমার মতে যৌনজীবনের উপর আজকের দিনে যে এতখানি ফাঁপানো ফোলানো জোর দেবার চেষ্টা তার থেকে জীবনে আনন্দ আর শক্তি পাওয়া যায় না; বরং জীবন থেকে আনন্দ আর শক্তিকে বাদ দেওয়া হয়। বিপ্লবের এই যুগে ব্যাপারটা বিশ্রী, নেহাতই বিশ্রী।

"বিশেষ করে তরুণদের পক্ষে জীবনের আনন্দ চাই, শক্তি চাই; সুস্থ খেলাধুলা, সাঁতার, গতির প্রতিযোগিতা, হাঁটা, সমস্ত রকম শারীরিক ব্যায়াম, আর বহুমুখী সাংস্কৃতিক উৎসাহ, পড়াশুনো, গবেষণা, জিজ্ঞাসা,—যতদূর সম্ভব একসঙ্গে মিলে। যৌনজীবনের সমস্যা নিয়ে অনন্ত আলোচনা আর তথাকথিত 'পুরো ফূর্তিতে বাঁচা'র মতবাদের চেয়ে তরুণদের পক্ষে এই সব বিষয় থেকে অনেক অনেক বেশি পাবার আছে। সুস্থ শরীর, সুস্থ মন সন্ন্যাসীও নয়, ডনজুয়ানও নয়, আবার জার্মান ফিলিস্টাইনদের মতো কোনো মধ্যপন্থার ভঙ্গিও নয়। কমরেড 'ক'-কে জানো তো? চমৎকার ছেলে, খুবই প্রতিভাশালী, তবু আমার ভয় হয় ওর দ্বারা বিশেষ কিছু হবে না। একটা প্রণয়ঘটিত ব্যাপার থেকে আর একটা প্রণয়ঘটিত ব্যাপারের মধ্যে ও ক্রমাগতই ঘুরপাক খাচ্ছে আর টলমল করছে। রাজনৈতিক আন্দোলনের ব্যাপারে এ-সব চলে না, বিপ্লবের সঙ্গে এর সঙ্গতি নেই। আর, যে সব মেয়েরা নিজেদের ব্যক্তিগত প্রণয় আর রাজনীতির মধ্যে তফাত করতে জানে না তাদের উপর আমার আস্থা নিয়ে, বা সংগ্রামের ব্যাপারে তাদের ধৈর্যের পক্ষ নিয়ে, আমি কোনোরকম দাবি করতেই রাজী নই। আর, যে সব যুবক প্রত্যেকটি মেয়েলি-জামার পেছু পেছু দৌড়চ্ছে, প্রত্যেকটি মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে তাদের পক্ষ নিয়েও নয়। না, না, বিপ্লবের সঙ্গে এ সব একেবারেই খাপ খায় না।"

ক্লারা জেটকিন বর্ণনা করছেন, কথা বলতে বলতে লেনিন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। টেবিলের উপর একটা থাপ্পড় মেরে

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, ঘরের মধ্যে একটুখানি পায়চারি করলেন এবং তারপর আবার বলে চললেন :

"বিপ্লবের জন্যে চাই অভিনিবেশ, চাই শক্তির প্রাচুর্য। জনগণের কাছ থেকে, ব্যক্তি বিশেষের কাছ থেকে। দ' আন্নুন্সিওর উপন্যাসের ক্ষয়িষ্ণু নায়ক-নায়িকাদের পক্ষে যে-রকম উন্মত্ত রিরংসা স্বাভাবিক, বিপ্লব তা সহ্য করতে পারে না। যৌনজীবনের উচ্ছৃঙ্খলতাটা হলো বুর্জোয়া, ক্ষয়ের লক্ষণ। শ্রমিক-শ্রেণী উদীয়মান শ্রেণী। তাই তার পক্ষে দরকার নেই নেশার, মাদক দ্রব্য হিসেবেও নয়, উত্তেজক হিসেবেও নয়। মদের সাহায্যে যে-রকম নেশা চাই না তেমনিই যৌন ব্যাপারের নেশাও নয়। এই শ্রেণীর পক্ষে ভোলা চলবে না,—ভোলা সম্ভব নয়—পুঁজিবাদের লজ্জা, নোংরামি আর বীভৎসতা।....তার চাই স্বচ্ছতা, আরো, আরো স্বচ্ছতা। তাই আমি আবার বলছি, দুর্বলতা নয়, অপচয় নয়, শক্তিকে ধ্বংস করা নয়। আত্মসংবরণ, আত্মসংগ্রাম—দাসত্ব নয়, যৌনপ্রবৃত্তির কাছেও দাসত্ব নয়। কিন্তু, ক্লারা, আমায় ক্ষমা করো, আসল কথা থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি যে!—আমাদের তরুণ-তরুণীদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত বেশি সচেতন। ওটা যে বিপ্লবের অঙ্গ। তাই যদি বিষাক্ত কোনো সম্ভাবনা দেখা দিয়ে থাকে, যদি তা বুর্জোয়া জগৎ থেকে লতিয়ে বাড়তে থাকে বিপ্লবের জগতের দিকে, অনেকরকম আগাছার শেকড় যে-রকম বেড়ে চলে—তাহলে প্রথম দিকেই সেগুলোকে উপড়ে ফেলা দরকার।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গণিকা

এঙ্গেল্‌স্ বলেছিলেন, আগামীকালের শ্রেণীহীন সমাজে মানুষের সুস্থ যৌনপ্রণয় কি রকম রূপ নেবে সে-প্রশ্নের মীমাংসা করবে আগামীকালের মানুষ, যাদের মধ্যে পুরুষরা জীবনে একবারও নগদ মূল্যের বিনিময়ে বা সামাজিক প্রভুত্বের প্রভাব দিয়ে কোনো নারীর সমর্পণ কেনেনি, আর মেয়েরা শুধু প্রেম ছাড়া আর কিছুর তাগিদে কখনও কোনো পুরুষের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে বাধ্য নয়....।

সেই রকম মানুষ দেখা দিয়েছে আজকের দিনের সোবিয়েৎ সমাজে। কেননা আজকের দিনে সোবিয়েৎ দেশই পৃথিবীতে একমাত্র দেশ যে-দেশে গণিকা নেই! গত লড়াই-এর সময় সোবিয়েৎ রেড ক্রসের তরফ থেকে অধ্যাপক লেবেডেনকো আমেরিকায় গিয়েছিলেন আর খবরের কাগজওয়ালাদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন: আধুনিক যুগের রুশ যুবকরা গণিকা শব্দটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করবার সুযোগ কখনও পায়নি। অধ্যাপকের এই কথা নিয়ে তখন মার্কিন মহলে তীব্র সমালোচনা জাগতে শুরু করেছিল, অনেকেই প্রকাশ করেছিলেন তীক্ষ্ণ সংশয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, জনসাধারণ যখন এ-নিয়ে খবরাখবর শোনবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলো তখন প্রায় নিঃশব্দে ধামাচাপা দেওয়া হলো ব্যাপারটাকে।

১৯৪৬-এ 'পাপ ও বিজ্ঞান' নামে গ্রন্থ প্রকাশ করলেন কানাডার লেখক ডাইসন কার্টার। সেই গ্রন্থে তিনি লিখছেন: "বছর পাঁচেক আগে একদল সোবিয়েৎ টেকনিসিয়নের সঙ্গে দুর্নীতি ও মদ্যপান সম্পর্কে আলোচনা করবার সুযোগ আমার হয়েছিল। ওদের কথাকে বিশ্বাস করবার উপযুক্ত কারণ ছিল বলেই আমি সোজাসুজি প্রশ্ন করলাম, 'সোবিয়েৎ সরকার

ঠিক কেমনভাবে গণিকা, যৌনঅপরাধ, যৌনব্যাধি, শিশুদের মধ্যে যৌনবিকৃতি এবং মাতালদের সমস্যা সমাধান করতে এগিয়েছিল ?'

'ওরা কেউ উত্তর দিতে পারলো না। সোবিয়েতের এই ক'জন নাগরিকের সকলেই বয়সে তরুণ। নিউ ইয়র্ক আর টরেণ্টোর রাজপথেই ওরা জীবনে প্রথম গণিকা দেখেছে। ওরা সোজাসুজিই বললো, "ইউ.এস.এস.আর. বহুদিন আগেই এ সব সমস্যার সমাধান করেছে। অন্তত দশ বছর তো হবেই। আমরা তখন ছেলেমানুষ। আমাদের শুধু এইটুকুই মনে আছে যে, এই বিষয়ে ব্যবস্থাগুলো প্রবর্তন করা নিয়ে আমাদের মা-বাবারা উত্তেজিতভাবে তর্ক বিতর্ক করতেন। কিন্তু খুঁটিনাটির কথা আমাদের কিছু মনে নেই। ব্যাপারটা আমাদের কাছে অতীত ইতিহাসে পরিণত হয়েছে"।'

বিষয়টা ভাবতে গেলে অবাক লাগবার কথা। ১৯১৭-তে বিপ্লব হলো—আর ১৯৪১-এ সোবিয়েৎ যুবকরা নিউ ইয়র্ক আর টরেণ্টোর রাজপথে পা দিয়ে প্রথম দেখতে পেলো গণিকা বলে জিনিসটা আসলে কী রকম! গত তিন হাজার বছর ধরে সভ্য দুনিয়ায় যে কদর্যতম গ্লানির একটানা ইতিহাস, সোবিয়েৎ সমাজের মাত্র ২৪ বছরের ইতিহাস সেই গ্লানিকে অতীত ইতিহাসের সামিল করে তুললো! অথচ, সোবিয়েতের ওরা সত্যিই তো কোনোরকম যাদুমন্ত্র জানে না; কিংবা, যা একই কথা, যদিই বা কোনো যাদুমন্ত্র ওদের জানা থাকে তাহলে তার একমাত্র নাম হলো বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের হাতিয়ার হাতে মানবজাতিকে মেরামত করবার জন্যেই কোমর বেঁধেছে ওরা!

মনে রাখতে হবে রুশ দেশে কমিউনিস্টরা যখন রাষ্ট্রশক্তি পেল, দেশের অবস্থা তখন সবদিক থেকেই একেবারে চূড়ান্ত সংকটের অবস্থা। শুধু যে অর্থনৈতিক ব্যাপারে দেশে তখন দারুণ সংকট তাই নয়, তখনকার রুশ দেশে নৈতিক অধঃপতনের বীভৎসতাও আমাদের কাছে প্রায় অবিশ্বাস্যই মনে হয়। জার আমলের নৈতিক অধঃপাতের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে তখনকার নানান উপন্যাস থেকে—যেমন ধরুন, 'ইয়ামা দি পিট' এ-বিষয়ে একটা নাম করা উপন্যাস। অবশ্যই, এই বীভৎসতার দীর্ঘ বর্ণনা

দেবার চেষ্টা করে লাভ নেই, কেননা এই জাতীয় বীভৎসতা পৃথিবীর বাকি সব সভ্য দেশেই কম-বেশি বর্তমান। আসল প্রশ্ন হলো: কেমন করে কোন বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার সাহায্যে, সোবিয়েৎ সমাজ এগিয়ে এল এত বীভৎসতাকে পিছনে ফেলে, একে ভুলে যাওয়া ইতিহাসে পরিণত করে?

যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর অনেক মনীষী, অনেক সাধু ব্যক্তি, গণিকা-সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, অনেক দেশের সরকারী কর্তৃপক্ষ অনেকবার অনেক রকম হামলা করেছেন গণিকাপ্রথা উচ্ছেদ করবার আশায়। কিন্তু এত চিন্তার, এত চেষ্টার, ফল হয়নি এতটুকুও। মনীষীরা আর সাধু ব্যক্তিরা শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে নানান রকম হতাশার কথাবার্তা বলতে বাধ্য হয়েছেন। কেউ বলেছেন কোনো কোনো মেয়ের মধ্যে পতিতা হবার প্রবৃত্তি যেন মজ্জাগত—গণিকা-প্রথার উচ্ছেদ তাই অসম্ভব। কেউ বা বলেছেন, পুরুষের যৌনপ্রবৃত্তি একান্তভাবেই বহু নারীকে উপভোগ করতে চায়,—গণিকা-প্রথার উচ্ছেদ তাই অসম্ভব। কেউ বা মানুষের মনে ধর্মভাব, নীতিভাব জাগাবার চেষ্টা করেছেন—যে-ভাবের প্রভাবে সমাজ থেকে মানুষ এই কদর্যতাকে মুছে ফেলতে পারবে। কেউ বা আবার কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করে উচ্ছেদ করতে চেয়েছেন এই প্রথার। এই রকম, নানান রকম। সরকারী কর্তাদের চেষ্টাটা বাকি সব দেশে প্রায় সব যুগেই একটিমাত্র রূপ গ্রহণ করেছে। যত নষ্টের গোড়া ওই গণিকারাই, অতএব ওদের খেদিয়ে বেড়াও। সরকারী পাইক-পেয়াদারা বার বার তাই গণিকা-পল্লী চড়াও করেছে। ফলে কিন্তু গণিকা-প্রথার উচ্ছেদ কোথাও হয়নি। লাভের মধ্যে বড় জোর পাইক-পেয়াদাদের পকেটে কিছু নগদ কড়ি জমেছে, উপরি হিসেবে একটু-আধটু আমোদ-আহ্লাদও হয়তো বা। কিংবা সরকারী কর্তারাই অনেক সময় এই খেদিয়ে বেড়াবার কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন, কেননা তাঁরা দেখেছেন এর ফলে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট পল্লীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে গণিকারা ছড়িয়ে পড়ছে সারা শহরময়। তাছাড়া, এ-হিসেব তো রয়েছেই যে, প্রকাশ্যভাবে পেশাদার গণিকাদের চেয়ে প্রচ্ছন্ন গণিকাদের সংখ্যা এমন কিছু কম নয়।

মার্কিনদের আধুনিকতম পরিভাষায় এদের নাম হলো Victory Girls, আমাদের দেশের তুখোড় ইয়ারের দল এদেরই নাম দেয়—হাফ গেরস্থ!

বার্থতার ফর্দ বাড়িয়ে লাভ কম। মোটের উপর, সভ্যতা শুরু হবার সময় থেকেই সমাজে দেখা দিয়েছে গণিকাবৃত্তি, সভ্যতারই একটা কদর্য অঙ্গের মতো। আর অনেক, অনেক শতাব্দী ধরে, অনেক, অনেক সাধুপুরুষ আর রাজপুরুষ সভ্যতার দেহ থেকে এই বিকৃত গলিত অঙ্গকে দূর করা নিয়ে অনেক রকম কল্পনা করেছেন, করেছেন অনেক চেষ্টা। ফল হয়েছে সবশুদ্ধ একটা শূন্য। গণিকা-প্রথার উচ্ছেদ করা যায়নি। বরং সভ্যতা যত এগিয়েছে ততই পতিতা আর সাধ্বীর মধ্যে সীমারেখা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে এবং শেষ পর্যন্ত যে-সব দেশে ধনতন্ত্রের চরম বিকাশ সেই সব দেশে এক প্রচ্ছন্ন বা প্রকট গণিকাবৃত্তিই যেন গ্রাস করতে চেয়েছে সমগ্র সমাজের নরনারীর সম্পর্ককে।

সোবিয়েৎ দেশ ১৯১৩ সাল নাগাদ গণিকা-প্রথার সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রাম শুরু করলো। সমাজের অঙ্গ থেকে এই গ্লানিকে দূর করতে হবে। কিন্তু কেমন করে? সাধু বাক্য দিয়ে নয়, পূতমন্ত্র পাঠ করে নয়, অনর্থক জুলুমবাজী করেও নয়। তাহলে? সোবিয়েতের কাছে বরাবরই একটিমাত্র উত্তর; বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের সাহায্যে। বিজ্ঞানের প্রথম কথা হলো—কার্যকারণ সম্বন্ধ আবিষ্কার করা। গণিকা-প্রথাকে সত্যিই যদি দূর করতে হয়, উচ্ছেদ করতে হয়, তাহলে সর্ব প্রথম সবচেয়ে স্পষ্টভাবে জানতে হবে এই প্রথার মূল কারণটা কি? অবশ্যই অন্যান্য দেশের অন্যান্য সাধুপুরুষরাও এই মূল কারণ নিয়ে মাথা ঘামাতে কসুর করেননি। কিন্তু সোবিয়েতের সঙ্গে তাঁদের একটি মূল তফাত এই যে, সোবিয়েতের মানুষ জানে, অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই জানে যে, শুধু মাথা ঘামিয়ে কোনো বিষয়ের প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করা একেবারেই অসম্ভব। মাথা ঘামিয়ে একটা কারণকে নির্ভুল কারণ বলে কল্পনা করে বাস্তবের উপর

তাকে চাপিয়ে দেবার চেষ্টাটা নিষ্ফল। তার বদলে বাস্তবকে পরীক্ষা করতে হবে নির্ভুলভাবে. তা না হলে নির্ভুল কারণ আবিষ্কার করার কথাই ওঠে না। সোবিয়েৎ তাই নির্ভুলভাবে বাস্তবকে পরীক্ষা করতে লাগলো।

পদ্ধতির প্রথম ধাপটা একটু অদ্ভুত—অর্থাৎ অন্য দেশের অন্য মানুষদের কাছে কী রকম যেন খাপছাড়া। ১৯২৩-এ সোবিয়েতের কর্তৃপক্ষ একটি প্রশ্নপত্র তৈরি করলেন; প্রশ্নগুলির খসড়া করলেন পুরুষ এবং মেয়ে ডাক্তার, ট্রেড ইউনিয়নের নেতা, মনোবিজ্ঞানী এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা একসঙ্গে মিলে। এবং ছাপা প্রশ্নপত্র দেশের হাজার হাজার মেয়েদের কাছে বিলি করা হলো - অবশ্যই গোপনে এবং প্রত্যেকটি মেয়েকেই সম্পূর্ণভাবে আশ্বাস দেওয়া হলো যে, প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আলোচনা করবার সময় উত্তরদাতাদের নাম সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখা হবে। প্রশ্নগুলি সমস্তই মেয়েদের যৌনজীবন নিয়ে একেবারে খোলাখুলি প্রশ্ন এবং আসল জিজ্ঞাসাটা হলো : ঠিক কোন অবস্থায় কিসের আকর্ষণে, একটি মেয়ে প্রেম ছাড়া অন্য কিছুর টানে পুরুষের কাছে দেহ সমর্পণ করতে রাজী হয়।

এই সমস্যা নিয়ে এমনতরো প্রশ্নপত্র আর কোনো দেশে তৈরি করা সম্ভব হয়নি, বিলি করার ব্যবস্থা হয়নি,—আর তার চেয়ে যেটা অনেক জরুরী কথা,—অন্য সব দেশেরই জনসাধারণ রাষ্ট্রের কর্তাদের অনাত্মীয় জ্ঞান করে; শুধু সোবিয়েতের জনসাধারণ জানে যে, তাদের নিজেদের স্বার্থ ছাড়া রাষ্ট্রের আর কোনোরকম স্বার্থ থাকতেই পারে না। তাই সোবিয়েতের মেয়েরা এই প্রশ্নপত্রকে যতটা জরুরী জ্ঞান করলো আর উত্তরে যতটা খোলাখুলিভাবে জানালো নিজেদের মনের কথাটা, অতটা সহযোগিতা আর কোনো দেশের পক্ষে কল্পনা করাই অসম্ভব।

এই প্রশ্নপত্রের যে সব উত্তর পাওয়া গেল তার মধ্যে মোটামুটিভাবে বক্তব্যের তফাত খুব বেশি নেই। প্রথমত, প্রায় সব মেয়েই স্বীকার করলো, দারিদ্র্যের চাপে পড়েই, নগদ উপার্জনের আশাতেই, তারা এই জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। কথাটা অবশ্যই পুরোনো, গণিকাবৃত্তির আসল কারণটা হলো অর্থনৈতিক। তবু এখানে একটা বিষয়ের দিকে নজর রাখতে হবে। কথাটা

আসছে রাজনৈতিক কোনো নেতার মগজ থেকে নয়; তার বদলে সরাসরি গণিকাদের মুখ থেকেই। তাছাড়া, শুধু এইটুকু কথার মধ্যে আসল জবাবটা পাওয়া সম্ভব নয়। তার কারণ, দারিদ্র্য তো অনেকেরই ছিল, তাই বলে দেশের সব মেয়েই গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়নি! তাই, শুধু দারিদ্র্য দিয়ে গণিকাবৃত্তির কারণকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তাহলে? মনোবিজ্ঞানের পণ্ডিত এই প্রশ্ন দেখে হয় তো উৎসাহিত হয়ে উঠবেন, কেননা তাঁর মতে এই প্রশ্নের একটা সহজ জবাব আছে: দারিদ্র্যের চাপে পড়ে কোনো মেয়ে গণিকা হয়, কোনো মেয়ে হয় না। এই তফাতের আসল কারণ? আসল কারণটা তাহলে মেয়েদের মনের গড়নে তারতম্য। যে-মেয়ের মনে পতিতা-প্রবণতা সে-ই হয় পতিতা, সকলে নয়। তাই দারিদ্র্যকেই গণিকাবৃত্তির আসল কারণ না বলে পতিতা-প্রবণতা নামের একরকম মনের গড়নকেই কি গণিকাবৃত্তির প্রকৃত কারণ বলতে হবে না? যুক্তি হিসেবে কথাটা চমৎকার। তবু, এই কথাকে তাড়াহুড়ো করে মেনে নেবার দরকার নেই। কেননা শুরুতেই আমরা ধরে নিয়েছি যে, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক কারণের সন্ধান পাওয়া যাবে পণ্ডিত মশাই-এর মগজ থেকে নয়, বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে। বিজ্ঞানের ওপর ঝোঁক ছিল বলেই, সোবিয়েতের মনোবিজ্ঞানীরাও সরাসরি মেনে নিতে রাজী হননি যে, গণিকাবৃত্তির মূলে রয়েছে নারী-মনস্তত্ত্বের এক বিকৃতি বা অস্বাভাবিক পতিতা-প্রবণতা। ওদের প্রশ্নের উত্তরে অনেক মেয়ে অনুনয় করেছিল: আমাদের সুস্থ আর সহজভাবে জীবিকা উপার্জনের সুযোগ দাও, আমরা এই গ্লানির জীবিকা ছেড়ে যেতে একান্ত উদ্‌গ্রীব। অবশ্যই, পেশা হিসেবে গণিকাবৃত্তিকে মেনে নেবার পর, অনেক দিন ধরে একরকম অসুস্থ জীবন যাপন করবার পর, অধিকাংশ মেয়ের পক্ষে যে-রকম শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক তেমনি স্বাভাবিক মানসিক বিকার দেখা দেওয়া। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, শুরু থেকেই এরা সবাই মনোবিকারের রোগী— মনোবিকারটা গণিকাবৃত্তির কারণ নয়, ফল মাত্র। অন্তত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই কথা।

তাহলে, গণিকাবৃত্তির মূলে রয়েছে দারিদ্র্য, অর্থ নৈতিক চাপ। তবু, শুধু দারিদ্র্য নয়; সমস্ত দরিদ্র মেয়েই গণিকা হয়ে যায় না। তাই দারিদ্র্য ছাড়াও অন্য কারণ নিশ্চয়ই আছে—সে কারণকে সোজাসুজি মনোবিকার বলে মেনে নেওয়াটাও অবৈজ্ঞানিক। সোবিয়েৎ বিশেষজ্ঞরা তাই প্রশ্ন তুললেন: আসল কারণের এই অপর দিকটা—দারিদ্র্য ছাড়াও অন্য যে কারণ—তার প্রকৃত রূপ কি রকম? সংগৃহীত উত্তরগুলোর মধ্যে এই দিকটার সন্ধানও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে খুঁজে পাওয়া গেল। শোষণ। আসলে সমাজের বুকের উপর এক জঘন্য ব্যবসার বিশাল জাল ছড়ানো রয়েছে, সে-ব্যবসা হলো ছলে-বলে-কৌশলে দরিদ্র আর অসহায় মেয়েদের গণিকাবৃত্তির পথে টেনে আনবার ব্যবসা। অত্যন্ত সংঘবদ্ধ এই ব্যবসা—গুণ্ডা আর দালাল থেকে শুরু করে বাড়িওয়ালা-বাড়িওয়ালী পর্যন্ত নানান রকম ফন্দিবাজ মানুষ মিলে এই জাল বিস্তার করেছে। আর গণিকা-ব্যবসায়ে যেটা আসল লাভ সেটা মোটেই গণিকারা পায় না—তাদেরই দেহ বিক্রির টাকায় বড়লোক হয় এই সব দুর্বৃত্ত ব্যবসায়ীরা, কিন্তু তাদের নিজেদের—গণিকাদের কপালে জোটে শুধু চরম অবমাননাই নয়, দারিদ্র্য আর নিদারুণ অভাবও। তাই দরিদ্র আর অসহায় মেয়েদের এক চরম শোষণ ব্যবস্থাই গণিকাবৃত্তির আসল ভিত্তি।

তাহলে প্রতিকার? সোবিয়েতের প্রতিকার-পরিকল্পনাটা একেবারে এক অভিনব পথ গ্রহণ করলো। পৃথিবীর আর কোনো দেশে, আর কোনো যুগে এই রকম প্রতিকার ব্যবস্থা করবার কথাই ওঠে না। এই পরিকল্পনার আসলে দুটো দিক। প্রথম আর প্রধান দিক হলো সোবিয়েতের শুরু থেকেই সুস্থ ও সহজ সামাজিক মেহনতের মর্যাদায় মেয়েদের প্রতিষ্ঠা করবার যে তাগিদ ছিল সেই তাগিদকে আরো অনেক, অনেক বেশি জোরালো করে তোলা, যাতে দেশের কোনো মেয়েই কোনো দিন দারিদ্র্যের চাপে পড়ে নিজের দেহ বিকোতে বাধ্য না হয়। আর তাছাড়া, যে সব দুর্বৃত্ত ব্যবসাদার অসহায় মেয়েদের এইভাবে শোষণ করে বড়লোক হবার চেষ্টা করছে তাদের সম্বন্ধে কঠিন আর কঠোর শাস্তি-বিধান। এই ব্যস্থায় গণিকাদের সম্বন্ধে সোবিয়েতের দৃষ্টিভঙ্গি কি হলো?

সেটাই সব চেয়ে আশ্চর্য কথা; কেননা, পৃথিবীতে আর কোনো দেশে আর কখনো গণিকা-সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টায় গণিকাদের এই দৃষ্টিতে দেখবার চেষ্টাই করা হয়নি। যাদের জীবনের উপর চরম দুঃখের গ্লানি চাপিয়ে একদল বদমাশ ব্যবসাদার পৃথিবীর একটা হীনতম ব্যবসা চালিয়েছে তারাও শোষিত মানুষ ছাড়া আর কি? সবচেয়ে নির্মমভাবে শোষিত মানুষ হলো এই গণিকারা। আর সোবিয়েৎ সরকার যেহেতু শোষিত জনগণের সরকার সেইহেতু তার পক্ষে গণিকাদের স্বার্থকে—গণিকাবৃত্তির স্বার্থ নয়, সুস্থ মানুষ হয়ে উঠবার স্বার্থকে—সমাজের সামনে খুব বড় করে তুলে ধরবার চেষ্টা করাই স্বাভাবিক নয় কি? পৃথিবীর অন্যান্য দেশে, এবং বিপ্লবের আগে পর্যন্ত রুশ দেশেও গণিকা-প্রথা উচ্ছেদ করবার যে সব চেষ্টা হয়েছে সেগুলোর প্রত্যেকটির বেলায় সরকারী হামলাটা গিয়ে পড়েছে গণিকাদের উপরই সবচেয়ে বেশি। ফলে, দুর্বৃত্ত ব্যবসাদারের কাছে শোষিত হাওয়া ছাড়াও এই গণিকারাই সরকারী পাইক-পেয়াদার হাতেও শোষিত হয়েছে নানান ভাবে। কিন্তু সোবিয়েতে মোটেই তা নয়। কেননা, সোবিয়েৎ সংগ্রাম করতে চেয়েছে গণিকা-প্রথার বিরুদ্ধে, গণিকার বিরুদ্ধে নয়। এই কদর্য প্রথা থেকে গণিকাদের মুক্তি দেওয়াই সে-সংগ্রামের একটা প্রেরণা—তাই সোবিয়েৎ কর্মপন্থায় গণিকাদের বিরুদ্ধে এতটুকুও শাস্তির ব্যবস্থা নেই, শাস্তির বদলে আন্তরিক সহানুভূতি আর সাহায্যই। এর চেয়ে আরো আশ্চর্য কথা আছে। যৌন-প্রশ্নমালার উত্তরে সোবিয়েৎ দেখলো শুধুমাত্র প্রকাশ্য ও পেশাদার গণিকারাই বা কেন? তথাকথিত অনেক, ভদ্র মেয়েও জীবনে এক বা একাধিকবার মুদ্রা-মূল্যের বিনিময়ে বা সামাজিক প্রভুত্বের প্রভাবকে মানতে গিয়ে, দেহ বিকোতে বাধ্য হয়েছে। তাছাড়া শ্রেণীসমাজে যাকে ঘরের বৌ বলা হয় বাস্তবের দিক থেকে তার জীবনের গ্লানিটাও কি অনেকাংশেই গণিকা-জীবনের গ্লানির মতোই নয়? সে অবশ্যই বহু পুরুষের কাছে বহুবার মুদ্রামূল্যের বিনিময়ে দেহ বিকোতে বাধ্য হয় না; তবু তার তথাকথিত বিবাহিত জীবন গ্লানির দিক থেকে, দুঃসহ দুঃখের দিক থেকে, অবমাননার দিক থেকে, গণিকার জীবনেরই সমতুল্য। তাই খুব

ব্যাপকভাবে দেখলে দেখতে পাওয়া যায়, সোবিয়েৎ পরিকল্পনায় প্রকাশ্য গণিকা আর তথাকথিত সাধারণ মেয়েদের মুক্তি-ব্যবস্থার মধ্যে এমন কোনো জাতিগত তফাত করা হয়নি। সামাজিক মেহনতের মর্যাদা ফিরে না পেলে মেয়েদের মুক্তি নেই, সাধারণ মেয়েদেরও নয়, গণিকাদের তো নয়ই। তাই গণিকা আর অ-গণিকা নির্বিচারেই সোবিয়েৎ সমাজে মেয়েদের মুক্তি-সংগ্রাম।

এই ক'টি মূল কথা স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যাবে গণিকাপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্যে সোবিয়েৎ কর্তৃপক্ষ পরের পর কী কী ব্যবস্থা ও আইন অবলম্বন করলো সেগুলোর আলোচনা করলে।

১৯২৩ঃ 'গণিকাপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ব্যবস্থা' শুরু হলো। সেই ব্যবস্থায় মূল কথা ঃ

(ক) ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় 'শ্রমিক আত্মরক্ষা বাহিনী' যেমন করেই হোক চাকরি থেকে শ্রমিক-মেয়েকে ছাড়িয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা বন্ধ করতে বাধ্য হবে। কোনো অবস্থায় কোনো মেয়েকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করা চলবে না।

(খ) দেশে তখন দারুণ অর্থ-নৈতিক সমস্যা; তবুও অনাথা মেয়েরা সবাই কাজ পাবে কেমন করে? এই সমস্যার আংশিক সমাধান হিসেবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সমবায় কারখানা আর খামার খোলবার নির্দেশ দেওয়া হলো।

(গ) সমস্ত মেয়েই যাতে স্কুল ও ট্রেনিং সেণ্টারে যোগ দেয় সেই উদ্দেশ্যে সবাইকে প্রচুর উৎসাহ দিতে হবে; কারখানার কাজে বা অন্যান্য পেশায় যোগ দেবার বিরুদ্ধে মেয়েদের যে কুসংস্কার তার বিরুদ্ধে প্রবলভাবে লড়বে প্রতিটি ইউনিয়ন।

(ঘ) যে সব মেয়েদের নির্দিষ্ট বাসাবাড়ি নেই বা যারা গ্রাম থেকে শহরে এসেছে তাদের প্রত্যেকের থাকবার জন্যে 'বাড়ি সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ' সমবায় বাসস্থান স্থাপন করবে;

(ঙ) অনাথ-অনাথা, শিশু এবং বালিকাদের রক্ষাব্যবস্থা যথাসম্ভব ভালো করে করতেই হবে।

(চ) রতিজ রোগ ও গণিকাবৃত্তির কুফল যে কতখানি এ-সম্বন্ধে জনসাধারণকে স্পষ্টভাবে সচেতন করবার জন্যে সাধারণভাবে অজ্ঞান ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে হবে, যাতে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে এ-গুলোকে দূর করবার ইচ্ছে জনগণের মধ্যে যথেষ্ট প্রবল হয়ে ওঠে।

কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কিছুদিনের মধ্যেই এই ক'টি ব্যবস্থার সঙ্গে আর তিনটি নতুন ব্যবস্থা যুক্ত করলেন :

(১) জার আমলে গণিকাদের বিরুদ্ধে নানারকম শাস্তিমূলক আইন ও ব্যবস্থা ছিল : আইন এবং পুলিশী-কর্মপন্থা থেকে সেই সমস্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ-ভাবে মুছে ফেলতে হবে।

(২) যে সব পরজীবীরা গণিকা-ব্যবসা থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপার্জন করে থাকে, দেশে থেকে তাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলবার জন্য কঠোরতম ব্যবস্থা করতে হবে। এই সব পাষণ্ডেরা যে-রকম নির্দয়-নির্মম, তাদের উচ্ছেদ করতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষও সেই রকম নির্দয় আর নির্মম হবে।

(৩) রতিজ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্যে দেশের সমস্ত ডাক্তার এবং চিকিৎসা-ব্যবস্থাকে বিনামূল্যে সকলের কাছে সুলভ করতে হবে।

এই সব ব্যবস্থা অনুসারে দেশের পিনালকোডে ফেব্রুয়ারী ১৯২২-এ কয়েকটি ধারা যুক্ত হলো। তার মধ্যে অন্তত দুটি ধারা বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য :

১৭০ ধারা (সারমর্ম) : যে-কোনো ব্যক্তি শারীরিক বা সামাজিক প্রভাবের সাহায্যে ব্যক্তিগত লাভের জন্যে বা অন্য যে কোনো কারণে গণিকা-ব্যবস্থাকে সাহায্য করবে, সেই ব্যক্তি প্রথমবার অপরাধের জন্যে অন্তত তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

১৭১ ধারা (সারমর্ম): গণকা ব্যবসায় থেকে যে-কোনো ব্যক্তি অর্থ উপার্জন করলে তার প্রথমবারের অপরাধের জন্যে সে অন্ততঃ তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করবে এবং তার যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হবে। গণিকা যদি আসামীর তত্ত্বাবধানে থাকে বা আসামী দ্বারা নিযুক্ত থাকে তাহলে আসামী অন্তত পাঁচ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

জানুয়ারী ১৯২৪। 'গণিকাবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিক বাহিনীর কর্তব্য' নামের নতুন আইন জারি হলো। তার সরমর্ম:

(ক) প্রথম কাজ হচ্ছে দেশের গণিকালয়গুলো আবিষ্কার করা। যে-কোনো ব্যক্তি এই সব বাড়ির সঙ্গে যে-কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট—যেমন ভাড়া দেওয়া, পরিচালনা করা বা স্বত্বাধিকারী হওয়া—কিংবা যে সব দালালরা এই সব বাড়ির জন্যে খদ্দের যোগাড় করে আনে বা মেয়ে সংগ্রহ করে, তাদের যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি গ্রেফতার করতে হবে এবং ফৌজদারী আইন অনুসারে শাস্তি দিতে হবে। ওই সব বাড়ির মালিক, কর্তা, দালাল, 'মাসী' প্রভৃতি সবাইকে ক্রীতদাস ব্যবসায়ীর সামিল হিসেবে গণ্য করতে হবে। এই জাতীয় ডাকসাইটে বাড়িগুলো তল্লাশ করবার পর বিশেষ তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে সার্বজনীন আমোদ-প্রমোদের জায়গা, খাবার জায়গা প্রভৃতির উপর। প্রত্যেক ক্ষেত্রে এ-ধরনের বাড়ি বা জায়গাগুলোর আসল মালিককে খুঁজে বার করতে হবে এবং তাদের বাড়িতে কী কাণ্ড চলে এ-বিষয়ে তারা যতই ন্যাকা সাজুক না কেন কোনো মতেই তারা শাস্তি এড়াতে পারবে না। এইরকম বাড়ি বা জায়গা সংক্রান্ত সমস্ত ব্যক্তিকেই যতক্ষণ না শাস্তি দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ সেগুলোকে বন্ধ রাখতে হবে।

(খ) জনসাধারণ এবং শ্রমিক বাহিনীকে সাবধান করা হলো যে, গণিকাদের বিরুদ্ধে কোনোরকম শাস্তিমূলক কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে না।

এমন কি গণিকাবাড়ি তল্লাশ করবার পর কোনো গণিকাকে গ্রেফতার পর্যন্ত করা হবে না। যে সব দুর্বৃত্ত ব্যবসাদাররা ওদের শোষণ করছিল তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবার কাজ ছাড়া অন্য কোনো কারণে এই মেয়েদের আদালতে হাজির করা হবে না। গণিকাবাড়ি তল্লাশ করবার কাজে যারা যোগ দেবে তারা সকলেই নিজেদের সমান সামাজিক মর্যাদা দেবে গণিকাদের। তল্লাশ-কারীদের সম্বন্ধে যে-কোনো গণিকা যে-কোনো ধরনের ভাষাই ব্যবহার করুক না কেন, তল্লাশকারীরা ভদ্র ভাষা ব্যবহার করতে বাধ্য হবে এবং কখনো কোনো গণিকাকে কোনোরকম অমর্যাদাকর কথা বলবে না। এমন কি, কোনো কর্মচারী কোনো গণিকারই নাম-ঠিকানাটুকু পর্যন্ত টুকে নিতে পারবে না। এক কথায়, সব সময়েই মনে রাখতে হবে এরা—এই গণিকারা—আসলে দুর্বৃত্ত মুনাফালোভীদের দ্বারা শোষিত মানুষ।

তারপর? গণিকাগৃহ থেকে এই সব মেয়েদের উদ্ধার করবার পর? প্রধানতই দুটো সমস্যা। এক হলো, এদের সুস্থ করে তোলা—শরীর মনের দিক থেকে সুস্থ। মনে রাখতে হবে, অধিকাংশ গণিকাই শুধু যে রতিজ রোগে আক্রান্ত তাই নয়, দীর্ঘ দিন ধরে কদর্যভাবে, কদর্য আবহাওয়ায়, শোষিত হবার ফলে তাদের অনেকেরই নানারকম মানসিক বিকার দেখা দেবার সম্ভাবনা। তাই, গণিকালয় থেকে উদ্ধার করবার পর এদের সম্বন্ধে একটি প্রধান কাজ হলো চিকিৎসার কাজ—শরীর আর মন দু'দিক থেকেই চিকিৎসা। কিন্তু আর একটা কাজ আছে, সে-কাজও একটুও কম জরুরী নয়। যাতে এরা স্বাভাবিক জীবনের অধিকারী হতে পারে, অংশ গ্রহণ করতে পারে সামাজিক মেহনতে, সেই উদ্দেশ্যে এদের শিক্ষা দেওয়া—প্রধানতই কোনো না কোনো শিল্পবিদ্যা বিষয়ে শিক্ষা। সোবিয়েৎ ব্যবস্থায় এই দুটো দিকের কথা আলাদাভাবে ভাবা হয়নি—তাই এদের জন্যে যে চিকিৎসাকেন্দ্রগুলো খোলা হলো সেই চিকিৎসাকেন্দ্রগুলোই হলো

শিল্পবিষয়ের শিক্ষাকেন্দ্রও। ফলে, রোগমুক্তির জন্যে যতটা সময় যাবে সেই সময়টাতেই এই মেয়েরা এমন কোনো শিক্ষা অর্জন করতে পারবে যার বলে তারা চিকিৎসাকেন্দ্র থেকেই সোজা সামাজিক কর্মক্ষেত্রে পা বাড়াতে পারে, ধূর্ত দালালের ফাঁদে পড়ে গণিকাবৃত্তির পথে ফিরে যাবার আর সম্ভাবনা থাকবে না। এই একাধারে চিকিৎসা ও শিক্ষাকেন্দ্রগুলো সম্বন্ধে আরো কথা আছে। এখানে শুধুই যে গণিকাদের বা রতিজ রোগে আক্রান্ত মেয়েদের শিক্ষা নেবার ব্যবস্থা, মোটেই তা নয়। যে সব মেয়েরা গণিকা নয়,—যারা হলো সাধারণ ভদ্র মেয়ে—তাদেরও শিল্প-বিষয়ে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হলো এই কেন্দ্রগুলোতে। কেন্দ্রগুলো পরিচালনা করবার ভার কোনো সরকারী কর্মচারীর উপর নয়; যে মেয়েরা কাজ করছে তাদের নিজেদের সংঘের উপর। ফলে এই সব কেন্দ্রে কাজ শেখার সময় কোনো মেয়েই এতটুকু আত্মসচেতন বোধ করবে না, নিজেকে পতিতা—অতএব একঘরে, আলাদা—মনে করবার সুযোগটুকুও তাকে দেওয়া হবে না। রতিজ রোগের আলোচনা প্রসঙ্গে এই শিল্প ও চিকিৎসাকেন্দ্রগুলোর কথা আবার তোলা যাবে। আপাতত, গণিকাবৃত্তি উচ্ছেদের কথায় ফিরে আসা যাক।

গণিকাবৃত্তি শ্রেণীসমাজের একটা উৎকটতম গ্লানি। একদল বদমাশ ব্যবসাদার মুনাফার লোভে একদল দীন ও অসহায় মেয়েকে সবচেয়ে নির্মমভাবে শোষণ করবার ব্যবস্থা করেছে—এই হলো গণিকাপ্রথার মূল রহস্য। তাই, শোষিত মেয়েদের মুক্তি দিতে হবে, দুর্বৃত্ত ব্যবসাদারদের দিতে হবে কঠিনতম শাস্তি।

কিন্তু খদ্দেরদের সম্বন্ধে ব্যবস্থাটা? বিশেষ করে এই দিকটা নিয়ে আলোচনা শুরু হলো ১৯২৫ নাগাদ। খদ্দেররা অপরাধী ব্যবসাদারদের দলের লোক নয়, অন্তত প্রত্যক্ষভাবে নয়। টাকার লোভে তারা গণিকাবৃত্তি চালু রাখেনি—গণিকাবৃত্তি থেকে তারা কোনো মুনাফা পায় না। তাই, এই ব্যবসাদারদের সম্বন্ধে যে রকম কঠিন আর নির্মম শাস্তির মনোভাব সেই রকম মনোভাবের কথা খদ্দেরদের সম্বন্ধে ওঠে না। অপর পক্ষে তারা শোষিত মেয়দের মতো সহানুভূতি আর সাহায্যও দাবি করতে পারে না—

কেননা পরোক্ষভাবে তারাই এ-ব্যবসাকে সাহায্য করে থাকে। তাছাড়া সোবিয়েৎ সমাজ প্রবর্তিত হবার পরও—যৌনজীবনের উপর থেকে কৃত্রিম বন্ধন ও গ্লানি মুছে ফেলবার পরও—গণিকাগৃহে গিয়ে যৌন পরিতৃপ্তির চেষ্টাটাই নৈতিক অসাড়তার লক্ষণ। নৈতিক অসাড়তা আর সমাজ-চেতনার অভাব—সোবিয়েতের কাছে একই কথা। তাই এই খদ্দেরদের সম্বন্ধে সোবিয়েৎ পরিকল্পনা একেবারে নতুন ধরনের। জেল খাটিয়ে বা অর্থদণ্ড আদায় করে ওদের শাস্তি দেওয়া নয়, তার বদলে সমাজ-চেতনার বা নীতিবোধের ঝাকুনি দিয়ে ওদের মনের অসাড়তা ভাঙা। এবং এই উদ্দেশ্যে সোবিয়েৎ পরিকল্পনায় একটি বিশিষ্ট ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলো: গণিকাবাড়ি তল্লাশ করে যে সব খরিদ্দারদের সাক্ষাৎ বা সন্ধান পাওয়া যাবে তাদের গ্রেফতার করা নয়, তাদের উপর কোনোরকম জুলুম করাও নয়। তার বদলে শুধু তাদের নাম আর পরিচয়টুকু টুকে নেওয়া। তার পরদিন এক বিশেষ ইস্তাহারে তাদের এই নাম আর পরিচয় প্রকাশ করা। সে ইস্তাহারের মাথায় বড় হরফে লেখা: 'Buyers of the Bodies of Women', মেয়েদের শরীরের খদ্দের। গত রাত্রে যে সব বাবুরা গণিকালয়ে আবিষ্কৃত হয়েছেন তাদের নাম আর পরিচয়ের তালিকা এই সব ইস্তাহারে, আর ইস্তাহারগুলো প্রধান প্রধান সাধারণ-গৃহ এবং কারখানার বুলেটিন বোর্ডে লটকিয়ে দেবার ব্যবস্থা, যাতে অজস্র মানুষের দৃষ্টি এই সব পরিচয়ের উপর পড়ে এমন এক তীব্র সামাজিক সমালোচনার সৃষ্টি হয়, যেন খদ্দরদের নৈতিক বা সামাজিক চেতনার অসাড়তা চূরমার হয়ে যায়। বলাই বাহুল্য, এই জাতীয় ব্যবস্থার পরে—আর শুধু এইটুকুই নয়, সমাজব্যবস্থায় সুস্থ আর স্বাভাবিক পথে যৌনপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার বাধাগুলো দূর হবার ফলেও—সোবিয়েৎ পুরুষদের পক্ষে গণিকালয়ের খদ্দের হবার আকর্ষণ দ্রুতগতিতে ক্ষীণ হয়ে এল।

অনেক শতাব্দী ধরে আমাদের দেশের মতোই আমাদের পাশের দেশে—চীন দেশে—ছিল একটা একটানা স্থবির ভাব। ঘোরের মতো! দেশ যখন এই রকম ঘোরে আচ্ছন্ন তখন একের

পর এক বিদেশী দস্যু এসেছে লুটতরাজ করতে, শোষণ করতে। আমাদের দেশেও, আমাদের পাশের দেশ চীন দেশেও।

অথচ, মাত্র ক'বছরের মধ্যেই কী রকম আকাশ-পাতাল তফাত দেখা দিলো ওদের দেশে। চীন দেশে। অবশ্য রাতারাতি নয়, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে শোষণ, যে নির্যাতন, তার চিহ্ন মানুষের কপাল থেকে মুছে যেতে সময় নেবে বই কি! কিন্তু যেটা আসল কথা, মস্ত বড় কথা, সেটা হলো অবিশ্বাস্য রকম দ্রুত গতিতে ওদের দেশের মানুষের কপাল থেকে দুঃখের চিহ্ন মুছে যেতে শুরু করেছে।

কিন্তু এমনতরো আকাশ-পাতাল তফাতটা হলো কি করে? এ-প্রশ্নের জবাবটা ছোট: ওদের সামনে রয়েছে সোবিয়েতের আদর্শ, সোবিয়েতের প্রেরণা। তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে, রুশ দেশে ঠিক যেমনভাবে, যে-রকম কর্মপদ্ধতির সাহায্যে মেহনতকারী মানুষের দল শোষকের দলকে হটিয়ে দিয়ে নিজেদের মেহনতের ফল নিজেরা ভোগ করবে বলে ব্যবস্থা করেছে চীন দেশেও ঠিক সেইভাবে ঠিক সেইরকম কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করেছে মেহনতকারী মানুষের দল। তা হতেই পারে না। কেননা, চীন দেশের অবস্থা আর রুশ দেশের অবস্থা এক ছিল না। আমাদের দেশের মতোই চীন দেশও অনেকখানি পেছিয়ে পড়া দেশ ছিল। আমাদের দেশের মতোই চীন দেশেও স্বদেশী শোষকদের চেয়ে বিদেশী শোষকদের দাপট ছিল অনেক বেশি। এই সব দিক থেকে রুশ দেশের সঙ্গে অনেক তফাত। কাজেই কায়দা-কানুনেও যে তফাত থাকবে অনেকখানি তাতে অবাক বোধ করবার কিছু নেই। তবু চীন দেশ সোবিয়েৎ দেশের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছে বলে, সোবিয়েতের আদর্শটাকেই আদর্শ হিসেবে মেনে নিয়েছে বলে চীন দেশের অগ্রগতি এমন বিস্ময়কর। সোবিয়েৎ দেশের আদর্শটা ঠিক কি? এক কথায়: শোষণের পাট একেবারে তুলে দেওয়া। দেশের অসংখ্য মানুষ হাড়মাস কালি করে মেহনত করবে আর মুষ্টিমেয় একদল মানুষ ওই অসংখ্য মানুষের মেহনত লুঠ করে বড়লোক হবে, ফুর্তি লুটবে, এইরকম অবিচারকে চিরকালের মতো ধূলিসাৎ করে দেওয়া। বাকি দুনিয়ার সঙ্গে সোবিয়েতের আসল

তফাতটা এই বিষয়েই। বাকি দুনিয়ার মেহনতকারী মানুষের কাছে সোবিয়েৎ দেশ তাই শুধু ভূগোলের দিক থেকে মহান নয়, অন্যান্য দেশের মতো এক ধরনের বিদেশীদের আস্তানামাত্র নয়—মেহনতকারী মানুষ মাত্রেরই কাছে সোবিয়েৎ হলো সবচেয়ে বড় প্রেরণা আর এই দিক থেকে যেন ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়দেরই দেশ।

চীন দেশে পতাকা বদল হলো সোবিয়েৎ দেশের আদর্শে, সোবিয়েৎ দেশের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে। আর তাই চীন দেশেও মানুষের জাতকে মেরামত করবার চেষ্টা চলেছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে। আর সামাজিক মেহনতের মর্যাদায় মেয়েদের নতুন করে প্রতিষ্ঠা করবার সংকল্প নেওয়া হয়েছে।

আগেকার আমলের ছবিটা মনে আছে তো? শোনা যায় চীনের মেয়েরা ভালো করে হাঁটতেই পারতো না, কেননা কচি বয়েস থেকেই মেয়েদের পায়ে লোহার জুতো পরিয়ে দেওয়া হতো যাতে পায়ের গড়নটা বরাবর কচি থাকে! অথচ আজ সেই চীন দেশের মেয়েরাই রেলের ইঞ্জিন চালাচ্ছে, কপিকল চালাচ্ছে, রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে এগিয়ে এসেছে পুরুষদের পাশাপাশি, সমানে-সমান হয়ে। ১৯৪৯-এর অক্টোবর মাসে চীন দেশে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত জয় ঘোষিত হলো, দেশের গঠনতন্ত্রের খসড়া করবার জন্যে প্রথম যে-বৈঠক বসলো তাতে শতকরা দশজনেরও বেশি মেয়ে প্রতিনিধি! তারপর আরো কয়েকটা মাস তো কেটে গেল— ইতিমধ্যে চীন দেশের মেয়েরা দিনের পর দিন রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য রকম দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। আজকের দিনে চীন দেশে গিয়ে অতিবড় কল্পনাবিলাসীর পক্ষেও কল্পনা করা কঠিন যে, এই দেশেরই মেয়েরা এককালে ভালো করে হাঁটতে পারতো না, কেননা পুরুষদের মনোনয়নের জন্যে কচি বয়েস থেকে তাদের পায়ে লোহার জুতো পরিয়ে পা-গুলোকে চিরকালের মতো পঙ্গু করে রাখবার ব্যবস্থা চলতি ছিল।

এখন থেকে ওদের দেশের মেয়েরা আর পাঁচরকম নগদমূল্যের পণ্যের মতো একরমক পণ্যমাত্র হবে না, আর পাঁচরকম উৎপাদনের উপায়ের মতো একরকম উৎপাদনের উপায়মাত্রও নয়। ওরা ফিরে পেয়েছে সামাজিক মেহনতের মর্যাদা, তাই পুরুষের

সঙ্গে সমানে-সমান হতে পেরেছে—শুধুমাত্র গঠনতন্ত্রের হরফ দিয়ে ঘেরা গণ্ডিটুকুর মধ্যে নয়, বাস্তব জীবনেও—রাজনীতিতে, অর্থ-নীতিতে, সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে! আর, এমন যে আকাশ-পাতাল তফাত তার কারণ হলো ওদের দেশের আকাশে উড়েছে নূতন পতাকা—আগেকার পতাকার সঙ্গে শুধুমাত্র রঙ-এর তফাত নয়, প্রেরণার দিক থেকে আদর্শের দিক থেকে আকাশ পাতাল তফাত। সেইটেই আসল কথা। আসল কথা হলো, ওরা এগিয়েছে সোবিয়েতের আদর্শে এবং সোবিয়েতের মতোই মানুষের জাতকে মেরামত করতে লেগে গিয়েছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে।

তাই, আর পাঁচরকম সওদাগরের পণ্যের মতো মেয়েরা যাতে পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত না হয় সে ব্যবস্থাও হয়েছে নতুন চীনে।

নতুন চীনে উচ্ছেদ শুরু হয়েছে গণিকাপ্রথার:

এই বিষয় 'পিপলস চায়না' পত্রিকায় (প্রথম খণ্ড ষষ্ঠ সংখ্যা) একটি চমৎকার খবর বেরিয়েছে। বাস্তব ঘটনা। তবু পড়তে পড়তে অবাক লাগে, মনে হয় গল্প পড়ছি যেন। সেই খবরটির সারাংশ তর্জমা করে দিলাম।

হুঙ উ তার পতিতা-জীবনের পুরো কাহিনী এর আগে পর্যন্ত আর কাউকেই বলেনি। আসলে অনেক দিন থেকেই সে অভ্যাস করেছিল অতীতের সমস্ত চিন্তাকে মন থেকে দূর করে দিতে। কিন্তু, ঠিক কমরেড লী-র মতো আর কারুর সঙ্গে ইতিপূর্বে তার কখনো আলাপ হয়নি। কোনো মেয়েই এমন সদয় সহানুভূতি নিয়ে তার সঙ্গে ব্যবহার করেনি। তাই কমরেড লী যখন অন্তরঙ্গভাবে আর ধৈর্য ধরে বার বার প্রশ্ন করতে লাগলো তখন হুঙ উ নিজেই অবাক হয়ে দেখলো যে নিজের অতীত জীবনের সবচেয়ে লজ্জার ঘটনাগুলোকে সে অনায়াসেই কমরেড লী-কে বলে চলেছে:

"হুঙ উ (মানে লাল চুনী) নামটা আমি পেয়েছিলাম আমার পতনের পর থেকেই; তার আগে পর্যন্ত আমার আসল নাম ছিল....।

"কয়েক পুরুষ ধরেই আমাদের পরিবার চাষ করতো জমিদার তাঙ-এর জমি। আমার ঠাকুরদা ওই জমি কুপিয়েছিলেন, তাঁর যিনি ঠাকুরদা তিনিও। আমার বাবাও!

"আমার তখন বছর চোদ্দ বয়েস। অকাল বৃষ্টিতে আমাদের সমস্ত ফসল সেবার নষ্ট হয়ে গেল। পরের বছর অনাবৃষ্টি, তার উপর পঙ্গপাল। ফলে, সব ফসলই নষ্ট হলো। মাস কয়েক শুধু গাছের ছাল আর পাতা খেয়ে পেটের জ্বালা জুড়ানো গেল। তখন আমাদের ওই এলাকায় শুধু জমিদার তাঙ-এর ঘরে ছাড়া আর কোথাও খাবার মতো জিনিস নেই। তবু, তু'বছরের বকেয়া খাজনার তাগিদে জমিদার আমাদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুললো, আর শেষ পর্যন্ত শাসিয়ে বললো যে, আমাদের ঋণের অর্ধেক বাবদ আমাকে কেড়ে নেবে। নতুন করে চাষ বোনবার জন্যে বীজ বা টাকা ধার আর সে দিতে নারাজ; যতক্ষণ বাবা অন্তত পুরোনো দেনার সুদটুকু না দিতে পারছে ততক্ষণ এ-কথাই ওঠে না। বাড়িতে যা কিছু ছিল ইতিমধ্যে তার সবটুকুই বেচতে হয়েছিল। ফলে একদিন রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে গাঁ ছেড়ে অন্যত্র পালানো ছাড়া আমাদের পক্ষে আর কোনো উপায়ই রইল না।

"আমরা চললুম সায়নের দিকে। ওখানে আমাদের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছে আশ্রয় পাবার আশা ছিল। মা আর আমার, তু'জনেরই বাঁধা-পা (কাঁচা বয়েস থেকে লোহার জুতোয় পা বাঁধা) ছিল, আর পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে পথ চলবার কী দারুণ কষ্ট তা আমি আজও ভুলতে পারিনি, ভুলতে পারিনি সেই ভয়---রাত্তিরে পাহাড়ের গুহায় শুয়ে আছি আর বাইরে নেকড়ের দল চিৎকার করছে! কিন্তু প্রথম ভাঙলো বাবার স্বাস্থ্যটাই। শেষের দিকে মা আর আমাকে মিলে বাবার শরীরটা বাস্তবিকই ঘাড়ে করে বইতে হয়েছিল।

"সায়নে পৌঁছে সেই-আত্মীয়কে খুঁজে পেলুম না। ফলে স্টেশনের কাছাকাছি একটা সরাইখানায় গিয়ে উঠতে হলো। বাবা সেখানেই মারা গেলেন! একজন সরকারি পেয়াদা হুকুম করলো: তিন দিনের মধ্যে বাবার গোর দিতেই হবে। কিন্তু আমাদের তখন একটাও পয়সা নেই, কাফন কিনবো কি করে? এদিকে সরাইখানার মালিক রোজই ভাড়ার জন্যে তাগাদা লাগাচ্ছে, তার দেনা চুকোবার পয়সাই বা পাই কোথায়?

"সেদিন সন্ধ্যেবেলায় বাবার মৃতদেহের পাশে বসে মা বুকফাটা কান্না কাঁদছিল। এমন সময় সরাইখানার মালিক এসে আমাকে তার ঘরে নিয়ে গেল। প্রথমটায় আমাকে খুব ধমক-ধামক দিলো: একটা যদি কানাকড়িও মুরদ না থাকে তাহলে সরাইখানায় এসে উঠেছিস কিসের সাহসে? তারপর লোকটা হঠাৎ গলার স্বর বদলে ফেললো, বললো, আমাদের এই বিপদ থেকে সে মুক্তি দিতে চায়। আমি যদি অভিনেত্রী হতে রাজী হই তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তাই মার কাছ থেকে অনুমতি চাইতে বললো —চুক্তি সই হলেই আমাকে সে তিন আউন্স সোনা দিতে পারবে বাবার জন্যে পাতলা একটা কফিন কিনতে আউন্স খানেক সোনা লাগবে মাত্র। শুনে আমার তো রীতিমতো উৎসাহই লাগলো, মাকে গিয়ে সব বললুম। আমার কথাগুলো কানে যাবার পর কিন্তু মার গোঙানি গেল বেড়ে, অসহায়ের মতো বাবার মৃতদেহটাকে মা চাপড়াতে লাগলো আর পাগলের মতো চিৎকার করতে লাগলো: না, কক্ষনো না, কক্ষনো না—

"তিন দিনের দিনও কফিন কেনার কোনোরকম সুরাহাই হলো না। ক'দিন ধরে কাঁদতে কাঁদতে মা কী রকম আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে! সরাইখানার মালিক আমাদের ঘরে এল, আমার কাঁধের উপর একটা হাত রেখে বেশ মোলায়েম গলায় বললো: 'বাবাকে যদি সত্যিই তুমি ভালোবাসো তাহলে নিশ্চয়ই তার মৃতদেহটা ভাগাড়ে ফেলে দেওয়া হোক আর কুকুরে ছিঁড়ুক ওটাকে, এ সব ব্যাপার তুমি চাইতেই পারো না। আমি তোমায় যে কথা বলেছিলাম সেটা আর একটু ভালো করে ভেবে দেখতে পারো।'

"ভাবতে চেষ্টা করলুম। কিন্তু সে যেন অতল অন্ধকার একটা খাদের মধ্যে চেয়ে থাকা। আর তো কোনো পথ ছিল না। বিকেলের দিকে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরুলাম, মা টের পেলো না কিছু। লোকটার ঘরে গেলাম। একটা কাগজ বার করলো সে, কাগজটার উপর আমার টিপসই বসিয়ে দিলো। তিন আউন্স সোনা পেলাম। মনটা ভারী খুশি লাগছিল। তখন তো ঠিক বুঝিনি যে, ওই দামে আমি নিজেকে বিক্রি করে বসেছি!

"সস্তা কফিন কেনা হলো, ভদ্রভাবে বাবাকে কবর দেওয়া

গেল। বাকি টাকাটা মার হাতে দেবার সময় বেশ একটু গর্বই বোধ করছিলাম। মা কিন্তু টাকাগুলো মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ফুঁকিয়ে কেঁদে উঠলো আবার।

"সেদিন রাতেই সরাইখানার মালিক আমাকে তার ঘরে ডাকলো। আমি তার ঘরে ঢুকতেই লোকটা আমার টুঁটি টিপে ধরে মুখের মধ্যে তুলো গুঁজে দিল এবং তারপর ধর্ষণ করলো।

"পরের দিন সে আমাকে জোর করে আর একটা লোকের কাছে নিয়ে গেল। পরে শুনলাম এই লোকটা ক্রীতদাস কেনাবেচা করে। দু'জনের মধ্যে দরাদরি হলো। সরাইখানার মালিক সাত তোলা সোনায় আমাকে বিক্রি করে চলে গেল।

"....তারপর এই লোকটা আমাকে চেঙসাও শহরে নিয়ে এসে বিক্রি করলো একটা বেআইনী গণিকালয়ের মালিকের কাছে, দশ আউন্স সোনায়।....বছর চারেক ওইখানেই ছিলাম। তারপর আমাকে কুৎসিত রোগে ধরলো। কিছুদিন পর থেকেই খদ্দেররা আমার রোগটার কথা টের পেতে লাগলো, আর শুরু করলো পয়সা ফেরত দেবার জন্যে হল্লা। কর্তা আমায় ধমক দিয়ে বললো: ঘরে যখন বাবু আসবে তখন কোনো মতেই আলো জ্বালবি না। কিন্তু তাতে কাজ চললো না।....শেষ পর্যন্ত কর্তা আমাকে বিদেয় করাই মনস্থ করলো এবং পিকিঙ-এর আর এক গণিকালয়ের মালিকের কাছে আমায় বিক্রি করলো। গত নভেম্বর পর্যন্ত আমি ওখানেই ছিলাম; তারপর বর্তমান সরকার আমার সেই মালিককে গ্রেফতার করলো, এবং আমাকে উদ্ধার করে আনলো এখানে।

কমরেড লী এতক্ষণ একটা ফর্ম-এ নোট লিখে যাচ্ছিলেন।.... ফর্ম-এর একটা ঘরের মাথায় লেখা ছিল: গণিকাবৃত্তির কারণ। সেই জায়গায় কমরেড লী লিখলেন—দারিদ্র্য আর ফিউডাল শোষণ।

এই রকম একের পর এক জীবনের কাহিনী। পিকিং শহরে গণিকালয় তল্লাশ করে মালিকদের গ্রেফতার করবার পর মেয়েগুলিকে শিক্ষা আর চিকিৎসার কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়েছে। কমরেড লী তাদের জীবনের কাহিনী শুনে চলেছেন আর লিখে চলেছেন ফর্ম-এর উপর। গণিকাবৃত্তির কারণ—কুয়োমিঙটাঙ-এর

অত্যাচার; গণিকাবৃত্তির কারণ—ফিউডাল আবহাওয়ায় স্বামী-স্ত্রীর অসামঞ্জস্য। গণিকাবৃত্তির কারণ—বিদেশীর শোষণ! প্রায় সকলের জীবনীই হলো চরম দুঃখ, দৈন্য আর নির্যাতনের কাহিনী। (পিপ্‌ল্‌স্ চায়না পত্রিকায় চারজন মেয়ের জীবনী খুঁটিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।)

১৯৪৯-এর ২১শে নভেম্বর পিকিং শহরের গণিকালয়গুলো তল্লাশ করলেন নতুন কর্তৃপক্ষ। উদ্ধার করা গেল ১২৯০ জন মেয়েকে, গ্রেফতার করা হলো ২৩৭ জন গণিকাগৃহের মালিককে। মালিকদের সোজা জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো, পরে তাদের বিচার হবে। মেয়েদের নিয়ে যাওয়া হলো Women's Production and Education Institute-এ। এই কেন্দ্রটি তখন সবে খোলা হয়েছে। এখানে আসবার পর থেকেই মেয়েদের সময় নিয়ে রীতিমতো টানাটানি। সারাদিন ধরে রাজনৈতিক বক্তৃতা, আলোচনা সভা, হাতের কাজ শেখার ক্লাশ, লেখাপড়া শেখার ক্লাশ, এক সঙ্গে খেলাধুলো। তাছাড়া সবচেয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে এদের চিকিৎসার ব্যবস্থাও। এর জন্য কর্তৃপক্ষ আলাদা করে ১০০,০০০,০০০ মুদ্রা ব্যয় বরাদ্দ করেছেন। কমরেড লী-র মতোই 'নিখিল চায়না গণতান্ত্রিক মহিলা সংঘ'-র অনেক মেয়ে এসেছেন, এইসব মেয়েদের জীবনকে নতুন করে গড়ে তোলবার কাজে সাহায্য করতে। নিরোগ হবার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যে-রকম রাজনৈতিক চেতনা বাড়াবার ব্যবস্থা অন্য দিকে তেমনি রয়েছে সামাজিক মেহনতের ভিত্তিতে জীবিকা অর্জন করবার মতো শিক্ষা দেবারও ব্যবস্থা। কোন্ মেয়ে নার্স হবে, কোন্ মেয়ে কারখানায় কাজ করবে, তা নির্ভর করছে মেয়েটির নিজের প্রবৃত্তির উপর।

এইভাবেই আজকের চীন সোবিয়েতের কাছে প্রেরণা পেয়ে এগিয়ে চলেছে সোবিয়েতেরই পথে: ওরাও পণ করেছে মানুষের জাতকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে মেরামত করবে, ওরাও নারীদেহকে আর পাঁচরকম পণ্যের মতো একরকম পণ্য করে রাখতে রাজী নয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রতিজ রোগ

ওষুধ দিয়ে অসুখ সারানো যায়? নিশ্চয়ই যায়—ওষুধ ছাড়া অসুখ সারাবার কথাই তো ওঠে না। কিন্তু, ওষুধ-বিষুধ দিয়ে রোগের উচ্ছেদ করা যায় কি? এই প্রশ্নের জবাবটা অমন ছোট করে, অত চটপট, দিয়ে দেওয়া চলে না। কেননা, একদিকে যে রকম ওষুধ-বিষুধ ছাড়া রোগভোগের সঙ্গে লড়াই করবার প্রশ্নই ওঠে না, অপর দিকে তেমনি রোগভোগের সঙ্গে লড়াই করা চলে না শুধুমাত্র ওষুধ-বিষুধ নিয়ে। রোগের সঙ্গে লড়াই করা বলতে অবশ্যই বুঝছি দেশ থেকে রোগকে দূর করবার কথা। দেশ থেকে কোনো রোগকে দূর করবার জন্যে অবশ্য কোনো যাদুমন্ত্র আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করা যায়নি—কোনোদিন তা যাবেও না। তাই রোগের সঙ্গে লড়াই করতে গেলে দরকার ওষুধ-বিষুধ, দরকার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দল। তবু আবার এ-কথাও ঠিক যে, শুধুমাত্র ওষুধ-বিষুধের পাহাড় জমিয়ে, হাজার হাজার বিশেষজ্ঞকে নিযুক্ত করে দেশের বুক থেকে অসুখ-বিসুখকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবার উপায় নেই। এ-কথার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, রতিজ রোগকে দূর করবার জন্যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের চরম প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে মার্কিন দেশে; অপর পক্ষে, পৃথিবীর মাত্র একটি দেশেই সম্ভব হয়েছে রতিজ রোগকে সম্পূর্ণভাবে জয় করা,—সে দেশ সোবিয়েৎ ইউনিয়ন। তার কারণ এই নয় যে, সোবিয়েৎ দেশে চিকিৎসা-বিজ্ঞান বাদ দিয়ে রতিজ রোগের সঙ্গে লড়াই করবার কোনো একটা অলৌকিক অস্ত্র আবিষ্কার হয়েছে। আসলে, ওদের পক্ষে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্য যতখানি নেওয়া সম্ভব ততখানি সাহায্য নেবার ব্যাপারে ওরা কোনো রকম গাফিলতিই করেনি। তবু, যেটা আসলে অনেক বড় কথা, ওরা জানে যে, সামাজিক পরিকল্পনা বাদ দিয়ে ফলিত-বিজ্ঞানের কোনো

কলাকৌশল—তা সে যত আশ্চর্যই হোক না কেন—প্রকৃত মানব কল্যাণে নিযুক্ত হতে পারে না।

মার্কিনদের ব্যর্থতার কথা একটু খুঁটিয়ে আলোচনা করতে হবে; তারই অভিজ্ঞতায় সোবিয়েতের সাফল্যকে ঠিকমতো বুঝতে পারা যাবে। রতিজ রোগের সঙ্গে লড়াই করবার আশায় মার্কিনরা আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কত আশ্চর্য কলাকৌশল নিয়োগ করবার চেষ্টাই না করেছিল—তবু, কী রকম বিরাট ব্যর্থতায় পরিণত হলো ওদের সমস্ত চেষ্টা! তাই, বিশেষ করে মার্কিনদের কথাই তোলা দরকার। কিন্তু, প্রশ্ন নিশ্চয়ই উঠতে পারে, শুধু রতিজ রোগের কথাটাই কেন? তার কারণ, যে সমস্ত অসুখ-বিসুখ সবচেয়ে ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করে রতিজ রোগ তার মধ্যে অগ্রগণ্য। সমস্যাটা যে কতখানি ভয়াবহ তার আভাস পাওয়া যাবে যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ স্বাস্থ্য-বিভাগের সার্জেন জেনারেল ডাঃ প্যারেন ১৯৩৬-এ যে হিসেব পেশ করলেন তা থেকে: যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৬-এ তিরিশ লক্ষের উপর উপদংশ বা সিফিলিস-এর রোগী, নব্বই লক্ষের উপর প্রমেহ বা গণোরিয়ার রোগী; প্রতি বছর প্রায় ৫।৬ লক্ষ লোক উপদংশ রোগে নতুন করে আক্রান্ত হচ্ছে, প্রমেহ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এর প্রায় তিনগুণ মানুষ। উপদংশের দরুন হৃদরোগে ভুগে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, উপদংশের দরুন উন্মাদ রোগীদের জন্যে পাগলা গারদে প্রতি বছর খরচ হচ্ছে কোটি কোটি টাকা। আর যুক্তরাষ্ট্রের সার্জেন জেনারেল বললেন, অন্যান্য দিক থেকে এই দুটি যৌন অসুখের দরুন সারা দেশের বুক জুড়ে সর্বনাশের যে-তাণ্ডব চলেছে তার বর্ণনা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই বা কেন, ডাঃ প্যারেন বললেন, কানাডা বা গ্রেট ব্রিটেনের অবস্থাও এই রকমই—কিংবা, এর চেয়ে আরও খারাপই হয়তো।

সামাজিকভাবে রতিজ রোগ যে কী ভয়াবহ সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র কানাডা আর গ্রেট ব্রিটেনের কথা বলতে হলো। কেননা, ওদের দেশে এ-নিয়ে অন্তত হিসেব-পত্তোরটুকু পাওয়া যায়; আমাদের দেশ সম্বন্ধে তাও পাওয়া যায় না। তাই আমাদের দেশের কথা না তুলে মার্কিন দেশের

কথাই তুলছি—কলাকৌশলের দিক থেকে, বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে, ওদের সমকক্ষ দেশ খুবই কম; টাকার দম্ভে কেউই এদের কাছ ঘেঁষতে পারে না। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্যে রতিজ রোগকে দূর করতে ওরা চেষ্টার কসুর করেনি, পয়সা খরচ করেছে প্রচুর। কিন্তু এত সত্ত্বেও ফলটা হয়েছে সামান্য: রতিজ রোগকে দূর করা তো সম্ভবই হয়নি, বরং এ রোগের প্রকোপ গিয়েছে বেড়ে।

১৯৩৬-এ যুক্তরাষ্ট্রের সার্জেন জেনারেল ডাঃ প্যারেন ঘোষণা করলেন, ব্যাপক চিকিৎসা-ব্যবস্থা দিয়ে দেশ থেকে রতিজ রোগকে দূর করা যাবে। প্রচুর পয়সা খরচ করবার ব্যবস্থা হলো; কয়েক বছর ধরে চললো চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আধুনিকতম কলাকৌশলকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করার ধুমধাম। ১৯৪০ নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্তৃপক্ষরা একটু জাঁক করেই বললেন যে, রতিজ রোগের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে ওষুধ-বিষুধ দ্বিগুণ পরিমাণে খরচ করা হচ্ছে। আরো দু'বছর পরে, চিকিৎসা-কৌশলের আরো বেশি উন্নতি সত্ত্বেও এবং ওষুধের খরচ ঢের বেশি বাড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও, দেখা গেল দেশে রতিজ রোগের প্রকোপ বরং বেড়েই গিয়েছে। অর্থাৎ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতি এই রোগকে দূর করতে পারেনি। বরং, চিকিৎসা-বিজ্ঞান যতই আশ্চর্য থেকে আশ্চর্যতর ওষুধ আবিষ্কার করে চলেছে ওদের দেশে মানুষের মনও ততবেশি বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। সালফার ওষুধ, পেনিসিলিন—এ সব নিয়ে সাধারণ পাঠ্য প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রচারিত হয়েছে খুবই বেশি। গণোরিয়া নাকি একদিনে সারিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে, সিফিলিস নাকি সারিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে চার দিনে। শুধু তাই নয়, পল দ্য ক্রুইফ সাধারণ পাঠ্য প্রবন্ধে প্রচার করেছেন এমন আশ্চর্য ওষুধের কথা, যে ওষুধ একাধারে গর্ভ-নিয়ন্ত্রণ আর রতিজ রোগের প্রতিষেধক—দুটি উদ্দেশ্যের পক্ষেই অব্যর্থ। এমন কি, ডাক্তারি পত্রিকাতেও আলোচনা চলেছে পেনিসিলিন-লজেন্স জাতীয় ওষুধ চিবুতে চিবুতে রতিজ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে সহবাস করলে সংক্রামণের সম্ভাবনা থেকে নিস্তার পাওয়া যায় কি না। এই জাতীয় আলোচনার বৈজ্ঞানিক মূল্য—কলাকৌশলের দিক থেকে বৈজ্ঞানিক মূল্য—উড়িয়ে দেবার দরকার নেই। তবু, যে

সমাজে লাম্পট্যের ঢালাও সুযোগ বর্তমান, সেখানে এ জাতীয় আলোচনা লম্পটের কাছে বরাভয় হয়ে দাঁড়ায়। তাই সে সমাজে এর বৈজ্ঞানিক মূল্য চরম অবৈজ্ঞানিক উৎসাহে পর্যবসিত হয়।

মার্কিনদের পাশাপাশি সোবিয়েতের কথাটা ভেবে দেখুন। বিপ্লবের আগে পর্যন্ত সারা পৃথিবীর মধ্যে সিফিলিসের প্রকোপ রুশ দেশেই ছিল সবচেয়ে বেশি। বংশগত সিফিলিসের দরুন ভল্গা পাড়ের কোনো কোনো জাতির মুখের গড়নটাই একেবারে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। শ্রেণীসমাজের আরও নানান কুৎসিত গ্লানির সঙ্গে সোবিয়েৎ সমাজ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া দেনার মতো পেলো এই রতিজ রোগের গ্লানি। তার উপর বিপ্লবের ঠিক পরেই প্রেম সম্বন্ধে 'এক গেলাশ জল' মার্কা মতবাদ রতিজ রোগের প্রসারকে আরও অনেক বেশি সাহায্য করলো। সোবিয়েৎ দেশে রতিজ রোগ উচ্ছেদ করবার পরিকল্পনা দানা বাঁধলো ১৯২৬ নাগাদ। মনে রাখতে হবে, তখন ওদের সমাজে দারুণ অর্থনৈতিক সমস্যার পালা চলছে। তাই আজকের দিনে মার্কিনরা রতিজ রোগের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে যে পরিমাণ টাকা ঢালতে প্রস্তুত সোবিয়েতের পক্ষে তখন তা একেবারে অসম্ভব। আর তাছাড়া, এই রোগের চিকিৎসায় আজকের দিনে কলাকৌশলের যে রকম প্রায় অবিশ্বাস্য উন্নতি হয়েছে তখনকার দিনে তা সুদূরপরাহত ছিল। তবু সেই অর্থনৈতিক অবস্থায় যতটুকু সম্ভব সেইটুকুর সাহায্যেই, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যতটুকু আবিষ্কার হয়েছিল তারই উপর নির্ভর করে, সোবিয়েৎ দেশে শুরু হলো রতিজ রোগের বিরুদ্ধে অভিযান। ১৯২৬-এর পর মাত্র পাঁচ বছর। ১৯৩১-এ সোবিয়েতে দেখা গেল অনেক চিকিৎসাকেন্দ্রেই আর তেমন রোগী জুটছে না, অথচ রোগীরা যে হাকিম-হাতুড়ের শারণাপন্ন হয়েছে তাও নয়। আসল কারণ হলো দেশ থেকে রতিজ রোগীর সংখ্যাই কমে গিয়েছে। ১৯৩৮-এ হিসেব নিয়ে দেখা গেল লালফৌজ আর নৌবাহিনী থেকে রতিজ রোগ সম্পূর্ণভাবে দূর হয়েছে; বেসামরিক জনসাধারণের মধ্যে এ রোগ প্রায় তুচ্ছ এক চিকিৎসা-সমস্যায় পরিণত হয়েছে। রতিজ রোগের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে দেশে প্রায় দু' হাজার চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা হয়েছিল; কিছুদিন পরে রতিজ-রোগীর

অভাবে এই কেন্দ্রগুলিতে চর্মরোগ বা ওইরকম ছোটখাটো রোগের চিকিৎসা চালাবার ব্যবস্থা হলো। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দেবার সময় রোগী দেখানো দরকার। ১৯৩৯-এর খবর হচ্ছে, মস্কো মেডিকেল স্কুলে এই উদ্দেশ্যে রোগী যোগাড় করাই এক দুরূহ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে! অবশ্য, সিফিলিস রোগের একটা প্রকারকে বলা হয় টারসিয়ারী সিফিলিস। শরীরের মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে—এমন কি বিশ তিরিশ বছর ধরেও হতে পারে—এই জাতীয় সিফিলিস একেবারে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে; তারপর বহুদিন পরে, অত্যন্ত বীভৎসরূপে তার লক্ষণ প্রকাশ পায়। আজও সোবিয়েৎ দেশে সিফিলিসের যে চিকিৎসা হয় তার মধ্যে বেশির ভাগই হলো এই টারসিয়ারী সিফিলিসের চিকিৎসা।

ইংরেজ আর মার্কিন বিশেষজ্ঞের দল—সোবিয়েতের বিরুদ্ধে তাঁদের যত রকম আপত্তিই থাকুক না কেন—অন্তত এইটুকু কথা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে যে, সোবিয়েৎ সমাজ সার্থকভাবে রতিজ রোগের উচ্ছেদ করতে সমর্থ হয়েছে। এই বিষয়ে এত জন বিশেষজ্ঞের এত অজস্র উক্তি রয়েছেন এমন কি সোবিয়েৎ-বিরোধী বিশেষজ্ঞ পরিদর্শকের উক্তিও এত অজস্র যে, সেগুলোকে উদ্ধৃত করতে যাওয়া প্রায় অপ্রয়োজনীয়। ব্যাপারটা আজ বিশেষজ্ঞ পরিদর্শক মহলের প্রায় সাধারণ জ্ঞানে পরিণত হয়েছে?

তাহলে, 'মানুষের জাতকে মেরামত করবার' কথাটা সেবিয়েতের মুখে সত্যই বেমানান নয়। যে দেশে রতিজ রোগের সমস্যা অতি তুচ্ছ এক সমস্যায় পর্যবসিত সেই দেশ 'মানুষের জাতকে মেরামত করবার' বড়াই করতে পারে না কি? কিন্তু কিসের জোরে? কেমন করে? সোবিয়েৎ তো সত্যই কোনো যাদুমন্ত্র জানে না, যাদুমন্ত্র মানে না; কিংবা, যা একই কথা, ওদের জানা আছে একটিমাত্র যাদুমন্ত্র, সেই যাদুমন্ত্রের নাম হলো বিজ্ঞান। তবু বিজ্ঞান বলতে আমরা চলতিভাবে যা বুঝি ওরা তা বোঝে না। বিজ্ঞান বলতে আমরা সাধারণত কলাকৌশলের উন্নতিকে, শুধুই আবিষ্কারকে বুঝতে চাই। কিন্তু ওদের কাছে বিজ্ঞান শুধুই ল্যাবরেটারীর গণ্ডিটুকুর মধ্যে আবদ্ধ কোনো কলাকৌশল, কোনো আবিষ্কার মোটেই নয়। ওরা জানে, সমস্ত বিজ্ঞানেরই একদিকে

যে রকম কলাকৌশলের উন্নতি অপরদিকে সেই রকম সামাজিক পরিকল্পনা! সামাজিক পরিকল্পনার দিকটা বাদ দিলে তাই প্রতিটি বিজ্ঞানই অনেকাংশে অথর্ব ও পঙ্গু। কথাটাকে ঘুরিয়ে বললে বলা যায়ঃ সমস্ত বিজ্ঞানেরই চরম ভিত্তি হলো সমাজ-বিজ্ঞান।

সোবিয়েতের ওরা বিজ্ঞানের হাতিয়ার হাতে মানুষের জাতকে মেরামত করতে এগিয়েছিল; মনে রাখতে হবে বিজ্ঞানের একদিকে যে রকম কলাকৌশলের আবিষ্কার অন্য দিকে সেই রকমই সামাজিক পরিকল্পনা। রতিজ রোগের সঙ্গে লড়াই করবার সময় বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলকে ওরা একটুও তুচ্ছ করেনি। চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে পুরোমাত্রায়ই কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছে। ওরা খুলেছে অজস্র হাসপাতাল, অজস্র ক্লিনিক; চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে যতটা কাজে লাগানো সম্ভব ততটাই কাজে লাগানো হয়েছে এইসব হাসপাতাল ও ক্লিনিকে। কিন্তু যদি শুধু এইটুকুই হতো তাহলে রতিজ রোগকে দূর করা যেতো না। আসলে সোবিয়েতের সঙ্গে অন্য সব দেশের, অন্য সব যুগের, আসল তফাতটা এখানে। রতিজ রোগ ওদের কাছে শুধু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সমস্যাই নয়। অত্যন্ত মূল সামাজিক সমস্যার সঙ্গে রতিজ রোগের সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ। আর, সে মূল সামাজিক সমস্যার একটা খুব জরুরী দিক হলো সমাজে মেয়েদের স্থান।

শ্রেণীসমাজে মেহনতের মর্যাদায় মেয়েরা স্থান পায়নি; তাই যত রকম আইন-পুলিশের চেষ্টাই চলুক না কেন, শ্রেণীসমাজ মাত্রেই মেয়েরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেহ বিকোতে বাধ্য। এরই নাম গণিকাবৃত্তি। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যত আশ্চর্য আবিষ্কার নিয়েই রতিজ রোগের সঙ্গে লড়াই করবার চেষ্টা করা যাক না কেন, সমাজে যতদিন গণিকাবৃত্তি ততদিন রতিজ রোগকে উচ্ছেদ করবার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। আর মেহনতের মর্যাদা মেয়েদের ফিরিয়ে দিতে না পারলে প্রকাশ্য গণিকাবৃত্তির বিরুদ্ধে যত রকম পাইক-পেয়াদাই লাগানো যাক না কেন তাতে কোনো ফল হয় না, উচ্ছেদ করা যায় না গণিকাবৃত্তির। সমস্ত শ্রেণীসমাজের অভিজ্ঞতাই এই রকম।

সোবিয়েৎ দেশে রতিজ রোগের বিরুদ্ধে লড়াই যে এমন আশ্চর্য সাফল্য অর্জন করলো তার আসল কারণ সোবিয়েতের ওরা রতিজ

রোগের সমস্যাকে বাকি সামাজিক সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সমস্যা হিসাবে দেখতে রাজী হয়নি। তাই, রতিজ রোগের যে সব চিকিৎসাকেন্দ্র ওরা খুললো সেগুলো একাধারে চিকিৎসাকেন্দ্র আর মেয়েদের শিল্পশিক্ষাকেন্দ্র, দুই-ই। তাই, রতিজ রোগের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে গাঁয়ে গাঁয়ে যে ভ্রাম্যমান চিকিৎসক দল পাঠানো হলো সেই সব দলের প্রত্যেকটির মধ্যে অন্তত একজন সমাজকর্মী। সমাজকর্মী বলতে আমরা আমাদের সমাজে যা বুঝতে শিখেছি সোবিয়েৎ সমাজে মোটেই তা নয়। সোবিয়েতের সমাজকর্মী মেহনতকারীদের কাছে গিয়ে ধর্ম আর নীতির বুলি শোনায়নি; তার বদলে মেহনতকারীদের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করেছে, তাদের দৈনন্দিন সংগ্রামকে সফল করে তুলতে সাহায্য করেছে। তারা গ্রামে গ্রামে সভা ডেকেছে; সেই সব সভায় অত্যন্ত প্রাঞ্জল আর স্পষ্টভাবে বক্তৃতা দিয়েছে রতিজ রোগ সম্বন্ধে, গণিকাবৃত্তি সম্বন্ধে আর সাধারণভাবে যৌনজীবনের অন্যান্য সমস্যা সম্বন্ধেও।

কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে ওদের কাছে সবচেয়ে জরুরী কথা হলো, সামাজিক মেহনতের মর্যাদা নারীকে ফিরিয়ে দেওয়া। তাই চিকিৎসাকেন্দ্রগুলোর সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদির সাক্ষাৎ যোগাযোগ। তাই, ওদের দেশে একের পর এক আইন হয়েছে— মেহনতকারী মেয়েদের স্বার্থ রক্ষা করবার আইন, মাতৃত্বের দায়িত্ব ঘাড়ে নেবার জন্যে সুযোগ-সুবিধে পাবার আইন, মেয়েদের শরীর নিয়ে ব্যবসা চালাবার চেষ্টার সঙ্গে কারও যদি ক্ষীণতম যোগ থাকে তাহলে তাকে কঠোর শাস্তি দেবার আইন। এই রকম, নানান ধরনের আইন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভ্রূণ হত্যা

প্রথমেই একটা সহজ প্রশ্নের মীমাংসা করে নেওয়া যাক : কোনো একটা আইন ভালো না মন্দ এই প্রশ্নের কি এক কথায় জবাব দেওয়া যায়? যেমন ধরুন, চোরাবাজারে ওষুধ কেনা নিয়ে কোনো আইন : চোরাবাজারে ওষুধ কিনতে গেলে শাস্তি পেতে হবে। এমনতরো আইন ভালো না মন্দ? এক কথায় এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া অসম্ভব। কেননা দেশের অবস্থা যদি এমন হয় যে, চোরাবাজার ছাড়া ওষুধ কেনবার উপায় নেই, অর্থাৎ প্রকাশ্য বাজারে দরকারী ওষুধ কিনতে পাওয়া একেবারে অসম্ভব; তাহলে? তাহলেও নিশ্চয়ই এ আইনকে ভালো বলা চলবে না। কেননা তখন আইন অমান্যের শাস্তিকে এড়াতে গেলে রোগভোগ আর মৃত্যুযন্ত্রণা বরণ করতে হবে। অথচ, দেশের অবস্থা যদি অন্যরকম হয়, যদি চোরাবাজার ছাড়াও দরকার মতো সব ওষুধই পাবার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই অন্য কথা। তখন যদি কেউ বলে, 'হাতের কাছে পাওয়া গেল, আবার দু'পয়সার জন্যে কে ঘোরাঘুরি করে', কিংবা, 'নেশার জন্যে মর্ফিয়া তো চোরাবাজার ছাড়া পাওয়া যায় না', কিম্বা ঐ রকম কোনো আয়েশ-আমোদের দোহাই দিয়ে যদি কেউ চোরাবাজারের পৃষ্ঠপোষক হতে চায় তাহলে তাকে নিশ্চয়ই শাস্তি পেতে হবে।

তাহলে, একটা আইন ভালো না মন্দ, এক কথায় এই প্রশ্নের কোনো রকম জবাব দেওয়া যায় না। দেশের এক অবস্থায় একটা আইন ভালো নয় আবার অন্য অবস্থায় সে আইন ভালো। অর্থাৎ, একটা আইনের পক্ষে ভালো হওয়া, মন্দ হওয়া সমাজ বাস্তবের উপর নির্ভর করে। আর সমাজ বাস্তব বরাবর এক

রকম থাকে না, বদলে যায়। তার মানে, কোনো রকম সনাতন ভালো-মন্দের ধারণার ওপর কোনো আইনের উপযোগিতা নির্ভর করা সম্ভব নয়।

এইবার ভেবে দেখা যাক ভ্রূণহত্যার ব্যাপারে দেশের আইন ঠিক কী রকম হবে। 'ভ্রূণহত্যা বেআইনী', কিংবা 'ভ্রূণহত্যার বিরুদ্ধে কোনো রকম বাধা থাকবে না'—এই দু'রকম আইনের মধ্যে কোনো একটি আইনকে কি বিনা দ্বিধায়, সরাসরি ভালো বা মন্দ বলে ঘোষণা করা যায়? নিশ্চয়ই নয়। কেননা, আইনটা ভালো না মন্দ তা নির্ভর করছে কোনো সনাতন ধারণার উপর নয়, সামাজিক অবস্থার উপর। আর, এই সামাজিক অবস্থা সব দেশে, সব যুগে, এক রকমের নয়। তাই, ভ্রূণহত্যা সম্বন্ধে আইনটাও নির্ভর করা উচিত, পরিবর্তনশীল সামাজিক অবস্থার উপর: এক অবস্থায় ভ্রূণহত্যা সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত হতে পারে আবার অন্য একটা অবস্থায় হতে পারে নেহাতই বেআইনী।

কথাটায় অনেকেরই খটকা লাগতে পারে, বিশেষ করে এই কথা ভেবে যে, সমাজের এমন কোনো অবস্থা সম্ভবপর যখন কিনা ভ্রূণহত্যার মতো কদর্য ব্যাপারকেও বেমালুম আইনসঙ্গত বলে মেনে নেওয়া যায়? এখানে বিশেষ করে কয়েকটা প্রশ্ন নিয়ে একটু মাথা ঘামালেই কিন্তু এই খটকা সম্বন্ধেও খটকা জাগবার কথা।

(ক) সাধারণভাবে দেশের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থাটা কি রকম?

(খ) বিশেষ করে দেশের মেয়েদের অর্থনৈতিক মুক্তি কতখানি?

(গ) নবজাতককে সুস্থভাবে মানুষ করবার সুযোগ আছে কি?

(ঘ) শিশুর জামা-কাপড়, খাওয়া-দাওয়া, চিকিৎসা, লেখাপড়া শেখানো ইত্যাদির কতখানি দায়িত্ব সমাজের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব?

(ঙ) দেশের জনসাধারণ গর্ভনিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা সম্বন্ধে কতখানি সচেতন হতে পেরেছে?

(চ) ভ্রূণহত্যাকে বেআইনী ঘোষণা করলে ভাবী

মার পক্ষে গোপনে হাতুড়ে ধাপ্পাবাজদের শরণাপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা কতখানি ?

এই রকম অনেক প্রশ্ন। আপাতত এই ক'টি প্রশ্নের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা যাক।

সাধারণভাবে দেশের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থাটা যদি যথেষ্ট ভালো না হয়—যদি এমন হয় যে, সংসারে শুধু স্বামী-স্ত্রীর পক্ষেই খেয়ে-পরে বাঁচাটা কষ্টকর তবুও তার উপর বছরে বছরে স্ত্রীর সন্তান সম্ভাবনা হচ্ছে, তাহলে ? তাহলে কিন্তু বছরে বছরে ছেলেপুলে হতে দেওয়াটা খুব বাঞ্ছনীয় নয়। তারপর ধরা যাক, মেয়েদের কথা। পুরো অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ' হালকা কাজ করতে পারলেই মেয়েদের পক্ষে ভালো ; অন্তত প্রসবের ঠিক আগে পরে মিলিয়ে মাস আড়াই-তিন উপযুক্ত বিশ্রাম পাওয়া একান্ত দরকার। ভাবী মার পক্ষে দরকার পুষ্টিকর খাদ্য, দরকার নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ। প্রসবের সময় দরকার ভালো হাসপাতাল, ভালো ব্যবস্থা। এই রকম আরও অনেক। কিন্তু এই সব দরকারকে মেটাতে হলে দেশের মেয়েদের অর্থনৈতিক মুক্তিও দরকার নয় কি ? দেশের অবস্থা যদি এমন হয় যে, ছেলে হবার আগে আর পরে মেয়েদের কপালে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি থেকে রেহাই নেই, যদি অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তাদের পক্ষে ফল, দুধ, ডিম, মাখন খাবার কথাটা হাস্যকর অতিরিক্ততা ছাড়া আর কিছুই না হয়, যদি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দর্শনী যোগানোর সাধ্য থাকে দেশের শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় লোকের, যদি হাসপাতাল যথেষ্ট সংখ্যায় না থাকে, না থাকে হাসপাতালে ঢোকবার সুযোগ ? এই রকম আরও অনেক প্রশ্নই তোলা যায় নিশ্চয়ই। কিন্তু কথা হলো, দেশের অবস্থা এই রকম হলে মেয়েদের গর্ভস্থ সন্তানকে প্রসব করতে বাধ্য করাটা খুব কিছু বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। তারপর, নবজাতকের কথাটাও ভেবে দেখা দরকার। যে শিশু পৃথিবীতে আসবে তাকে উপযুক্ত খাদ্য-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্য দেবার মতো সঙ্গতি সমাজের যতদিন না আসে ততদিন নিশ্চয়ই পৃথিবীতে আসতে তাকে বাধ্য করা সুবুদ্ধির কথা নয়।

এতো সব আলোচনার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই একটা আপত্তি উঠবে। যদি এমন হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর আর্থিক সঙ্গতি কম, স্ত্রীর পক্ষে অর্থনৈতিক মুক্তি নেই, নেই শিশুকে সুস্থ ও শিক্ষিত করে তোলবার পর্যাপ্ত সম্ভাবনা, তাহলে গর্ভসঞ্চারই বা হওয়া কেন? সঙ্গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য না রেখে গর্ভধারণ করা এবং তারপর সমাজের কাছে দাবি করা 'ভ্রূণহত্যাকে আইন সঙ্গত করো'—এই বা কেমনতরো আবদার? প্রশ্নটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কিন্তু জবাবটা কি হবে? শিশু যদি অবাঞ্ছনীয় হয় তাহলে মাতৃগর্ভে তাকে আসতে দেওয়াটাই মূর্খতা। ঠিক কথা। কিন্তু সে মূর্খতা এড়াবার জন্যে কী ব্যবস্থা করা যায়? এক হতে পারে ব্রহ্মচর্যের ব্যবস্থা, আর এক হতে পারে গর্ভনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা। ব্রহ্মচর্যের ব্যবস্থাটা উদ্ভট ; কেননা প্রথমত অসম্ভব আর দ্বিতীয়ত অবৈজ্ঞানিক। অসম্ভব, কারণ নরনারীর যৌন প্রবৃত্তি একটি মূল ও প্রাথমিক প্রবৃত্তি—দারিদ্র্যের হুমকি সেই প্রবৃত্তিকে বেমালুম উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আর অবৈজ্ঞানিক, কেননা সুস্থ নরনারী যদি জোর করে জীবন থেকে যৌন প্রবৃত্তিকে দূর করতে চায়, তাহলে অন্তত মানসিক স্বাস্থ্য ভঙ্গ হবার সুনিশ্চিত সম্ভাবনা। তাহলে, বাকি রইল আর একটা পথ—গর্ভনিয়ন্ত্রণের পথ। বৈজ্ঞানিক পথ, সন্দেহ নেই। সন্তান জন্ম যেখানে অবাঞ্ছনীয় সেখানেই গর্ভনিয়ন্ত্রণই একমাত্র বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা। তাই ভ্রূণহত্যা বেআইনী বলে নির্ধারিত হবে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে পাল্টা প্রশ্ন তুলতে হয়েছে: গর্ভনিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে দেশের জনগণ কতটা সচেতন? যদি একেবারেই সচেতন না হয়, আর তার উপর দেশের সাধারণ আর্থিক অবস্থা যদি ভালো না হয়, যদি মেয়েদের অর্থনৈতিক মুক্তি সমাজে না থাকে, না থাকে শিশুপালনের উপযুক্ত ব্যবস্থা, তাহলেও ভ্রূণহত্যাকে সরাসরি বেআইনী ঘোষণা করাটা হবে সমাজকে একটা গ্লানি থেকে বাঁচাতে গিয়ে অন্য একটার মুখোমুখী করা।

অর্থাৎ ভ্রূণহত্যাকে বেআইনী করা সম্ভব কয়েকটি মূল বাস্তব সর্ত পূর্ণ হলে পর। তার মধ্যে প্রধান সর্ত: (ক) জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি, (খ) মেয়েদের অর্থনৈতিক মুক্তি, যাতে মাতৃত্বের দায়িত্ব নেবার আগে মাতৃত্বের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়

সুযোগ-সুবিধে পাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়, (গ) শিশু-পালনের জন্যে পর্যাপ্ত সুযোগ, (ঘ) জনসাধারণের মধ্যে গর্ভনিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রচার।

তাছাড়া, আর একটা খুব জরুরী কথা আছে। ভ্রূণহত্যাকে বেআইনী বলে ঘোষণা করলেই কি ভ্রূণহত্যা বন্ধ হয়? পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই তো ভ্রূণহত্যা বেআইনী। অথচ, এই আইনের শাসনে ভ্রূণহত্যা সত্যিই বন্ধ হয়নি কোনো দেশে। আইনের দরুন ফলটা বরং উল্টোই হয়েছে, ভ্রূণহত্যার সঙ্গে সঙ্গে নারী হত্যাও। আর, এই রকমটা না হয়েও উপায় নেই। ভ্রূণহত্যা যেখানে বেআইনী, অর্থাৎ প্রকাশ্যভাবে সম্ভব নয়, সেখানে ভ্রূণহত্যার ব্যবস্থা হয় লুকিয়ে। ফলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য পাওয়া অসম্ভব, শরণ নিতে হয় হাতুড়ে আর ধাপ্পাবাজদের। বিশেষজ্ঞ অস্ত্রোপচারকের হাতে, উপযুক্ত ব্যবস্থার মধ্যে, গর্ভপাত বিশেষ বিপজ্জনক নয়; কিন্তু হাতুড়ে ধাপ্পাবাজদের হাতে অনুপযুক্ত ব্যবস্থার মধ্যে গর্ভপাতের মতো বিপজ্জনক ব্যাপার খুব কমই আছে। এতে মেয়েটির মৃত্যু-সম্ভাবনা প্রচুর; তাছাড়া চিররুগ্ন ও চিরপঙ্গু হয়ে পড়বার সম্ভাবনা তো খুবই।

আমাদের দেশে ভ্রূণহত্যার সমস্যা যে ঠিক কী রকম ভয়ঙ্কর তার সঠিক হিসেব পাওয়া যায় না। তবু, আমাদের দেশের ব্যাপারটা আন্দাজ করা সম্ভব হবে একটি কথা মনে রাখলে: ইংরেজ, জার্মান, মার্কিনদের চেয়ে আমাদের দেশ অনেক পেছিয়ে পড়ে আছে; ওই সব দেশের তুলনায় আমাদের দেশে দারিদ্র্য, কুসংস্কার, অশিক্ষা ইত্যাদি অনেক বেশি। তাই আমাদের দেশে ভ্রূণহত্যার বীভৎসতাও এই সব দেশের চেয়ে অনেক বেশি। কেউ যদি তর্ক তুলে বলেন: আমাদের দেশে ধর্মভাব ও নীতিবোধ এমনই মজ্জাগত যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার এই সব বিষময় ফল আমাদের দেশে প্রবেশ করেনি,—তাকে সরাসরি ভাববিলাসী বলেই উপেক্ষা করা ভালো। এই সব পাশ্চাত্য দেশের চেয়ে আমাদেব দেশে ভ্রূণহত্যার তাগিদ যে ঢের বেশি তার একটি মস্ত বড় কারণ হলো এ দেশের বৈধব্য প্রথা। স্বামী মারা যাবার পর স্ত্রীর সমস্ত মানবিক প্রবৃত্তিও মৃত স্বামীর পিছু পিছু

স্বর্গ বা নরকে সত্যিই তো যায় না। তাছাড়া নানান রকম মানুষের লাম্পট্যচক্রান্ত তো আছেই। এ দেশে বিধবা মেয়েদের গর্ভসঞ্চার হলে তাদের সামনে মাত্র দুটি পথ খোলা থাকে—এক হলো গোপন গর্ভপাতের পথ আর এক প্রকাশ্যে গণিকাবৃত্তির পথ। ব্যাপারটা যত বীভৎসই হোক না কেন, এই হলো বাস্তব পরিস্থিতি। ফলে ধর্মভাব আর নীতিবোধ আমাদের দেশে ভ্রূণহত্যার সমস্যাকে ইংরেজ অথবা মার্কিন দেশের চেয়ে অনেক বীভৎসই করেছে। এই কথাটা মনে রেখে ইংরেজ, জার্মান আর মার্কিনদের হিসেব থেকে কিছু কিছু নমুনা পরীক্ষা করা যাক।

মার্কিনদের হিসেব। ১৯৪১ সাল: যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর ৬৮০,০০০ ভ্রূণহত্যা হয়—গড়পড়তায় প্রতি মিনিটে একটি করে ভ্রূণহত্যা। মার্কিন দেশের হাতুড়েরা অবশ্য আমাদের দেশের হাতুড়েদের তুলনায় সত্যিই অনেক দক্ষ; তারা আধুনিক ওষুধপত্তোর ব্যবহারও অনেক বেশি জানে। তবু ওদের দেশে প্রতি বছর প্রায় ৮০০০ মেয়ে মারা যায় এই সব হাতুড়েদের হাতে—তার মানে গড়পড়তায় দৈনিক ২২ জন করে মেয়ে, প্রতি ঘণ্টায় প্রায় একজন। এ ছাড়া কত মেয়ে যে হাতুড়ের হাতে গর্ভপাত করাতে গিয়ে চিরজীবনের মতো পঙ্গু ও রুগ্ন হয়ে যায় তার হিসেব পাওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেকার জার্মানির হিসেব: প্রতি বছর অন্তত ১০০০০ করে মেয়ে হাতুড়ের হাতে গর্ভপাত করাতে গিয়ে মারা যায়, তার অন্তত দশ-বিশগুণ মেয়ে চিরজীবনের মতো রুগ্ন আর পঙ্গু হয়ে পড়ে। জার্মানির ভৌগোলিক আয়তন কতটুকু? কতই বা ওদের জনসংখ্যা? তার পাশে রুশ দেশের কথা একবার ভাবুন। কী বিরাট দেশ, কী বিরাট জনসংখ্যা! আর তাছাড়া, বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলের দিক থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মুখে জার্মানি আর ১৯১৭ সাল পর্যন্ত রুশিয়া—জার আমলের রুশিয়া—এ-দু'-এর মধ্যে সত্যিই কি কোনো তুলনা হতে পারে? তবু জার্মানিরই যখন ওই অবস্থা তখন জার আমলের রুশিয়ার অবস্থা যে কি রকম ছিলো তা কল্পনা করা যায় না!

১৯১৭ সালের বিপ্লব—সোবিয়েৎ সমাজের শুরু। কিন্তু সোবিয়েৎ সমাজ তো কোনো আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ নয় যে,

গড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের সব কিছু গ্লানি সব রকম দুঃখ উড়ে যাবে। আসলে সোবিয়েৎ যখন রাষ্ট্রশক্তি পেলো তখন দেশে দারুণ অর্থনৈতিক সংকট, তার উপর জার আমলের সমস্ত রকম নৈতিক বীভৎসতাও সমাজে শিকড় গেড়ে রয়েছে। সোবিয়েতের সামনে একেবারে পাহাড়ের মতো বাধাবিঘ্নের স্তূপ। এই স্তূপকে ঠেলে সরাতে হবে, তবেই মানুষের জাতকে সত্যিকারের মেরামত করা সম্ভব।

এই অবস্থায় প্রশ্ন উঠলো গর্ভপাত সম্বন্ধে। গর্ভপাতকে কি বেআইনী বলা হবে না আইনসঙ্গত বলা হবে? এই প্রশ্ন নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে দারুণ তর্ক; দু'বছরের উপর চললো তর্ক। তারপর, ১৯২০-এর নভেম্বর মাসে জনসাধারণের ইচ্ছে অনুসারেই আইন হলো: গর্ভপাত বেআইনী হবে না। আইনটা অবশ্য শুধু এইটুকুই নয়—এর সঙ্গে আরো অনেক কথা যোগ করা হয়েছিল। সেই কথাগুলোর কথা একটু পরেই তুলবো। আপাতত, সবচেয়ে জরুরী কথা হলো, ১৯২০-এর নভেম্বর মাসে সোবিয়েৎ সরকার গর্ভপাতকে—ভ্রূণহত্যাকে—আইনসঙ্গত বলে স্বীকার করেছিল। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত আর কোথাও এমনতরো আইনের কথা শোনা যায়নি। আর বিশেষ করে এই আইনটা নিয়েই সোবিয়েতের বিরুদ্ধে নানান প্রচারকদের হাজার রকম প্রচার: সোবিয়েৎ নাকি সাধ করে দেশের বুকে দুর্নীতির বন্যা বইয়েছে, ভ্রূণহত্যাও ওদের দেশে বেআইনী নয়!

আইনটা নিয়ে ভালো করে ভেবে দেখা দরকার, জানা দরকার এর বাস্তব ফলাফল কী দাঁড়ালো।

কেন এই আইন? এ-প্রশ্নের উত্তরটা খুবই ছোট। আসলে, যে সামাজিক প্রাচুর্যের মধ্যে ভ্রূণহত্যাকে বেআইনী বলা সঙ্গত তা ১৯২০-এর সোবিয়েৎ সমাজে ছিল না। ভ্রূণহত্যাকে বেআইনী করবার কয়েকটি বাস্তব সর্ত আছে। যতদিন না সর্তগুলোকে বাস্তবে সফল করা যায় ততদিন শুধু কাগজে-কলমে অন্যান্য দেশের মতো ভ্রূণহত্যাকে বেআইনী করে শুধু যে লাভই নেই তাই নয়, লোকসান প্রচুর। কেননা, এই অবস্থায় সাধারণ লোক লুকিয়ে-চুরিয়ে হাতুড়ে ধাপ্পাবাজদের শরণাপন্ন হতে বাধ্য

হবেই। ফলে ভ্রূণহত্যার সঙ্গে প্রশ্রয় পাবে নারীহত্যাও, অন্যান্য সমস্ত দেশে যা হয়ে থাকে তাই।

একদিকে, ভ্রূণহত্যার তাগিদ যাতে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে বন্ধ হয় তার জন্যে সোবিয়েৎ সরকারের শ্রান্তিহীন প্রচেষ্টা—বস্তুত, ওরা স্পষ্টভাবেই জানতো যে, সোবিয়েৎ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ সফল হওয়া মানেই সমাজের বুক থেকে ভ্রূণহত্যার তাগিদ স্বাভাবিক-ভাবে শেষ হওয়া। অপরদিকে, যতদিন তা সত্যিই সম্ভব না হচ্ছে ততদিন পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ভ্রূণহত্যার অঙ্গ হিসেবে যে নারীহত্যার ছড়াছড়ি অন্তত তা যেন বন্ধ হয়। ১৯২০ সালে সোবিয়েৎ ভ্রূণহত্যা সম্বন্ধে যে আইন জারি করলো সেই আইনের সবটুকুর উপর চোখ বুলালেই এই উদ্দেশ্যের কথা স্পষ্ট হয়ে আসবে! আইনের সারাংশ :

"শুধুমাত্র হাসপাতালে লাইসেন্সপ্রাপ্ত অস্ত্রোপচারকরা গর্ভপাত করতে পারবেন। নেহাত কয়েকটি বিশিষ্ট অবস্থা ছাড়া সাধারণত অস্ত্রোপচারের সাহায্যেই গর্ভপাত ঘটাতে হবে, ওষুধপাতির সাহায্য নেওয়া চলবে না। অস্ত্রোপচারের পর মেয়েটিকে পুরো তিন দিন হাসপাতালে শুয়ে থাকতে হবে, দু' সপ্তাহের মধ্যে সে কাজে যোগ দিতে পারবে না। প্রথম গর্ভ সঞ্চারের বেলায় এই অস্ত্রোপচার করা চলবে না, অবশ্য যদি মেয়েটির স্বাস্থ্যের জন্যে গর্ভপাত একান্তই দরকার হয় তাহলে অন্য কথা। গর্ভাবস্থার প্রথম তিনমাস উত্তীর্ণ হবার পর গর্ভপাত করা চলবে না। যে হাসপাতালে স্বতন্ত্র প্রসব-বিভাগ আছে শুধু সেই হাসপাতালেই এ-জাতীয় অস্ত্রোপচার করা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য মেয়েটির বেলায় যদি সামাজিক, শারীরিক ও অর্থনৈতিক কারণে গর্ভপাত একান্তই প্রয়োজনীয় না হয় তাহলে চেষ্টা করে তাকে বোঝাতে হবে যে, গর্ভপাত না করানোই ভালো। তবে সে যদি স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে না বোঝে তাহলে উপরোক্ত সর্তগুলো মেনে তার গর্ভপাত করতে রাজী হতে হবে।"

এই হলো ১৯২৪-এর সোবিয়েৎ-আইনের মূল কথা। ডাক্তারের পক্ষে ভাবী মাকে যত খুশি বোঝাবার অধিকার রইল, মেয়েটি যদি অমূলক কোনো ভয়ের বা দুশ্চিন্তার দরুন সন্তান প্রসব করতে স্বীকৃত না হয় তাহলে ডাক্তার এই ভয় ভাঙাবার আশায়

তাকে যত খুশি বোঝাবার চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু মেয়েটি যদি কিছুতেই বুঝতে রাজী না হয় এবং আইনের সর্তগুলো যদি লঙ্ঘন করবার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে ডাক্তার গর্ভপাত করতে বাধ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গর্ভপাতের জন্যে কোনো খরচ মেয়েটির কাছ থেকে আদায় করবার প্রশ্ন ওঠে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, অর্থাৎ মেয়েটি যদি নিজে কোনো কাজ করে বা তার স্বামী যদি কাজকর্ম করে। সোবিয়েৎ সমাজে প্রায় সব মেয়েই এই রকম। তাই, গর্ভপাত-এর দরুন খরচার কথাটা নেহাতই নগণ্য সংখ্যক মেয়েদের বেলায় উঠবার কথা।

কিন্তু এই আইনেই ঘোষণা করা হলো যে, উপযুক্ত অস্ত্রোপচারক ছাড়া বা উপযুক্ত হাসপাতালের ব্যবস্থা ছাড়া কেউ যদি কোনো রকমে গর্ভপাত করবার চেষ্টা করে তাহলে তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। তাছাড়া, মেয়েরা হাতুড়েদের কাছে যাবেই বা কেন? বিনে পয়সায় ভালো হাসপাতালে ভালো ডাক্তার দিয়ে যদি গর্ভপাত করাতে কোনো সামাজিক বাধা না থাকে তাহলে হাতুড়েদের শরণাপন্ন হয়ে টাকা নষ্ট করা আর জীবনকে সংকটাপন্ন করার উৎসাহ কার হতে পারে?

এই ঘটনাকে কাজে পরিণত করবার জন্যে দেশে বাস্তব ব্যবস্থা কী রকম হলো তাও ভেবে দেখা দরকার। গর্ভসঞ্চারের পর মেয়েটি যদি সন্তান প্রসব করতে অনিচ্ছুক হয় তাহলে সে তার এলাকার হাসপাতালে গিয়ে নার্সের কাছে নিজের নাম-ধাম আর অন্যান্য দরকারী খবর জানিয়ে আসবে। নার্স সব কথা লিখে নেবে আর মেয়েটিরই সুবিধে অনুসারে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্যে একটা দিন ফেলবে। ইতিমধ্যে হাসপাতাল থেকে আর একজন নার্সকে সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নার্স মেয়েটির সঙ্গে ঘরোয়াভাবে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবে আর সেই সঙ্গে ভালো করে দেখে আসবে মেয়েটির অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা। তারপর নার্স ফিরে এসে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো একটি কাগজে (ফর্ম-এ) লিখে ফেলবে; কাগজটি যাবে ডাক্তারের কাছে। ফলে, পরামর্শ করবার জন্যে যে দিনটা স্থির হয়েছে সেই দিনের আগেই মেয়েটি সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য

বিষয়ই ডাক্তারের হাতে পৌঁছবে এবং ডাক্তার প্রস্তুত হয়ে থাকবেন মেয়েটিকে বোঝাবার জন্যে। তারপর মেয়েটির সঙ্গে ডাক্তারের দেখা হবে। দরকারী সবরকম পরীক্ষার পর ডাক্তারের সঙ্গে মেয়েটির আলোচনা। অবশ্যই, ডাক্তার যদি বোঝেন যে, শারীরিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক কারণে মেয়েটির পক্ষে গর্ভপাতই শ্রেয়ঃ, তাহলে নিশ্চয়ই ডাক্তার কোনো রকম তর্ক করবার চেষ্টা করবেন না। কিন্তু ডাক্তার যদি বোঝেন যে, মেয়েটির অমূলক উৎকণ্ঠার দরুন গর্ভপাত করাতে চাইছে তাহলে ডাক্তারের দায়িত্ব হবে মেয়েটিকে যথাসম্ভব বোঝানো। অন্তত, গর্ভপাতের শারীরিক ফলাফল সম্বন্ধে ডাক্তার সমস্ত কথা মেয়েটিকে খুঁটিয়ে বোঝাতে বাধ্য। তবুও মেয়েটি যদি গর্ভপাত করাতে চায় তাহলে সরকারি হাসপাতালে উপযুক্ত ব্যবস্থায় গর্ভপাতই করবার ব্যবস্থা হবে।

এই সঙ্গে আরো একটা কথা আছে, ভালো করে ভেবে দেখবার কথা। যে মেয়েকে কোনোমতেই বোঝানো গেল না, ডাক্তার যার বেলায় অগত্যা গর্ভপাত করাতে বাধ্য হলেন, অস্ত্রোপচারের পর তাকে পুরো তিনদিন হাসপাতালে থাকতে হবে; ছেড়ে দেবার সময় ডাক্তার তাকে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়ে বলবেন, স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে গিয়ে গর্ভনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা সংগ্রহ করতে যাতে এই রকম অবাঞ্ছনীয় গর্ভসঞ্চার আর না হয় এবং ভুগতে না হয় তার চেয়েও অবাঞ্ছনীয় গর্ভপাতের গ্লানি।

১৯২০ সালের এই আইন আর বাস্তব ব্যবস্থার ফলাফলটা কী রকম হলো? প্রথমত, ওরা হিসেব করে দেখলো যে, যে-সমস্ত মেয়ে অমূলক উৎকণ্ঠার দরুন গর্ভপাত করাতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে তাদের সঙ্গে বিষয়টা পরিষ্কারভাবে আলোচনা করার পর তাদের মধ্যে অন্তত অর্ধেক মেয়ের মন থেকে অমূলক আশঙ্কা দূর হয়। তারা আর ভ্রূণহত্যায় রাজী হয় না, আশ্বস্ত হয়ে ফিরে যায় সন্তানকে জন্ম দেবার আশাতেই। ভ্রূণহত্যা বেআইনী থাকলে, মেয়েরা এ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে সহজ আর স্বাভাবিক আলোচনা করবার সুযোগ না পেলে, অন্ধের মতো তারা হাতুড়ে ধাপ্পাবাজদের হাতে পড়তে বাধ্য, আর এই রকম হাতুড়েরা

নিজেদের পেশার খাতিরে কখনোই মেয়েদের ভ্রূণহত্যার ব্যাপারে নিরস্ত হবার উপদেশ দিতে পারে না।

ভ্রূণহত্যার অঙ্গ হিসেবে নারী হত্যা? ও ব্যাপারটা সোবিয়েৎ দেশ থেকে প্রায় উঠে গেল বললেই চলে। তার প্রথম কারণ হলো, কঠিনতম শাস্তির ভয়ে হাতুড়েদের দুঃসাহস সত্যিই বন্ধ হলো। 'বেআইনী' ভ্রূণহত্যা সোবিয়েতে বন্ধ হলো। আর দ্বিতীয় কারণ, উপযুক্ত হাসপাতালে দক্ষ অস্ত্রোপচারক যদি অস্ত্রোপচার করে গর্ভপাত ঘটান তাহলে মেয়েদের মৃত্যুর আশঙ্কা সত্যিই নগণ্য হয়ে দাঁড়ায়—আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অন্তত এইটুকু উন্নতি তো হয়েছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এই উন্নতি সোবিয়েৎ পরিকল্পনায় ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হলো—আর এ-বিষয়ে সোবিয়েৎ হাসপাতালগুলো থেকে যে সব হিসেব-পত্র সংগ্রহ হলো সেইগুলোতে অস্ত্রোপচারের যতটা সাফল্য প্রতিফলিত হয়েছে তা প্রায় অবিশ্বাস্য। নমুনা: ১৯২৫ সালে মস্কো হাসপাতালে ১১,০০০ গর্ভপাতের মধ্যে একটি মেয়েরও মৃত্যু ঘটেনি; সারাটভ্-এ ২৩৬৬ গর্ভপাতের মধ্যে একটির ফলাফলও মারাত্মক হয়নি। মনে রাখতে হবে, এর প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক মেয়ে গর্ভপাত করবার আবেদন করেছিল—অর্থাৎ, সোবিয়েৎ পরিকল্পনা না থাকলে ১৯২৫-এ শুধু মস্কো শহরে ২২০০০ মেয়ের জীবন সংকটাপন্ন হতো, এবং সারাটভ্-এ হতো ৪৭৩২ মেয়ের।

তাহলে ১৯২০-এর আইনের বাস্তব ফলাফলটা কি রকম? সোবিয়েতে গর্ভপাত আইন সঙ্গত হবার ফলে অন্যান্য দেশের তুলনায় গর্ভপাত শতকরা ৫০ ভাগ কমলো আর অন্যান্য দেশে—যেখানে যেখানে গর্ভপাত বেআইনী,—ভ্রূণহত্যার অঙ্গ হিসেবে যে ব্যাপক নারীহত্যার আয়োজন, সোবিয়েৎ দেশ থেকে তা দূর হলো।

১৯২০ সালে গর্ভপাতকে আইন সঙ্গত করে সোবিয়েৎ কর্তৃপক্ষ ভ্রূণহত্যার বীভৎসতাকে দূর করলো। তবু, সোবিয়েতের লোকেরা খুব স্পষ্টভাবেই জানতো যে, ভ্রূণহত্যার বীভৎসতা সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করতে হলে সমাজে কয়েকটি বাস্তব সর্ত পূর্ণ হওয়া একান্তই

দরকার। অল্প কথায়, সেই বাস্তব সর্ত হলো সাধারণভাবে জনগণের অর্থনৈতিক উন্নতি আর বিশেষ করে মেয়েরা যাতে মাতৃত্বের জন্যে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধেগুলো পায় তার বন্দোবস্ত। মানুষের জাতকে মেরামত করবার চেষ্টায় সোবিয়েৎ এই দুটি দিকে নজর দিয়েছিল। ফলে ১৯৩৮ নাগাদ সমাজে উপরোক্ত বাস্তব সর্ত দুটি সত্যিই পূরণ হলো। এই বাস্তব সর্ত পূরণ হবার পর ভ্রূণহত্যাকে আর আইনসঙ্গত করে রাখবার কোনো অর্থই হয় না। ফলে ১৯৩৯-এ পুরোনো আইনকে সংশোধন করে সোবিয়েৎ দেশে নতুন আইন হলো: নেহাত স্বাস্থ্য ভঙ্গের ভয় ছাড়া ভ্রূণহত্যা হবে বেআইনী। ১৯৪৪ নাগাদ দেখা গেল উপরোক্ত দুটি সর্ত সমাজে আরো অনেক মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। ফলে ১৯৪৪-এর আইনে ভ্রূণহত্যার বিরুদ্ধে আরো কঠিন অনুশাসন। ১৯২০-এ বিশেষজ্ঞের হাতে গর্ভপাত সম্পূর্ণভাবে আইন সঙ্গত; ১৯৪৪-এ গর্ভপাত একমাত্র স্বাস্থ্যের প্রয়োজন ছাড়া সম্পূর্ণভাবে বেআইনী। সোবিয়েতের বিরুদ্ধে প্রচার করবার আশায় অনেকে বলেন যে, প্রায় ২৪ বছর ধরে দুর্নীতিকে ঢালাও প্রশ্রয় দেবার পর শেষ পর্যন্ত সোবিয়েতের চোখ খুললো, সোবিয়েৎ হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো গর্ভপাত-নিবারণী সনাতন পন্থাই শ্রেষ্ঠ পন্থা—বাপ ঠাকুর্দার পথে ফিরে যেতে বাধ্য হলো সোবিয়েৎ।

আসলে কিন্তু এর চেয়ে সস্তা সমালোচনা আর কিছুই হতে পারে না। কেননা, এই ক'বছর ধরে সোবিয়েৎ শুধু নির্লিপ্তের মতো বসে থেকে গর্ভপাত আইনসঙ্গত করার ফলাফলটুকু লক্ষ্য করেনি। ফলাফল অবশ্যই লক্ষ্য করেছে এবং দেখেছে তা আশাতীত রকম ভালো। কিন্তু আসলে যেটা অনেক বড় কথা, এই ক'বছর ধরে অক্লান্তভাবে বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার সাহায্যে ওরা সমাজে সৃষ্টি করে গিয়েছে একের পর এক বাস্তব সাফল্য। ১৯৩৮ নাগাদই এই সাফল্য সমাজে এমন প্রাচুর্য এনেছে যে, তারপর আর গর্ভপাতের দরকার সত্যিই থাকতে পারে না। তাই ১৯৩৯ থেকেই গর্ভপাতকে দূর করবার আইন শুরু।

গর্ভপাতকে বেআইনী করবার প্রধানত দুটি বাস্তব সর্ত। এক,

জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি; দুই, মাতৃত্বের দিক থেকে মেয়েদের কয়েকটি বিশিষ্ট সুযোগ-সুবিধে দেওয়া। মাতৃত্বের সুযোগ-সুবিধে হিসেবে সোবিয়েৎ সমাজ কী রকম অবিশ্বাস্য ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছে তার পরিচয় পরের পরিচ্ছেদে দেবো। আপাতত শুধু একটি ছোট হিসেব উল্লেখ করা যাক। এই হিসেব থেকেই দেখতে পাওয়া যাবে সোবিয়েৎ পরিকল্পনায় জনসাধারণের আর্থিক উন্নতিটা কী রকম দ্রুতগতিতে এগিয়েছে:

১৯৩৩: জাতীয় আয়—৪৮৫০ কোটি রুবল,
গড়পড়তায় একজন শ্রমিকের বাৎসরিক আয়—১৫১৩ রুবল।
১৯৩৮: জাতীয় আয়—১০৫০০ কোটি রুবল,
গড়পড়তায় একজন শ্রমিকের বাৎসরিক আয়—৩৪৪৭ রুবল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মা

সোবিয়েতের একটা হাস্য-উপন্যাস থেকে কিছুটা অংশ তোলা যাক :

'দেখেছো ? আবার পোয়াতি হয়েছে !'

'কে ?' আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি। গত ক'টা দিন আমি অনুপস্থিত ছিলাম। তার মধ্যে কি ঘটেছে-না-ঘটেছে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি না।

'তার মানে ? কে মানে ? কোকীনা ! ওর ওই লাল মাথাটার দিকে একবার চেয়েই দেখো না !'

কোকীনা ডেস্ক-এর উপর ঝুঁকে বসে ; তাজা খবরটার ভুরভুরে গন্ধ যেন ওর চার পাশে। মুখে চিন্তাশীলের ভাব ; কিন্তু শান্ত।

আমার কানের কাছে ওস্তাদ আবার ফিসফিস করে বলতে শুরু করে, 'আমি হলফ করে বলতে পারি, ইতিমধ্যে ও নিশ্চয়ই পকেটে একটা প্রোটেক্শন্ কার্ড জুটিয়েছে ; ওর সঙ্গে আর টাঁ্যা ফোঁ করা চলবে না।'

'কিন্তু ব্যাপারটা কী ?' সহকর্মীদের দিকে ফিরে আমি প্রশ্ন করি। চারদিকেই একটা থমথমে ভাব, এ যেন সোবিয়েৎ প্রতিষ্ঠানের বদলে একটা সংকার সমিতির দপ্তরখানা হয়ে দাঁড়িয়েছে !

'শয়তানই জানে ! আমাদের চাকরি থাকে কিনা তার ঠিক নেই, ছাঁটাই নিয়ে কতরকমই না গুজব শুনি !' কথাগুলো ফিসফিস করে বলতে বলতে ওস্তাদ একবার আড়চোখে কোকীনার দিকে তাকায় আর তার চোখগুলো হিংসেয় জ্বলজ্বল করে ওঠে, কিন্তু ওই মেয়েদের দিক থেকে দুঃখ বা দুশ্চিন্তার নাম গন্ধও নেই ! '....মেয়ে হয়ে জন্মাইনি বলে নিজের উপর রাগ ধরে।

…সুখ যা পাবার তা ওরা ষোলো আনাই পাবে, আর
তার উপর পাবে পুরো বেতনে তিনমাসের ছুটি আর
ছাঁটাই নিয়ে ভয় নেই অতটুকুও !…বেদম মজা, নয় কি ?'

১৯৩৪-এ লেখা উপন্যাস। মেয়ে হয়ে জন্মাবার মজা নিয়ে পুরুষরা হিংসে করছে : সুখ যা পাবার তা ষোলো আনাই পাওয়া যায়, তার উপর পাওয়া যায় তিনমাস পুরো বেতনে ছুটি। আর ছাঁটাই-এর ব্যাপার নিয়েও মেয়েরা দিব্বি বেপরোয়া। চাকরি যাবার ভয় আর যার থাকুক না কেন মেয়েদের নেই। (অবশ্য আজকের সোবিয়েতে উৎপাদন ব্যবস্থায় এমন উন্নতি হয়েছে যে, ছাঁটাই-এর কথা দেশের কারোর পক্ষে ওঠে না, পুরুষদের পক্ষেও নয়)। তবু হিংসেয় টঁ্যা ফোঁ করবার উপায় নেই, কোকোনার পকেটে রয়েছে প্রোটেক্‌শন্ কার্ড। ওই কার্ডটার তাৎপর্য কি ? ওরই জোরে ভাবী মা ট্রামে-বাসে সবচেয়ে আগে উঠতে পারে, সবচেয়ে ভালো জায়গায় বসতে পারে; দোকান-হাট করবার সময় তাকে 'কিউ'-তে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, চাকরির জায়গায় তাকে দেওয়া হবে হালকা ধরনের কাজ; আর তাছাড়া বাড়তি রেশন, বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য—এসবের কথা তো আছেই। সোবিয়েৎ দেশের মেয়েরা মাতৃত্বের দরুন কি কি সুযোগ সুবিধে পায় তার পুরো ফর্দ শুনলে আমাদের দেশের সাধারণ মেয়ে নিশ্চয়ই মনে করবে রূপকথার গল্প। ফর্দ থেকে কতকগুলো নমুনা তোলা যাক :

১। সোবিয়েৎ দেশে শহর এবং গ্রাম অঞ্চলের প্রত্যেকটি এলাকায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলির কাজ হলো প্রত্যেকটি ভাবী মাকে সব রকম দরকারী ব্যাপারে উপদেশ দেওয়া, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার পুরো সময়টুকু ভাবী মার চিকিৎসা সংক্রান্ত এবং তাছাড়া অন্যান্য সব রকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করা। যাতে অস্বাভাবিক প্রসবের আশঙ্কা দূর হয় এবং প্রসবের সময় ভাবী মা ঠিক সময় মতো প্রসূতি-হাসপাতালে ভর্তি হয় তার সমস্ত ব্যবস্থা করা। মনে রাখতে হবে সবই বিনামূল্যে। পুরো

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় এবং প্রসবের সময়ও বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের যাবতীয় সাহায্য পাওয়ার কথাই আমাদের দেশের সাধারণ মেয়ের কাছে কল্পনার অতীত ব্যাপার। সোবিয়েৎ মেয়েরা কিন্তু আরো অনেক সুযোগ-সুবিধে পায়। যেমন :

২। চাকরি থেকে পুরো বেতনে ৭৭ দিন ছুটি : প্রসবের আগে ৩৫ দিন আর প্রসবের পর ৪২ দিন। যে সব ক্ষেত্রে প্রসবের সময় কোনো জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল সেই সব ক্ষেত্রে প্রসবের পর ৫৬ দিন ছুটি।

৩। প্রসবের পর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে-মা যখন কাজে যোগ দেবার উপযুক্ত হয়েছেন তখনই তাঁর পক্ষে পুরোনো কাজে যোগ দেবার অধিকার থাকবে।

৪। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার চতুর্থ মাস থেকে কোনো মেয়েকে ওভার টাইম নিযুক্ত করা হবে না এবং প্রসবের পর শিশু যতদিন স্তন্যপান করবে ততদিন পর্যন্ত—

(ক) প্রত্যেক মাকে কাজের সময় প্রতি সাড়ে তিন ঘণ্টা অন্তর শিশুকে স্তন্যদান করবার জন্যে আধঘণ্টা ছুটি দেওয়া হবে।

(খ) কোনো মাকেই রাতের সিফট-এ কাজে নিযুক্ত করা হবে না।

৫। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার ষষ্ঠ মাস থেকে এবং প্রসবের পর চার মাস পর্যন্ত প্রত্যেক মেয়েকে সাধারণ রেশনের তুলনায় দ্বিগুণ পরিমাণ রেশন দেওয়া হবে।

৬। শিশুর জামা কাপড় কেনবার জন্যে প্রত্যেক মা সরকারের কাছ থেকে নগদ টাকা পাবেন।

৭। শিশুর বয়েস যতদিন না এক বছর হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত, তার খাওয়া-দাওয়ার জন্যে প্রত্যেক মা নগদ সরকারি সাহায্য পাবেন।

৮। দু'মাস বয়েস থেকে পাঁচ বছর বয়েস পর্যন্ত শিশুকে পালন করবার জন্যে শিশুপালন-কেন্দ্রে ভর্তি করে দেবার অধিকার আছে প্রত্যেকটি সোবিয়েৎ মা-র;

আর সোবিয়েৎ দেশে শিশুপালন কেন্দ্রের প্রত্যেকটিতেই আছে প্রকৃত সুব্যবস্থা।

সন্তান জন্মের পর সোবিয়েৎ দেশে প্রত্যেকটি মেয়ে কি রকম হারে নগদ সাহায্য পান তার একটা ফর্দ তোলা যায়। ১৯৪৪-এর আইন থেকে ফর্দটি উদ্ধৃত করছি। আজকের দিনে ডলারের সঙ্গে অনুপাত রেখে হিসেব করলে ওদের এক রুবল আমাদের প্রায় পাঁচ সিকের সমান।

	থোক	মাসিক বরাদ্দ
তৃতীয় সন্তান প্রসব করবার সময় :	৪০০ রুবল	— রুবল
চতুর্থ " " " " :	৩০০ "	৮০ "
পঞ্চম " " " " :	৭০০ "	১২০ "
ষষ্ঠ " " " " :	২০০০ "	১৪০ "
সপ্তম " " " " :	২৫০০ "	২০০ "
অষ্টম " " " " :	২৫০০ "	২০০ "
নবম " " " " :	৩৫০০ "	২৫০ "
দশম " " " " :	৩৫০০ "	২৫০ "
একাদশ ও তারপর " "	৫০০০	

মাসিক বরাদ্দ টাকাটা পাওয়া যাবে শিশু দু'বছরে পড়বার সময় থেকে পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত।

এই সরকারি সাহায্য পাবার বেলায় বিবাহিতা এবং অবিবাহিতা মেয়েদের মধ্যে কোনো তফাত থাকবে না। অর্থাৎ, অবিবাহিতা মেয়েরাও সন্তানের মা হলে রাষ্ট্রের কাছ থেকে একই হারে সাহায্য পেয়ে যাবে। কিন্তু তাদের বেলায় শুধু ওইটুকুই নয়। কেননা, অবিবাহিতা মেয়েদের সংসার চলে শুধু নিজেদের রোজগারে। তাই ছেলেপুলে হলে তাদের পক্ষে আর্থিক সমস্যাটা বেশী হবার কথা। ফলে সোবিয়েৎ দেশে অবিবাহিতা মা-দের জন্যে কিছুটা বাড়তি ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার দুটো দিক: এক, মা নিজেই তাঁর ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে পারেন; আর দুই, মা ছেলেমেয়েকে মানুষ করবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপরও ছেড়ে দিতে পারেন। যদি তিনি নিজেই ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে চান তাহলে নিশ্চয়ই বাড়তি খরচা লাগবে। এই বাড়তি খরচা যোগাবার দায়িত্ব নিলো সোবিয়েৎ রাষ্ট্র। তাই ১৯৪৪-এর আইন

অনুসারে অবিবাহিতা মা ছেলেমেয়ে মানুষ করবার জন্যে রাষ্ট্রের কাছ থেকে নিম্নোক্ত হারে আর্থিক সাহায্য পাবেন :

মাত্র একটি সন্তানের জন্যে—মাসে ১০০ রুবল
মোট দুটি সন্তানের জন্যে—মাসে ১৫০ রুবল
তিন বা তার বেশি সন্তানের জন্যে মাসে ২০০ রুবল

সন্তানের বয়েস ১২ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত এই হারে সাহায্য পাওয়া যাবে। সন্তান হবার পর মেয়েটি যদি বিয়ে করেন তাহলেও কিন্তু এই আর্থিক সাহায্য থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন না।

অবশ্য অবিবাহিতা মা অন্য ব্যবস্থাও বেছে নিতে পারেন। নিজেই শিশুকে পালন করবার দায়িত্ব না নিয়ে তিনি সে-দায়িত্ব ছেড়ে দিতে পারেন রাষ্ট্রের উপর। সোবিয়েৎ দেশে রাষ্ট্র-চালিত আদর্শ শিশুপালন কেন্দ্রের অভাব নেই; এই রকম কেন্দ্র যাতে আরো অনেক অনেক বেশি খোলা যায় সে-বিষয়েও কর্তৃপক্ষ সব সময় সচেষ্ট। অবিবাহিতা মা যদি ঠিক করেন এই রকম কোনো শিশুপালন কেন্দ্রকেই তাঁর সন্তান পালনের দায়িত্ব দেওয়া ভালো তাহলে সে-ভার শিশুপালন কেন্দ্রটি গ্রহণ করতে বাধ্য। তারপর, সমস্ত খরচ খরচার দায় এই কেন্দ্রের। অবশ্যই এই ব্যবস্থা বেছে নিলে অবিবাহিতা মা শিশুপালন বাবদ রাষ্ট্রের কাছ থেকে আর নগদ সাহায্য পাবেন না। কিন্তু ইচ্ছে হলেই শিশুকে এই কেন্দ্র থেকে সরিয়ে নিজের কাছে রাখবার অধিকার বরাবরই তাঁর থাকবে।

মাতৃত্বের বিষয়ে সত্যিই যদি কোনো দেশে এতরকম সুযোগ সুবিধে থাকে তাহলে সে-দেশে মেয়েদের পক্ষে গর্ভপাতের তাগিদ প্রায় উঠে যাবে না কি? সোবিয়েৎ দেশে শুধু যে এই সব সুযোগ সুবিধে বর্তমান তাই নয়, এগুলিকে আরো অনেক ভাবে বাড়িয়ে যাবার অবিরাম সংগ্রাম চলেছে। তাই যে সব বাস্তব সত আয়ত্তে এলে গর্ভপাতকে সত্যিই বেআইনী করা সম্ভব সেগুলি একমাত্র সোবিয়েৎ দেশেরই আয়ত্তে এসেছে আর তার পরই ওদের পক্ষে বৈজ্ঞানিকভাবে সম্ভব হয়েছে অনর্থক গর্ভপাতকে বেআইনী বলে ঘোষণা করা। তাই ভ্রূণহত্যার সমস্যা পৃথিবীর আর কোনো দেশই সমাধান করতে পারেনি, পেরেছে একমাত্র সোবিয়েৎ দেশ।

দেশে সোবিয়েৎ ব্যবস্থা চালু হবার পর মেয়েদের কাছে মাতৃত্বের সম্ভাবনায় কোনো রকম আতঙ্কের কারণ নেই। বরং আনন্দেরই আকর্ষণ। হাসির উপন্যাসে তাই কোকীনা নামের একটি মেয়েকে অন্তঃসত্ত্বা হতে দেখে পুরুষ শ্রমিকেরা হিংসেয় কানাঘুষা করে। অথচ আগে মেয়েদের কাছে মাতৃত্বের সম্ভাবনাটাও রীতিমতো আতঙ্কের ব্যাপার ছিল। লেনিনগ্রাদের শ্রমিক মেয়েদের তরফ থেকে স্টালিনকে লেখা চিঠির একটু অংশ তুলে দিলেই ব্যাপারটা আন্দাজ করা সহজ হবে:

"জার আমলের রাশিয়ায় শ্রমিক মা-দের প্রতি কী অমানুষিক ব্যবহার করা হতো! কোনো মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে কারখানা থেকে ছাঁটাই করবার ব্যবস্থা ছিল। শ্রমিক মেয়েরা তাই নিজেদের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার কথা প্রাণপণে গোপন করতো; যতক্ষণ না যন্ত্রণায় একেবারে পাগল হয়ে যায় ততক্ষণ বাধ্য হতো কাজের নির্যাতন সহ্য করতে আর অনেক সময় তারা কর্মক্ষেত্রেই প্রসব করে ফেলতে বাধ্য হতো। নিজের সন্তানকে মা চায় না এর চেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার আর কী হতে পারে? তবু অনেক অনেক শ্রমিক মেয়েই বাধ্য হতো নিজের সন্তানকে অভিসম্পাত দিতে।"

শ্রমিক মেয়ের পক্ষে প্রসবের সময় চিকিৎসকের কাছ থেকে সামান্যমাত্র সাহায্য পাবার কথাটাই ছিল উদ্ভট কল্পনা, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বিশ্রাম তো দূরের কথা। অন্যান্য সুযোগ সুবিধের কথাও নিশ্চয়ই ওঠে না। সন্তান জন্মাবার পর তাকে কি করে মানুষ করতে হবে, এ-চিন্তা করবার অবসর ভাবী মায়ের পক্ষে কমই ছিল। কেননা তখন এর চেয়ে ঢের বড় দুশ্চিন্তা: অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাটার কথা জানাজানি হয়ে গেলে চাকরি যাবে আর চাকরি গেলে প্রসবের দিন পর্যন্ত নিছক বেঁচে থাকবার জন্যে যে দু'মুঠো খাবার না হলেই নয় সেইটুকু খাবারই বা জুটবে কোথা থেকে?

সোবিয়েৎ ব্যবস্থা তাহলে অসম্ভবকে সম্ভব করলো। মাতৃত্বের সম্ভাবনা—মেয়েদের কাছে যা ছিল চরম আতঙ্কের ব্যাপার—পুরুষদের কাছে তাই হয়ে দাঁড়ালো হিংসেয় কানাঘুষা করবার বিষয়! কেমন করে সম্ভব হলো এই অসম্ভব? এর মূলে কি

নারীজাতির প্রতি অনুকম্পা আর করুণা? আসলে কিন্তু তা নয়। কেননা, অনুকম্পা দিয়ে, করুণা দিয়ে দীন দরিদ্রের জন্যে মস্ত বড় ধর্মশালা খোলা যায়, কিন্তু দেশের বুক থেকে দৈন্য আর দারিদ্র্যের চিহ্ন মুছে দেওয়া যায় না। আসলে, সোবিয়েৎ চেয়েছে মানুষের জাতকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে মেরামত করতে। সোবিয়েতের আছে একটিমাত্র যাদুমন্ত্র, যার নাম বিজ্ঞান।

বিজ্ঞানের দিক থেকে ওদের কাছে সমস্যাটা ঠিক কি ভাবে দেখা দিলো প্রথমে তাই আলোচনা করা যাক।

মেয়েদের ফিরিয়ে দিতে হবে সামাজিক মেহনতের মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা করতে হবে পুরুষ আর নারীর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ সাম্য। তা না হলে মানব জাতিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে মেরামত করবার কথাই ওঠে না। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, মাতৃত্ব? পুরুষ আর নারীর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে কেমন করে? পৃথিবীর বুকে মানব জাতিকে টিকে থাকতে হলে মেয়েদের পক্ষে মাতৃত্বের বন্ধন না মেনে উপায় আছে? এ যে নেহাতই বিধির বিধান, মানুষ একে উড়িয়ে দেবে কেমন করে? আর মেয়েদের পক্ষে মাতৃত্বের দায়িত্বকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া কোনো মতে সম্ভব নয়; তাই মেয়েদের পক্ষে সামাজিক মেহনতের দায়িত্বেও সমানে সমান হওয়া উদ্ভট কল্পনা ছাড়া আর কি হতে পারে? সেজন্য যাঁরা হল্লা তোলেন, বলেন সামাজিক শ্রমের ব্যাপারেও মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সমান পাল্লা দেবে, তাঁদের হুঁশ নেই প্রকৃতির একটি প্রাথমিক নিয়ম সম্বন্ধেই।

কথাটা মিথ্যে নয়। তবু—এতবড় নির্লজ্জ মিথ্যে কথা পৃথিবীতে খুব কমই প্রচারিত হয়েছে। মাতৃত্বের দায়িত্ব মেয়েদের—এবং শুধুমাত্র মেয়েদেরই—নিতে হবে। এ-দায়িত্ব নেওয়া মানে অন্তত শারীরিকভাবে কতকগুলো অসুবিধেকে মেনে নেওয়া। সে-অসুবিধের কথা ওঠে না পুরুষদের বেলায়। প্রকৃতির নিয়ম সন্দেহ নেই। আর, প্রকৃতির নিয়মকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার কল্পনাটাও সুস্থ বুদ্ধির লক্ষণ নয়। তবু,—আবার সেই একই কথা,—বিজ্ঞান মানে প্রকৃতির কাছে মূক সমর্পণ নয়; প্রকৃতিকে জয় করা। কিন্তু বিদেশী রাজা যেমনভাবে রাজ্য জয় করতে আসে তেমনিভাবে জয় করতে আসাও নয়। তার বদলে, প্রকৃতির নিয়ম

কানুনকে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে চেনা। এই চেনার নামই জয় করা। তারই নাম বিজ্ঞান। মাতৃত্বের সমস্যাকেও সোবিয়েৎ এইভাবে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখবার চেষ্টা করলো। মাতৃত্বের দায়িত্ব নেওয়া মানে নিছক শারীরিকভাবে কতকগুলো অসুবিধেকে স্বীকার করে নেওয়া বই কি। তাহলে? তাহলে সামনে মাত্র দুটো পথ। এক: এগুলোকে বিধির বিধান মনে করে আত্মসমর্পণ করা, মূক পশুর মতো। আর এক হলো জয় করা। তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া নয়, জয় করা। তার মানে, সবচেয়ে স্পষ্টভাবে চিনতে পারা, জানতে পারা আর তারই ভিত্তিতে মানতে পারা। যেমন, আকাশকে মানুষ জয় করলো আকাশে ওড়বার সব রকম নিয়মকানুনকে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে চিনতে পেরে, জানতে পেরে। বিজ্ঞানের পথকেই একমাত্র পথ বলে মেনেছে বলে সোবিয়েতের পক্ষে মাতৃত্ব-সমস্যার সমাধানও আকাশকে জয় করবার মতোই, উড়োজাহাজ তৈরি করবার মতোই: প্রকৃতিকে চিনবার ভিত্তিতে প্রকৃতিকে জয় করাই। মাতৃত্বের যে সব অভাব অসুবিধে সেগুলোকে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে চেনা, সবচেয়ে স্পষ্টভাবে স্বীকার করে নেওয়া। তার মানে? মানে ওই প্রোটেক্শন কার্ড: ওই দেশজোড়া মাতৃসদন আর শিশুসদনের জাল ছড়ানো, প্রসবের আগে বিশ্রাম, প্রসবের পরে বিশ্রাম, পুরো বেতনে ছুটি, আর্থিক সাহায্য, বাসে-ট্রামে ঘুরবার মতো দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপারেও সুযোগ-সুবিধে, আর, যেটা সবচেয়ে বড় কথা,—দেশের উৎপাদন শক্তিকে পরিকল্পনার ভিত্তিতে বাড়িয়ে সাধারণভাবে জনগণের অর্থনৈতিক সাচ্ছল্য আনা। যে-রকম, আকাশকে জয় করতে গেলে আকাশে ওড়বার প্রাকৃতিক বিঘ্নগুলোকে জয় করতে হলে, প্রোপেলার বানাতে হয়—ইঞ্জিন বানাতে হয়, উড়োজাহাজের দু'পাশে দুটো মস্ত ডানা বানাতে হয়,—সেই রকমই! এইগুলোর সাহায্যে আকাশের সব রকম দাবিকে সবচেয়ে ভালো করে মেটাতে পারলে পরই আকাশকে জয় করা সম্ভব।

আবেগ আর উচ্ছ্বাস নয়, বিজ্ঞান। তাই, মাতৃত্বের সমস্যা নিয়ে সোবিয়েতের চিন্তাভঙ্গিটাই অন্য রকম। একটা নমুনা নেওয়া যাক। ওরা বলে, সমাজের পক্ষে মাতৃত্ব বাবদ যে-খরচা তা

হলো এক রকমের functional expense বা বৃত্তিগত ব্যয়। বৃত্তিগত ব্যয় মানে? ধরুন, একজন লোক কয়লার খনিতে কাজ করছে। খনিতে কাজ করছে বলেই, তার বৃত্তিটা ওই বিশেষ বৃত্তি হবার দরুনই তার জন্যে কতকগুলো বিশেষ খরচ করা দরকার: তাকে বিশেষ একরকম আলো কিনে দিতে হবে, কিনে দিতে হবে বিশেষ একরকম কুড়ুল, এইরকম নানান জিনিস। কিন্তু সে যদি খনিতে কাজ না করে ছাপাখানায় প্রুফ দেখবার কাজ করতো, কিংবা কোনো ইস্কুল-কলেজে মাস্টারি করতো তাহলে তার জন্যে এই বিশেষ খরচাগুলো করবার দরকার পড়তো না। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যে লোককে ঘোরাঘুরির কাজ করতে হয় তার জন্যে—তার ওই ঘোরাঘুরির জন্যেই—কতকগুলো বাড়তি খরচ লাগে; অপর একজন সেই প্রতিষ্ঠানেরই দপ্তরে বসে দশটা-পাঁচটা করলে তার জন্যে এই বাড়তি খরচগুলোর দরকার পড়ে না। তাহলে ওই ঘোরাঘুরি বাবদ যে বাড়তি খরচা তাকে বলতে হবে বৃত্তিগত ব্যয়, functional expense। ওয়েব্ দম্পতি লিখেছেন:

"মানুষকে নতুন করে গড়বার যে বলশেভিক প্রচেষ্টা তার শুরু থেকেই অন্তঃসত্ত্বা মেয়েদের ভরণ-পোষণ বাবদ একটা মোটা অঙ্ক ধরে রাখা হয়েছিল। মেয়েরা শ্রমিক আর নাগরিক-হিসেবে স্বাভাবিক কাজ করতে গেলে তাদের পক্ষে এই বাড়তি খরচটার দরকার। যে কোনো দপ্তরে বা কাজের জায়গায় যেমন একটি লোককে তার মাইনে ছাড়াও অত্যন্ত স্বাভাবিক-ভাবেই নানান রকম বৃত্তিগত খরচ দেওয়া হয়—নিজের বিশেষ কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে যে খরচ তাকে করতে হয়েছে—তেমনি মেয়েরা,—যারা সন্তানকে জন্ম দেওয়া নামের একটি বিশিষ্ট বৃত্তি সম্পাদিত করে,—তাদের এই বৃত্তির দরুন যে বিশিষ্ট অর্থনৈতিক বোঝা ঘাড়ে নিতে হয় অন্তত সেই বোঝা থেকে তাদের মুক্তি দিতে হবে, যদিও এর দরুন যে শারীরিক কষ্ট আর অস্বস্তি তার হাত থেকে তাদের সম্পূর্ণ মুক্তি দেওয়া সম্ভব নয়। সোবিয়েৎ রাশিয়ায় সন্তান প্রসবের সমস্ত খরচকেই মেয়েদের পক্ষে ও তাদের সামাজিক কর্তব্য সম্পাদনের পক্ষে যতদূর সম্ভব বৃত্তিগত খরচ হিসেবে দেখা হয়।"

নবম পরিচ্ছেদ

গর্ভ নিয়ন্ত্রণ

পশুর রাজ্য পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে মানুষ। মানুষ তাই প্রকৃতির কাছে মূক সমর্পণ করবে না। হাতে তার বিজ্ঞানের হাতিয়ার। সে জয় করেছে পৃথিবীকে।

কিন্তু আজকের দুনিয়ায় মানুষের এই দিগ্বিজয়ের অপর পিঠেই করুণ পরাজয়: একদিক থেকে যেটা আশ্চর্য অগ্রগতি অপর দিক থেকে সেইটাই আবার নির্মম সমর্পণ। যেমন ধরুন, মার্কিন দেশের মানুষ আজ শিখেছে কারখানা গড়ে সেই কারখানায় মিনিটে একটা করে উড়োজাহাজ বানাতে, পরমাণুর যে অবিশ্বাস্য দৈত্যশক্তি, সেই দৈত্যশক্তি নিজের মুঠোর মধ্যে আনতে: কিন্তু এত উড়োজাহাজ, অমন দৈত্যশক্তি, এ সমস্তকে মানুষ মারার কাজে ছাড়া আর কোনো কাজে নিয়োগ করবার কল্পনা মার্কিন-প্রভুদের মাথায় আসছে না! পৃথিবীকে অমন আশ্চর্যভাবে জয় করবার উল্টো দিকেই মানুষের চরম পরাজয়। আজকের মানুষ বিজ্ঞানের হাতিয়ার হাতে এত বেশি জিনিস উৎপাদন করতে শিখেছে যে, মানুষের জীবন সচ্ছলতায় টলমল করবার কথা। তবু, পৃথিবীর বুকে দু' শ' বিশ কোটি মানুষের মধ্যে দেড়শ' কোটি মানুষের দু'বেলা পেট ভরে খাবার জোটে না। উৎপন্ন জিনিসের অনেকখানিই পালা করে পুড়িয়ে ফেলতে হয়; কেননা পৃথিবী জুড়ে মানুষের হাহাকার যত তীব্রই হোক না কেন উৎপাদনের উপায়গুলোর যারা মালিক তাদের হিসেব অনুসারে উৎপন্ন জিনিসের সবটুকুকে যদি বাজারে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে জিনিসের দাম পড়বে, মুনাফার অঙ্কে পড়বে ভাটা। এদিকে মহাযুদ্ধের চক্রান্ত সফল করবার আশায় এত কোটি কোটি টাকার হিসেব খবরের কাগজে হামেশাই চোখে পড়ে যে, গণিতশাস্ত্রও বুঝি থই পায় না, সংখ্যাগুলোকে যোগ দিতে গেলে মাথা ঝিমঝিম করে।

দিগ্বিজয়ের উল্টো পিঠেই এই রকম চরম পরাজয়। ইতিহাস বুঝি পরিহাস-রসিক, মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। গর্ভনিয়ন্ত্রণের সমস্যা সম্বন্ধে ভেবে দেখতে গেলেও এই রকমের একটা কথাই মনের উপর ভেসে ওঠে। সুস্থ আর শান্ত পরিকল্পনার ভিত্তিতে সন্তানের জন্ম দেওয়া-না-দেওয়ার কথা মানুষ যাতে ঠিক করতে পারে—সেইটেই হলো গর্ভনিয়ন্ত্রণের পিছনে আসল কথা। তাই, গর্ভনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য জীবনকে খর্ব করা নয়, জীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলা। কিন্তু গর্ভনিয়ন্ত্রণ নিয়ে বাকি পৃথিবীতে যে উৎসাহ তার চৌদ্দ আনাই আসলে জীবনকে খর্ব করার উৎসাহ। আমাদের দেশের কথাটাই ভেবে দেখা যাক। আমাদের, অন্তত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে গর্ভনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে জ্ঞান ও আলোচনা পর্যাপ্ত না হলেও অন্তত খানিকটা পরিমাণে তো শুরু হয়েছে। কিন্তু তার পেছনে আসল প্রেরণাটা ঠিক কিসের?—অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, জীবনে নেই নিশ্চয়তা। অভাব আর অনিশ্চয়তার এই নরকে নবজাতককে আমন্ত্রণ জানিয়ে কী হবে, কী হবে অভাবকে তীক্ষ্ণতর করে তুলে? তাই গর্ভনিয়ন্ত্রণ। অভাব আর অনিশ্চয়তা দিয়ে ঘেরা সংকীর্ণ গণ্ডিটুকুর মধ্যে জীবনকে যেমন করে হোক বেঁধে রাখতে হবে—তারই তাগিদ জীবনের পরাজয়কে মেনে নেবার তাগিদ। বৈজ্ঞানিকভাবে যে-গর্ভনিয়ন্ত্রণ জীবনকে পূর্ণতর করে তুলতে চেয়েছে সেই গর্ভনিয়ন্ত্রণের কথাই আজ আমাদের পক্ষে জীবনকে খর্ব করবার আয়োজনে, জীবনকে ফাঁকি দেবার কাজে পর্যবসিত হতে বসেছে। শুধু আমাদের দেশেই নয়, নানান দেশেই আজ এই কথা। কেননা, ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সদর-মহলে জাঁক-জমকটা যতখানিই হোক না কেন অন্দরমহলে সেই দৈন্য, সেই অভাব, সেই অনিশ্চয়তা। তাই সে-সব দেশের সাধারণ মানুষ সম্বন্ধেও মোটামুটি এই কথাই। গর্ভনিয়ন্ত্রণ নিয়ে তাদের আসল উৎসাহটা পরিকল্পনার ভিত্তিতে জীবনকে পূর্ণাঙ্গ করবার প্রচেষ্টা নয়,—তাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক উৎসাহ নয়। তার বদলে বরং জীবনের অনিশ্চয়তা আর অভাবের সঙ্গে কোনোমতে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার উৎসাহ, প্রকৃতিকে জয় করবার বদলে সামাজিক গ্লানির সামনে মাথা নোয়াবার উৎসাহ।

সোবিয়েতের বেলায় কিন্তু অন্য কথা। কেননা ওদের দেশে উৎপাদনের উপায় ব্যক্তিগত মুনাফালোভীর মুনাফা যোগানোর কাজে নিযুক্ত হয়। তাই, প্রকৃতিকে জয় করে যতখানি জিনিস পাওয়া যায় তা মানব কল্যাণেই নিযুক্ত। প্রাচুর্যের অপর পিঠে নেই হাহাকার, আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ছাড়া দরকার পড়ে না রণসম্ভার। বিজ্ঞান পায় মুক্তি, শ্রেণীসমাজের কবল থেকে এগোতে পারে প্রকৃত বস্তুনিষ্ঠ পথ ধরে। ওদের জীবনে যে অভাব অনটন একটুও নেই তা নিশ্চয়ই সত্যি কথা নয়। আসলে প্রকৃতিকে যতখানি জয় করতে পারলে জীবন থেকে অভাবের চিহ্ন একেবারে মুছে ফেলা যায় ততখানি জয় করা আজও ওদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু,—আর এইটেই আসলে অনেক বড় কথা—বিজ্ঞান ওদের দেশে মুষ্টিমেয় মুনাফালোভীর সেবায় নিযুক্ত নয়, তাই মানুষের দিগ্বিজয় মানুষেরই কল্যাণে নিযুক্ত, মানুষের পরাজয়ে পর্যবসিত নয়। বিজ্ঞান মানুষকে নিয়ে চলেছে সৃষ্টির পথ ধরে,—ধ্বংসের পথ ধরে নয়, অবমাননার পথ ধরে নয়, জীবনের অনিশ্চয়তাকে কোনোমতে মাথা পেতে মেনে নেবার পথ ধরে নয়।

বিজ্ঞানের সব রকম আবিষ্কার সম্বন্ধেই এই কথা। গর্ভনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্বন্ধেও এই কথাই। প্রথমে দেখা যাক সোবিয়েৎ দেশে গর্ভনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে ব্যবস্থাটা ঠিক কী রকম, তারপর আলোচনা করা যাবে এই ব্যবস্থার মধ্যেই নির্ভুল বৈজ্ঞানিক ভঙ্গির স্বাক্ষর আছে কি না।

গর্ভনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে মনোভাবটা ঠিক কী রকম? ওয়েব-দম্পতির বই থেকে উত্তরটা উদ্ধৃত করা যাকঃ "ইউ.এস.এস.আর-এ গর্ভনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে কোনো জনমত নেই, কোনো বাধা নেই এই ব্যবস্থার প্রচারের বিরুদ্ধে; গর্ভনিয়ন্ত্রণের সরঞ্জাম বিক্রি করা বারণ নয়, তার বিরুদ্ধে নেই কোনো নিষেধাজ্ঞা। বরং শহরের তরুণ এবং বৃদ্ধদের মধ্যে এ নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা হয়, বিশেষ করে বিবাহ-দপ্তরে আর রতিজ-রোগের চিকিৎসা প্রসঙ্গে যে সব শিক্ষামূলক পোস্টার আর চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর উপদেশ, সেগুলির প্রধান আলোচ্য বিষয় এই গর্ভনিয়ন্ত্রণই। 'উপদেশকেন্দ্র',

হাসপাতাল আর ক্লিনিকগুলির পক্ষে এ বিষয়ে উপদেশ আর নির্দেশ দেবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে এবং এই স্বাধীনতার সুযোগ প্রায়ই নেওয়া হয়। এই রকম খোলাখুলি স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে ইউ.এস.এস.আর-এ কোনো রকম সমালোচনা আমাদের চোখে পড়েনি।" আবার এই প্রসঙ্গেই ওয়েব-দম্পতি বলছেন, "অন্যান্য মহাজাতিগুলির তুলনায় ইউ.এস.এস.আর-এ জনসংখ্যা আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, দুই-ই বেশি। তাই হয় তো মনে হতে পারে যে, ইউ.এস.এস.আর-এ জনসাধারণের মধ্যে গর্ভনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করায় বাধা আছে। কিন্তু কথাটা সত্যি, এমন তথ্য আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। কর্তৃপক্ষের বিবৃতি, কিংবা ব্যক্তিগত কথোপকথন, কিংবা, যা তার চেয়েও বেশি বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারে, অর্থাৎ সংখ্যাগণিতের হিসেব—এই সব কোনো কিছু থেকেই অনুমান করা যায় না যে, ইউ.এস.এস.আর-এ স্বেচ্ছাকৃত গর্ভনিয়ন্ত্রণ হলাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স বা জার্মানি, ইংলণ্ড বা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি কোনো দেশের তুলনায় নিন্দিত।"

ওয়েব-দম্পতির এই দুইটি উক্তিকে বিশ্লেষণ করা যাক। প্রথমত, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হিসেবে গর্ভনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো রকম অন্ধ-সংস্কার নেই, বরং গর্ভনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করবার চেষ্টা অত্যন্ত ব্যাপকভাবেই চোখে পড়ে। কেননা গর্ভনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পিছনে বৈজ্ঞানিক উৎসাহটা হলো পশুর রাজ্য থেকে উঠে আসবার চেষ্টা—নির্বিচারে সন্তানের জন্ম না দিয়ে সন্তান জন্মের ব্যবস্থাটা বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার উপর প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা। তাই, শরীর-মনের দিক থেকে গর্ভনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে অগ্রাহ্য করবার বা অবহেলা করবার কোনো প্রশ্ন নিশ্চয়ই উঠতে পারে না। সোবিয়েৎ-এ গর্ভনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো বাধা নেই, বরং এ সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের সম্পূর্ণ সুযোগ আছে। কিন্তু, এই কথাটুকু অনেক দেশ সম্বন্ধেই হয়তো মোটামুটি সত্যি—কেবল আমাদের দেশের মতো নেহাত পেছিয়ে পড়া দেশগুলির কথা ছাড়া। কিন্তু আমাদের দেশের মতো পেছিয়ে পড়া দেশের কথা বাদ দিলে, সভ্য পৃথিবীর অধিকাংশ

জায়গাতেই গর্ভনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তাই শুধু এই দিকটুকু সম্বন্ধে সোবিয়েতের যে-মনোভাব তার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য খোঁজবার চেষ্টা করে লাভ নেই। বৈশিষ্ট্য আসলে দ্বিতীয় দিকটায়। গর্ভনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিধিনিষেধের কোনো বাধা না থাকলেও, এমন কি এ সম্বন্ধে মানুষের মন থেকে অন্ধ সংস্কার মুছে ফেলবার চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও, বাকি পৃথিবীতে গর্ভনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যে রকম ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত সেই রকম নয় সোবিয়েৎ দেশে। সোবিয়েৎ দেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধি-হার অন্যান্য দেশের চেয়ে বেশি, অর্থাৎ গর্ভনিয়ন্ত্রণের উপর ঝোঁক নেই অন্যান্য দেশের মতো। তার আসল কারণ হলো অন্যান্য দেশে গর্ভনিয়ন্ত্রণের উপর যে কারণে আসল ঝোঁক সোবিয়েৎ দেশে মোটেই তা নয়। সোবিয়েতের ঝোঁকটা কিসের? শরীর-মনের স্বাস্থ্য অটুট রাখবার। একটি সন্তানকে জন্ম দেবার অল্পদিন পরেই কোনো মেয়ে যদি আবার অন্তঃসত্ত্বা হন তা হলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে পারে, অর্থাৎ দুটি সন্তানের জন্মের মাঝখানে খানিকটা সময় চাই। এই সময়টুকু ব্রহ্মচর্যের চেষ্টা করলে মানসিক স্বাস্থ্য অটুট না থাকবার সম্ভাবনা; তাই গর্ভনিয়ন্ত্রণ। অবাঞ্ছনীয় গর্ভধারণের পর গর্ভপাতের পথে কাউকে যেন নিষ্কৃতি খুঁজতে না হয়, তাই গর্ভনিয়ন্ত্রণ। বংশগত রোগ-ভোগের সম্ভাবনা থেকে নতুন বংশকে যাতে মুক্তি দেওয়া যায়, তাই গর্ভনিয়ন্ত্রণ। এই রকম আরও অনেক।

ঠিক বিজ্ঞানের দিক থেকে গর্ভনিয়ন্ত্রণ কেন দরকার তার কয়েকটি নমুনা দেওয়া গেল। কিন্তু নিছক এই দরকারগুলির খাতিরে গর্ভনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে যতখানি উৎসাহ স্বাভাবিক বাকি দুনিয়ার সাধারণ মানুষের মধ্যে শুধু কি তারই পরিচয়? নিশ্চয়ই নয়। আসলে গর্ভনিয়ন্ত্রণ নিয়ে বাকি দুনিয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহটা অনেক অনেক বেশি। আর তার মূলে রয়েছে বিজ্ঞানের তাগিদ নয়, নেহাতই অবৈজ্ঞানিক একটা তাগিদ। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই; অভাব আর অনিশ্চয়তায় ভরা মানুষের জীবন। তাই নবজাতকের জন্ম আনন্দের চেয়ে বরং নতুন সমস্যারই সৃষ্টি করে। অভাব আর অনিশ্চয়তার নরকে নতুন একটি মানুষকে কেন

ডেকে আনা? কেন ডেকে আনা নিজেদের সংকীর্ণ সুযোগ-সুবিধেগুলির নতুন কোনো অংশীদার। বাকি দুনিয়ায় গর্ভনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের যে এতখানি ফাঁপানো-ফোলানো উৎসাহ তার মূলে চৌদ্দ আনাই হলো এই কথা। অভাব আর অনিশ্চয়তার গণ্ডির মধ্যে সংকীর্ণ যে জীবন তারই সঙ্গে কোনোমতে খাপ খাইয়ে নেবার অর্থ হলো জীবনের কাছে হার স্বীকার করা। সোবিয়েতের লোকদের সম্বন্ধে কিন্তু এই কথা ওঠে না। তাই ওদের মধ্যে গর্ভনিয়ন্ত্রণ নিয়ে এমন ফাঁপানো-ফোলানো উৎসাহ চোখে পড়বার কথাও নয়। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, ওদের জীবন থেকে অভাব অনটন আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। জীবন থেকে অভাব অনটনকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবার জন্যে পৃথিবীকে যতখানি জয় করা দরকার আজও ততখানি জয় করা সম্ভব হয়নি; তাছাড়া আজ অন্যান্য দেশের মুনাফালোভী নায়কদের চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে অনেকখানিই প্রস্তুত থাকতে হয়,—পৃথিবীকে জয় করে পাওয়া সম্পদের খানিকটা এই প্রস্তুতির জন্যে খরচ না করেও এখন উপায় নেই। কিন্তু যেটা আসলে সব চেয়ে জরুরী কথা সেটা হলো ওরা এগিয়ে চলেছে জীবন থেকে অনিশ্চয়তাব শেকড উপড়ে ফেলতে। আব মুনাফালোভী বিদেশীদের যুদ্ধচক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রস্তুত থাকবার জন্যে যতখানি দরকার ততখানি সম্পদকে আলাদা করে রেখেও ওরা দেশের উৎপন্ন জিনিসকে দেশের লোকের কল্যাণেই বণ্টন করতে চায় বলেই ওদের দেশের বুক থেকে অভাব আর অনিশ্চযতার বোঝা দিনের পর দিন অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে হালকা হযে যাচ্ছে। অর্থাৎ ওদের উৎপাদন শক্তি বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন আর উৎপাদনের উপায়গুলির উপর থেকে ব্যক্তিগত মানুষের মালিকানা শেষ হয়েছে বলেই উৎপন্ন সম্পদের সম্ভার কোনো ব্যক্তিগত মালিকের ভাঁড়ারে গিয়ে জমছে না। উৎপন্ন জিনিসগুলো জনগণের বাস্তব উন্নতিতে নিযুক্ত। তাই জনগণের আকাশ থেকে কেটে যাচ্ছে অভাব আর অনিশ্চয়তার কালো মেঘ। প্রাচুর্যের পথে এগিয়ে চলেছে ওরা আর তাই ওদের মধ্যে গর্ভনিয়ন্ত্রণের আসল উৎসাহটা জীবনেব খর্বতাকে মেনে নেবার, সহ্য করতে শেখবার উৎসাহ হতেই পারে না। কিংবা,

যা একই কথা, ওদের মধ্যে গর্ভনিয়ন্ত্রণ নিয়ে কোনো ফাঁপানো-ফোলানো উৎসাহ চোখে পড়বার কথা নয়।

হিসেব-নিকেশগুলির দিক থেকেই ভেবে দেখা যাক। মাত্র ক'বছরের চেষ্টায় দেশের সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থায় ওরা কী রকম আকাশ-পাতাল তফাত আনতে পেরেছে? মাত্র ক'বছরের চেষ্টায় মেয়েদের মধ্যে সামাজিক শ্রমের মর্যাদা ওরা কতখানি ফিরিয়ে দিতে পেরেছে? মাত্র ক'বছরের চেষ্টায় মাতৃত্বের সুযোগ সুবিধে ওরা কতখানি বাস্তবে পরিণত করতে পেরেছে? ১৯১৭ থেকে ১৯৫০। পুরো তেত্রিশ বছর সময়ও নয়। একটা অমন বিশাল জাতির ইতিহাসের তুলনায় এই তেত্রিশটা বছর কতটুকু? তবু, জার আমলে ওদের জনসাধারণের যে অর্থনৈতিক জীবন আর আজকের দিনে ওদের জনসাধারণের যে অর্থনৈতিক জীবন—এ-দু'-এর মধ্যে কোনো মিল খুঁজে বের করতে যেন কল্পনা শক্তিও ব্যর্থ হবে।

এই প্রসঙ্গে আরো একটা কথা ওঠে; খুবই জরুরী কথা। অন্যান্য দেশের শাসক সম্প্রদায় জনসংখ্যা সম্বন্ধে একটি বিশেষ মতবাদ প্রচার করতে ব্যস্ত। ম্যাল্‌থাস্ নামে এক ইংরেজ অর্থনৈতিক পণ্ডিত এই মতবাদের মূলসূত্র রচনা করেছিলেন। মতবাদটি তাই ম্যাল্‌থাস্-বাদ নামে প্রচলিত। মতবাদটির মূল কথা হলো: পৃথিবীতে খাদ্যের যোগান বাড়ছে যে-হারে তার চেয়ে ঢের বেশি দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে জনসংখ্যা। তাই এত অভাব, এত হাহাকার, এত দৈন্য, অনিশ্চয়তা। শাসক-শ্রেণীর পক্ষে মতবাদটি যে খুবই সুবিধাজনক তা বুঝতে নিশ্চয়ই খুব বেশি পাণ্ডিত্যের দরকার পড়ে না। মানুষের অভাব অভিযোগের জন্যে একটি প্রাকৃতিক নিয়মকে দায়ী করতে পারবার মতো এতবড় বরাভয় শাসক-শ্রেণীর কাছে আর কী হতে পারে? জনগণকে এই কথাটা ভালো করে বুঝিয়ে দিতে পারলে—বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারলে—তাদের মিটিং-মিছিল আর হল্লা-হামলার হাত থেকে

নিস্তার পাওয়া যাবে সবচেয়ে সহজ উপায়ে। তাই শোষক-শ্রেণীর পোষা পাণ্ডিতেরা ম্যাল্‌থাসের মতবাদটি নিয়ে হরেক রকম মাতামাতি করে থাকেন এবং এই মতবাদের ভিত্তিতে এমন কি সবচেয়ে নির্লজ্জ, কথাবার্তা বলতেও তাঁদের দ্বিধা হয় না। কতখানি অমানুষিক আর কতখানি নির্লজ্জ তার কিছুটা নমুনা তোলা যাক।

ম্যাল্‌থাস্ নিজে যে পুস্তিকা আকারে প্রথম তাঁর মতবাদ প্রকাশ করেছিলেন সেই পুস্তিকায় তিনি স্পষ্টই বলছেন, পাছে জনসংখ্যা সীমার বাইরে বেড়ে যায় এই উদ্দেশ্যে প্রকৃতিতেই ব্যবস্থা রয়েছে—যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং দুঃখ দুর্নীতির প্রভাব। তখনকার দিনে ইংলণ্ডে গরীব লোকদের সাহায্য করবার যে ব্যবস্থা ছিল, যে ব্যবস্থা অনুসারে বৃহৎ পরিবারের দরিদ্রলোককে বেশি করে অর্থ সাহায্য করবার কথা, সেই ব্যবস্থার তীব্র নিন্দে করলেন ম্যাল্‌থাস্‌ঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধিই যদি যত নষ্টের গোড়া হয় তাহলে আর্থিক সাহায্যে বাড়তি জনসংখ্যাকে টিকিয়ে রাখবার কোনো মানে হয় না। কিন্তু নির্লজ্জ হৃদয়হীনতার দিক থেকে আজকের দিনের নয়া-ম্যাল্‌থাস্ পন্থীরা ম্যাল্‌থাস্‌কেও হারিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের দলে আছেন কয়েকজন ইংরেজ আর মার্কিন 'পণ্ডিত'। যেমন ধরুন, পিয়ারসন আর হার্পার নামের দু'জন মার্কিন পণ্ডিত হালে একটি বই লিখেছেন। বইটির নাম "পৃথিবীর বুভুক্ষা"। সেই বইতে তাঁরা হিসেব করে দেখাতে চান যে, পৃথিবীতে খাবারের যোগান যা আছে তা দিয়ে বড় জোর নব্বই কোটি মানুষের পেট ভরানো চলে; অথচ পৃথিবীতে রয়েছে প্রায় ২২০ কোটি মানুষ। তাই, ছাঁটাই দরকার—পৃথিবীর বুক থেকে মানুষ ছাঁটাই। একশ' কোটির চেয়ে বেশি বাড়তি ক্ষুধার্ত মানুষ। লেখকরা তাই আক্ষেপ করে বলছেনঃ দুনিয়া-জুড়ে যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করবার চেষ্টা সেটাকে মানুষের মতিভ্রম ছাড়া আর কি বলা চলে? আসলে পৃথিবী থেকে ফালতু ক্ষুধার্ত মুখ ঝেঁটিয়ে সাফ করবার জন্যে এইগুলিই হলো প্রকৃতির ব্যবস্থা। এগুলির সঙ্গে সংগ্রাম করা মানেই প্রাকৃতিক কল্যাণ থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা নয় কি? পৃথিবীর বুক জুড়ে চলুক শকুনের

উৎসব। দুর্ভিক্ষের হাহাকার আরো তীব্র হয়ে উঠুক। মড়কের আর মহামারীর উৎসবে যেন ভাটা না পড়ে। আর এসো আমরা জয়ধ্বনি করি, মানব-মুক্তির সোজা সড়ক আবিষ্কার করা গিয়েছে। সে সড়ক হলো পৃথিবীর বুক থেকে অর্ধেকের চেয়ে বেশি মানুষকে সোজা যমের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার সড়ক। কয়েক হাজার বছর ধরে সভ্যতার ইমারত গাঁথবার পর তারই চূড়োয় এক করাল করোটি প্রতিষ্ঠা করবার ডাক, জীবনের কথা ভুলে মৃত্যুর জয়গান করবার ডাক। তাহলে কি একেই বলতে হবে সভ্যতার চরম পরিণাম? আর একজন মার্কিন লেখক, উলিয়ম ভগট। "বাঁচবার পথ" বলে তিনি একটি বই লিখেছেন। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর তিনি দারুণ চটে গিয়ে বলেছেন, দু'হাজার বছর আগে এক অজ্ঞ বৈজ্ঞানিক যে কুসংস্কার প্রচার করেছিল সেই কুসংস্কারের হাত থেকে আজকের চিকিৎসা বিজ্ঞানও মুক্ত হতে পারেনি। অজ্ঞ বৈজ্ঞানিকটির নাম হলো হিপোক্রিটাস আর তাঁর প্রচার করা কুসংস্কারটা হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানীর আদর্শ সম্বন্ধে একটি মস্ত ভুল ধারণা। হিপোক্রিটাস মনে করতেন, চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর আদর্শ হলো কত বেশি মানুষকে কত বেশি দিন ধরে বাঁচিয়ে রাখা যায় তারই চেষ্টা? মার্কিন পণ্ডিত ভগট বলতে চান যে, এটা একেবারে সর্বনেশে কথা। কারণ অনেক লোক যদি অনেক দিন ধরে বাঁচে তাহলে খাবার জিনিসে টান পড়বে। এত লোকের জন্যে পর্যাপ্ত খাবার পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। তাই অধিকাংশ লোকের পক্ষে তাড়াতাড়ি মরে যাওয়াই ভালো। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান এই ব্যবস্থায় বাধা দিচ্ছে। স্বাস্থ্যবিদ্যায় নানান আবিষ্কার করে বিজ্ঞান মানুষের সর্বনাশ করছে। বিজ্ঞান যদি কলেরার বীজাণু আবিষ্কার না করতো, যদি আবিষ্কার না হতো এই বীজাণুর সঙ্গে লড়াই করবার উপায়—তাহলে নিশ্চয়ই কলেরার হাত থেকে কোটি কোটি মানুষ নিষ্কৃতি পেতো না, পৃথিবী থেকে দূর হতো অবান্তর আর অভুক্ত কোটি কোটি মানুষের জঞ্জাল।

ইংরেজ বৈজ্ঞানিক জুলিয়ন্ হাক্সলি অবশ্য এমন নির্লজ্জভাবে, এমন বেহায়ার মতো শোষকতুষ্টির কথাগুলি প্রচার করেন না। তবুও, জনসংখ্যা নিয়ে তিনি যে আতঙ্ক প্রকাশ করেন তার থেকে

স্বাভাবিকভাবেই এই কথাগুলিতে গিয়ে পৌঁছতে হয়। ১৯৫০-এর মার্চ মাসে লণ্ডনের এক খাদ্য পরিষদে তিনি বলেন, পৃথিবীর কয়েকটি দেশের পক্ষে জনসংখ্যা কমাবার চেষ্টা একান্তই প্রয়োজন। এ নিয়ে দেরি করাটা বিপজ্জনক হবে; কেননা তাঁর মতে পৃথিবীতে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে মারাত্মক দ্রুতগতিতে—প্রত্যেক দেড় সেকেণ্ডে একজন করে মানুষ বেড়ে চলেছে!

বলাই বাহুল্য, এইসব তথাকথিত পণ্ডিতদের কথাগুলো বাজে কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। পৃথিবীর জনসংখ্যা নিয়ে আতঙ্ক প্রকাশ করবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই, পৃথিবীর বুক থেকে ফালতু মানুষের জঞ্জাল দূর করবার কথাটা নেহাতই নির্লজ্জ মিথ্যার এক প্রস্তাব ছাড়া আর কিছুই নয়। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পেরিয়ে গিয়ে দুর্ভিক্ষ আর মহামারী আর মহাযুদ্ধের জয়গান করাটা বিজ্ঞান-বুদ্ধির পরিচয় নয়, বর্বরতার পরিচয়। কেননা বিজ্ঞানের পথ হলো পৃথিবীকে জয় করবার পথ, পৃথিবীর কাছ থেকে দিনের পর দিন বাড়তি সম্পদ আদায় করবার পথ। বিজ্ঞানের পথ হলো মানুষের হাতিয়ারকে আরো বেশি মজবুত আরো বেশি ধারালো করে তোলবার পথ, উৎপাদনের উপায়কে উন্নততর করবার পথ। এই পথেই বিজ্ঞান এগিয়ে এসেছে। আজকের দিনে পৃথিবীকে জয় করা গিয়েছে অবিশ্বাস্যভাবে, উৎপাদনের উপায়ে দেখা গিয়েছে কল্পনারও অতীত উন্নতি। সেই উন্নতি যদি সত্যিই মানুষের সেবায় নিযুক্ত করা হয় তাহলে পৃথিবীর কোথাও একটিও অভুক্ত মানুষ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না। শুধু তাই নয়, সোবিয়েৎ বিজ্ঞানী হিসেব করে বলেছেন যে, আজকের দিনে বিজ্ঞান সম্মত উৎপাদনের উপায়ে যতখানি উন্নতি লাভ হয়েছে শুধু সেইটুকুর উপর নির্ভর করলেই পৃথিবীতে যতখানি খাবার তৈরি হবে তাই দিয়ে অন্তত ৬৬০ কোটি মানুষের পেট ভরবে সচ্ছলভাবেই। আজকের পৃথিবীতেই জনসংখ্যা ২২০ কোটি। তার মানে, রাতারাতি যদি মানুষের সংখ্যা তিনগুনও বেড়ে যায় এবং যদি বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থাকেই নিয়োগ করা হয় মানুষের কল্যাণ-সাধনে তাহলেও খাবারের টান পড়বার প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া, আগামী কাল বিজ্ঞান অগ্রগতির

কোন চূড়োয় পৌঁছবে তাও আন্দাজ করতে পারা সহজ নয়।

তবুও, বাস্তবকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। বাস্তব ঘটনা হলো পৃথিবীতে ২২০ কোটি মানুষের মধ্যে বড় জোর ৯০ কোটি মানুষ ত্ব'বেলা পেট ভরে খেতে পায়। বাকি মানুষের—অর্ধেকের বেশি মানুষের—কপালে সত্যিই পর্যাপ্ত খাবার জোটে না। তিনগুণ খাবারের যোগান রয়েছে তবুও মানুষ খেতে পাচ্ছে না কেন? প্রাচুর্যের মধ্যেও কেন এমন হাহাকার? সোবিয়েতের কাছে এই প্রশ্নের জবাবটা খুবই ঘরোয়া, কেননা ওদের দেশে যে নতুন সভ্যতা তার ভিৎ গাঁথা হয়েছে এই প্রশ্নের জবাবটার উপর নির্ভর করেই। বাকি তুনিয়ার উৎপাদনের .উপায়গুলির উপর ব্যক্তিগত মানুষের মালিকানা, আর মালিকদের পক্ষে উৎপাদনের কাছ থেকে একমাত্র চাহিদা হলো মুনাফা। বাকি তুনিয়ার উৎপাদন চলেছে ব্যক্তিগত মালিকদের মুনাফা জোটাবার জন্যে, জনসাধারণের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে নয়। তাই, মানুষের পক্ষে কতখানি কি দরকার সে-হিসেবের ভিত্তিতে উৎপাদন চলে না। উৎপাদন চলে অন্য এক হিসেবের খাতিরে—কেমন করে ব্যক্তিগত মালিকদের সবচেয়ে বেশি মুনাফা যোগান সম্ভব। বিজ্ঞানের হাতিয়ারের সাহায্যে যতখানি জিনিস তৈরি করে ফেলা সম্ভব তা তৈরি করে ফেলা মালিকদের পক্ষে লোকসানের কথা। কেননা, এটুকু তো সকলেই জানেন যে, বাজারে মাল বেশি জমলে মালের দর পড়ে যায়, মুনাফায় ভাটা পড়ে। তাই মাঝে মাঝে মালিকেরা যখন দেখেন অত্যন্ত বেশি জিনিস তৈরি হয়ে গিয়েছে তখন তাঁরা সেই জিনিস পুড়িয়ে ফেলতে বা সমুদ্রে বিসর্জন দিতে বাধ্য হন। সোবিয়েতের লোকেরা জানে উৎপাদনের উপায়গুলিকে মুনাফা যোগান দেবার কাজে যতদিন বেঁধে রাখা হবে ততদিন প্রাচুর্যের সম্ভাবনা সত্ত্বেও মানুষের তুঃখ ঘুচবে না। ওরা তাই, সমাজ ব্যবস্থার এমন বদল করেছে যার দরুন উৎপাদনের উপায়গুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকের মুনাফালোভী সংকীর্ণতা আর থাকবে না, উৎপাদন হবে মানুষের প্রয়োজন মেটাবার পরিকল্পনা অনুসারে। সমাজ-ব্যবস্থায় এই বদলটুকুর নামই হলো সমাজতন্ত্র।

আজকের পৃথিবী পরিষ্কার দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। একদিকে আদর্শটা হলো সমাজতন্ত্রের আদর্শ; উৎপাদনের উপায়গুলিকে মানুষের প্রয়োজন মেটাবার কাজে নিযুক্ত করবার আদর্শ। আর একদিকের আদর্শ হলো ব্যক্তিগত মালিকদের মুনাফা যোগান দেবার আদর্শ।

একদিকে জীবনের আদর্শ, একদিকে মৃত্যুর। যেদিকে জীবনের আদর্শ সেদিকে নবজাতকের আগমন আনন্দধ্বনি তোলে। জন্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে সাধারণের মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহ এই মহলে থাকবারই কথা নয়। জনসংখ্যা হ্রাসের উপর দেশের কল্যাণ নির্ভর করছে এমনতর অবৈজ্ঞানিক প্রচারে আকাশ বাতাস মুখর নয় ওদের দেশে।

পৃথিবীর অন্য মহলে আদর্শটা হলো মৃত্যুর আদর্শ। এই মহলে উৎপাদনের উপায়গুলি মুনাফার ঘানিতে বাঁধা। তাই অভুক্ত মানুষের মিছিল। আর এই মিছিল পাছে শোষকশ্রেণীকে উপড়ে ফেলে এই ভয়ে শোষকশ্রেণীর পোষা 'পণ্ডিতেরা' আকাশ-বাতাসকে মুখর করে তুলেছেন একটি তথাকথিত 'বৈজ্ঞানিক' মতবাদ দিয়ে—জনসংখ্যা না কমলে মানুষের কল্যাণ নেই, জনসংখ্যা কমাতে হবে যেমন করেই হোক। তার জন্যে বিধাতার আশীর্বাদ হিসেবে দুর্ভিক্ষ আর মহামারী আর মহাযুদ্ধ তো চলেছেই; তার উপর চাই গর্ভনিয়ন্ত্রণ। দুনিয়ার এই মহলটায় তাই গর্ভনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে মাত্রারিক্ত উৎসাহ; জীবনকে কোনোমতে অভাব আর অভিযোগের ছাঁচে ঢেলে রাখবার উৎসাহ।

দশম পরিচ্ছেদ

স্বামী-স্ত্রী

কপালে টুকটুকে লাল টিপ, সিঁথিতে জ্বলজ্বলে সিঁদুর। বিকেল বেলায় গা ধুয়েছে। ধোয়া লালপেড়ে শাড়ি। গায়ে-মাখা সাবানের চাপা গন্ধ। বিকেলে জলখাবার তৈরি করেছে, তার মধ্যে কিছুটা বৈচিত্র্য এনেছে,—যতটা আনা যায়। বুক ভরা দরদ, প্রতিটি খুঁটিনাটির মধ্যে ওই দরদের স্বাক্ষর।

স্বামী আপিস থেকে ফিরবেন। সত্যিই তো সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি। লোকটার দিকে চাইলে মমতায় চোখ ভরে যায়। চায়ের জল চাপিয়ে দিয়ে হাত-পাখা হাতে কাছে বসা। গায়ে-মাখা সাবানের চাপা গন্ধ, ধোয়া শাড়ি, কপালে টুকটুকে লাল টিপ। জলখাবারের রেকাব। সব কিছুর মধ্যে স্নিগ্ধতার চিহ্ন। হাড়ভাঙা খাটুনির পর লোকটা ঘরে এল, লোকটাকে স্নিগ্ধ করতে হবে বই কি। হয়তো উপরিওয়ালার কাছে তার আত্মসম্মান মলিন হয়েছে, মুখ বুজে সইতে হয়েছে, জবাব দেওয়া চলে না। মনটা ছটফট করে গ্লানির চাপে। সেই চাপ খানিকটা হালকা করতে হয় বাড়ি ফিরে স্ত্রীর কাছে আপিসের গল্প বলে; উপরিওয়ালাকে কি রকম জোর দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছে, বুঝিয়ে দিয়েছে ওর সঙ্গে চালাকি নয়। সমস্তটুকুই করুণ ইচ্ছাপূরণ। তাছাড়া ডালহৌসী স্কোয়ারের নৈমিত্তিক একঘেয়েমীর মধ্যে কোথায় যেন কী একটা ব্যাপার হয়েছে, এমনিতে হয়তো তুচ্ছ, তবু তারই রোমাঞ্চকর গল্প।

অবাক বিস্ময়ে সেই গল্প শুনতে হয়। স্বামীকে একটু স্নিগ্ধ করবার এও একটা উপায়। লোকটাকে দেখলে বড় মায়া হয় যে! সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি। তাছাড়া টাকা,—টাকা রোজগারের সবটুকু দায়ই যে বেচারার ওপর। দুপুর বেলায় কী-ই বা টিফিন করেছে কে জানে! কী-ই বা পাওয়া যায় ওসব পাড়ায়! বিকেলের জলখাবারে তাই যতটুকু বৈচিত্র্য আনা সম্ভব তারই চেষ্টা।

আমি বলতে চাই সাধারণ বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনে এই ছবিকেই আদর্শ ছবি বলে মানবার অভ্যাস। আদর্শ স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক। অবশ্যই এটা নিম্নমধ্যবিত্তের জীবনে নয়; সেখানের বাস্তবটা বড় বেশি নোংরা, বড় বেশি ক্লান্তিকর; তাই সেখানে এমনতরো কোনো কল্পনা নিয়ে বিলাস করবার অবসরটুকুও নেই। তাই নিম্নমধ্যবিত্তের কথাটা এখানে না তোলাই ভালো। মোটামুটি, তিন শ' থেকে সাত শ' যাদের বেতন,—অর্থাৎ কিনা, যাঁরা হলেন আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের মাথার মতো—আপাতত সেই সব ঘরের কথা মনে রেখেই আলোচনাটা তুলছি। আর, সেই সব ঘরের আদর্শ ছবি হলো ওই ছবিই: বিকেলের মুখে গা ধোয়া, ধোয়া লালপেড়ে কাপড়, কপালে জ্বলজ্বলে একটি টিপ, গায়ে-মাখা সাবানের চাপা গন্ধ, হাত-পাখা হাতে শ্রান্ত স্বামীর মুখে তার অলীক ইচ্ছাপূরণের গল্প শোনা, শুনতে শুনতে বিস্ময়ে অবাক হওয়া।

এ ছবির মধ্যে মাধুর্যের চিহ্ন আছে কিনা তা অবশ্যই অন্য কথা। এই ছবি নিয়ে পদ্য-টদ্য লেখা যায় নিশ্চয়ই। সেই পদ্যে মেয়েটিকে কল্যাণী বলে বর্ণনা। কল্যাণী কথাটা বেশ মিষ্টি। এই ছবি নিয়ে বায়েস্কোপও ফাঁদা যায়; হিন্দি হলে বায়েস্কোপটার নাম দেওয়া যায় "ঘর কি রাণী", বা ওই রকম লাগসই আর একটা কোনো নাম। হিন্দি বায়েস্কোপের গল্পটাও বেশ আঁচ করা যাচ্ছে: আমাদের ওই আপিসের সেজবাবু, তিন শ' থেকে সাত শ'র মধ্যে যার বেতন, সে হয়তো কোনো চটুল ফিরিঙ্গি টাইপিস্ট মেয়ের মোহে পড়লো। লোকটা ঘুরে বেড়ায় তার পেছু পেছু, নেশার ঘোরের মতো। এদিকে আমাদের ঘর কি রাণী বিকেল বেলায় হাত-পাখা হাতে শূন্যঘরে বসে থাকে, নির্জনে একাএকা চোখের জল ফেলে, মাথা কোটে বিধাতার পায়ে। এমনিভাবেই দিন কাটতে থাকে। ছবিটা দেখতে দেখতে দর্শকদের মন ওই ফিরিঙ্গি মেয়ে সম্বন্ধে একেবারে বিষাক্ত হয়ে উঠবে, তাদের ইচ্ছে হবে পর্দার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘর কি রাণীর মাথায় হাত বুলিয়ে একটু সান্ত্বনা দিয়ে আসতে, অনেক দর্শকই হয় তো তার সঙ্গে মনে মনে দিদি সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলবে। ঘুরে চলবে সেলুলয়েডের ফিতে, নানান রকম বৈচিত্র্য আর রোমাঞ্চকর

পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। কী যে হবে ঠিক আন্দাজ করা যাবে না। প্রতি পদে মনে হবে, চুরমার হয়ে গেলো বুঝি অমন আদর্শ স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের ছবি; সেন্সারে যদি না আটকায় তাহলে হয়তো সেজবাবুটি দু' একবার ঘর কী রাণীর গায়ে হাত তোলবার উপক্রম পর্যন্ত করবে! তারপর? তারপর একদিন অনেক রাত্তিরে আমাদের ওই সেজবাবুটি—তিন শ' থেকে সাত শ'র মধ্যে যার বেতন—হয়তো টলতে টলতে বাড়ি ফিরবে। প্রথমটায় দর্শকদের মনে হবে নেশা করে ফিরছে, দর্শকেরা মুঠো শক্ত করবে। কিন্তু একটু পরেই বোঝা যাবে, তা নয়। নেশা নয়। জ্বর। দারুণ জ্বর। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে যেন, লোকটা আর দাঁড়াতে পারছে না, তাই টলছে। নেশা নয়। হয়তো খুব একটা ক্লোজ-আপ্। দেখা যাবে থার্মোমিটারে পারাটা তরতর করে উঠে যাচ্ছে! তারপর ক্যামেরা ট্রাক ব্যাক: আস্তে আস্তে প্রকাশিত হবে ঘর কি রাণীর হাত, থরথর করে কাঁপছে থার্মোমিটারটা ধরে। তারপর সেবা। ওরে বাস রে! সে কী সেবা! দিন নেই, রাত নেই! রাত নেই, দিন নেই। বাড়া ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যায়, ঠাণ্ডা ভাত ফেলে দেওয়া হয়। একদিন হয়তো বিকারের ঝোঁকে সেজবাবু কী যেন বলছেন। কান পেতে শোনে ঘর কী রাণী। আর, শুনতে শুনতে তার চোখ মুখ থেকে সমস্ত রাতজাগার কালি মুহূর্তে মুছে যায়, উজ্জ্বল হয়ে উঠে তার ক্লান্ত মুখ। সেজবাবু বলছে, আসলে ঘর কী রাণীর দিকেই তার প্রাণের মোহাব্বৎ, ওই ফিরিঙ্গি মেয়ের দিকে শুধু আঁখির মোহ। দর্শকেরা হাততালি দেবো-দেবো করে ওঠে। কিন্তু এখুনি হাততালি দিয়ে ফেলা নয়। ধৈর্য ধরতে হবে। একদিন দেখা যাবে, ডাক্তার ঘুরে দাঁড়িয়ে বলছে আর ভয় নেই। আর তারপর ক্যামেরা ঘুরিয়ে সেজ সাহেব। সেজ সাহেব আস্তে আস্তে চোখ খুললো, তারপর খুব গদগদ মুখ করে ঘর কী রাণীর হাতটা টেনে নিলো নিজের বুকের মধ্যে। ঘর কী রাণী মাথার শিয়রে বসে পাখা করছিলো; হাত-পাখাটা খসে পড়লো মেঝেতে আর ক্যামেরা হটে এসে অভ্রান্তভাবে প্রমাণ করে দিলো এই সেই হাত-পাখা যা হাতে ঘর কী রাণী রোজ বিকেলে জলখাবার গুছিয়ে সেজ সাহেবের জন্য

অপেক্ষা করতো : বিকেল বিকেল গা ধুয়েছে, ধোয়া লালপেড়ে শাড়ি, কপালে টকটকে একটা টিপ, গায়ে-মাখা সাবনের চাপা গন্ধ, আর অবাক বিস্ময়ে বড় বড় চোখ তুলে স্বামীর মুখ থেকে চাকুরে-পাড়ার রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনছে!

এই তো আমাদের আদর্শ স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের ছবি। আর আমি বলতে চাই, এই ছবির আগাগোড়াই একটা নির্মম প্রহসন যেন! কেননা, এই ছবির মোট কথাটা হলো স্ত্রী একটি মূক পশু মাত্র। স্বামীর মনোনয়ন করা ছাড়া, স্বামীকে স্নিগ্ধ করা, শান্ত করা ছাড়া তার সত্তার আর কোনো দিকই নেই। তার মানে নিশ্চয়ই ভালোবাসাটা বর্বরতা নয়, স্নিগ্ধ শান্ত সংসারটা বর্বরতা নয়। তবু ওই মূক পশুর মতো বেঁচে থাকাটা বর্বরতাই। মূক পশুর মতো কেন বলছি? কেননা, এই ছবির মধ্যে স্ত্রীকে যে ভাবে দেখা তা বৃহত্তর সমাজ-জীবনের কোনো অঙ্গ হিসেবে নয়, আর সমাজ-জীবনের অঙ্গ নয় বলেই তার মধ্যে মর্যাদার কোনো ছিঁটেফোঁটা নেই। ঘরসংসারের সংকীর্ণ গণ্ডিটুকু দিয়ে ঘেরা একটা পৃথক, একটা স্বতন্ত্র জগৎ যেন। বৃহত্তর সমাজ-জীবনের সঙ্গে স্ত্রীর যেটুকু পরিচয় তা স্বামীর ওই আপিস-পাড়ার গল্পগুলির মধ্যস্থতাতেই! তার মধ্যেও তো আবার চোদ্দ আনাই ইচ্ছাপূরণ। তাই ঘরসংসারের সংকীর্ণ গণ্ডিটুকু থেকে বেরিয়ে সে যদি কোনোদিন স্বামীর পেছু পেছু বাসে উঠতে যায় তাহলে বাসওয়ালা বিকৃত গলায় চিৎকার করে উঠবে: মেয়েছেলে উঠছে, একদম বেঁধে! স্বামীর পেছু পেছু সে যখন বাস থেকে নামবে তখন আবার শোনা যাবে বিকৃত গলায় চিৎকার: মেয়েছেলে নামছে, একদম বেঁধে। তার মানে বাসের মধ্যে, যেখানে কাজের মানুষের কাঁধ ঘেঁষা-ঘেঁষি, সেখানে মেয়েছেলে বলে জিনিসটা নেহাতই খাপছাড়া একরকমের জিনিস—তার আবির্ভাব তিরোভাব নিয়ে অমন উচ্চ কণ্ঠের ঘোষণা লাগে! মেয়েছেলে: তার মানেই হলো সমাজের স্বাভাবিক কর্মজীবনের মধ্যে তার স্থান নেই। কোনো মেয়ে যদি জোর করে স্বাভাবিক কর্মজীবনের মধ্যে তার স্থান করে নিতে চায় তাহলে আশপাশটা, পারিপার্শ্বিকটা কেমন যেন উসখুস করে ওঠে। ধরুন, কলেজস্ট্রীটের এক জায়গায় বাস দাঁড়ালো,

মেডিকেল কলেজ থেকে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে, তার হাতে একটা ডাক্তারী যন্ত্র। ভিড় ঠেলে মেয়েটি বাসে উঠলো। তার জন্যে বসবার জায়গাটা আলাদা—মেয়েছেলেদের সিট। হয়তো এই মেয়েছেলেদের আসনটিতে সে একা, পাশে অনেকখানি বসবার জায়গা খালি পড়ে। বাসে ভিড়। তাই পাশের জায়গা দেখিয়ে মেয়েটি ভিড়ের কাউকে বললো : বসতে পারেন।

ভিড়ের মধ্যে ভদ্রলোকেরা উসখুস করে উঠবেন। মেয়েটি নিশ্চয়ই খারাপ। স্বভাব চরিত্র খারাপ। অসতী। খুব অসতী।

নিশ্চয়ই অসতী।

জোর করে সে সামাজিক কর্মজীবনের মধ্যে পা বাড়াতে চেয়েছে, হাতে তার ডাক্তারী যন্ত্রপাতি। জোর করে সে বাকি পাঁচজন মানুষের সঙ্গে সমান আসনে বসতে চেয়েছে, খেয়াল নেই সে আসলে মেয়েমানুষ—তার মানে পুরো মানুষ নয়। সতীত্বের আদর্শটা বজায় রইল কোথায়? আমাদের ইতিহাসটার দিকে একবার পিছন ফিরে দেখুন। স্বামীর অপমান হলে প্রাণ দেওয়া, তার নাম সতীত্ব। স্বামীর মরণ হলে সহমরণে যাওয়া, তার নাম সতীত্ব। তার মানে সামাজিকভাবে তার নিজের কোনো মান অপমানের প্রশ্ন ওঠে না, এমন কি প্রশ্ন ওঠে না নিজে নিজে বেঁচে থাকবার। আর তার মানে, ওই যে মেয়েটি জোর করে সামাজিক মেহনত-জীবনের দিকে পা বাড়িয়েছে, জোর করে আর পাঁচজন মানুষের সঙ্গে সমান আসনে বসতে চেয়েছে,—ওর মধ্যে সত্যিই সেই সতীত্বের আদর্শটা নেই। আশেপাশের ভদ্রলোকেরা সমালোচনায় উসখুস করে উঠবেন বই কি। অসতী খুব অসতী।

আর তা ছাড়া, স্বভাব চরিত্রও খারাপ। খুব খারাপ। এটাও আসলে একই কথা, কেবল একটু ঘুরিয়ে বলা—এই যা; কেননা, আমাদের দেশের আইনকর্তারা বলছেন, মেয়েমানুষ ঠিক পুরো মানুষ নয়, আর পাঁচ রকম উৎপাদনের উপায়ের মতো এক রকম উৎপাদনের উপায় মাত্র। তার মানে, হাল লাঙ্গলের মতো, তাঁত হাপরের মতো, গোয়ালের গরুর মতো। আর তাই, উৎপাদন যাতে বিশুদ্ধ থাকে সেই জন্যে যত্ন করে একে আগলে রাখতে হবে, সাধারণ মেহনত-জীবনের ভিড়ে যদি সে মিশে যায়

তা হলে উৎপাদনটা বিশুদ্ধ থাকবে না হয়তো, অর্থাৎ ভেজালের ভয়। চাণক্য বলছেন, পিণ্ডের জন্যে পুত্রের প্রয়োজন এবং পুত্র উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজন ভার্যার। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা, পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনম্। মানবধর্মকার মনু বলছেন, প্রজাবিশুদ্ধির জন্যে স্ত্রীকে যত্ন করে আগলে রাখবে। প্রজাবিশুদ্ধ্যর্থম্ স্ত্রীয়ং রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ। চরিত্র ভালো-খারাপের ওইটেই কিন্তু আসল মাপকাঠি: ওকে দিয়ে যে প্রজা উৎপাদন করা হবে তার মধ্যে কতখানি বিশুদ্ধি এবং কতখানি ভেজালের সম্ভাবনা। অন্তঃপুরের ভিতর শিকল তুলে রাখতে পারলে বিশুদ্ধির সম্ভাবনাটা ষোলো আনা, কিন্তু অন্তঃপুরের আগল খুলে পথে বেরুলে ভেজালের ভয়। তাই সন্দেহ করতে হয়, স্বভাব চরিত্র খারাপ। খুব খারাপ। খুব অসতী।

—হে ভারত, ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী—

আর আমি বলতে চাই, এই আদর্শটার চৌদ্দ আনা কথাই হলো মূক পশু করে রাখবার আদর্শ—প্রাণ আছে তবু উৎপাদনের উপায় হওয়া ছাড়া আর কোনো রকম সামাজিক মর্যাদা নেই। পোষা জানোয়ার। আর পাছে এই রকম মূক পশু হয়ে থাকতে নারাজ হয় সেই জন্যেই খুব ছোট বয়েস থেকে—যখন থেকে জ্ঞান হয়েছে তখন থেকে—শিবপুজো আর গরুপুজো করিয়ে মনটাকে পঙ্গু করে রাখা, অচল করে রাখা। সত্যিই কী আশ্চর্য আমাদের সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা-প্রবর্তকদের প্রতিভা! ভাবতে অবাক লাগে না কি? ছোটবেলা থেকেই মাটির ঢেলার সামনে আর জানোয়ারের সামনে মাথাটাকে এমনভাবে নুইয়ে রাখবার ব্যবস্থা যে ভবিষ্যতে সেই মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়ানো প্রায় অসম্ভবেরই সামিল। অন্তঃপুরের আগল খুলে বৃহত্তর সমাজ-জীবনের মধ্যে এগিয়ে আসবে কেমন করে? স্বপ্নচালিতের মতো স্বামীর চিতার দিকে পা চলবে না কেন? শুরু থেকেই যে মনটাকে মুচড়ে, দুমড়ে, একেবারে অন্য রকমের করে রাখা হয়েছে।

—হে ভারত, ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী—

আর আমিও বলতে চাই, তা ভোলা চলবে না। কেননা, ওই

কথাটা ভুলে গেলে আমাদের এতো দীর্ঘ দিনের পরাধীনতার একটা মস্ত বড় কারণকে ভুলে থাকা হবে যে! শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিদেশীরাজের পায়ের ধুলোয় মলিন হয়েছে আমাদের আত্মসম্মান, হাজার বছরের পুরোনো অচল খোঁটায় বাঁধা আমাদের ভাগ্য। কিন্তু কেন? আমাদের দশাটা এমনতরো হলো কেন? এ প্রশ্নের জবাবটা নিশ্চয়ই এক কথায় দেবার নয়। তবুও কিন্তু এই প্রশ্নের জবাব থেকে একটা কথা বাদ গেলেও চলবে না। সেটা হলো ওই নারীজাতির আদর্শ—সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। তার মানে, নারীজাতির ওই আদর্শটা শুধুই যে মেয়েদেরই অধম করে রেখেছে তাই নয়, পুরো দেশটাকেই করে রেখেছে অথর্ব, পঙ্গু। এই কথাটা বিশেষ করে মনে রাখা দরকার। মনে রাখা দরকার, এ দেশের দুরবস্থা দূর করতে হলে মেহনতী জনতাকে আগুয়ান হতে হবে, কিন্তু তার আধখানা যদি অন্তঃপুরে বন্দী থাকে তাহলে এই জনতার শক্তি অনেকাংশেই কাজে আসবে না। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের যাঁরা প্রচারক তাঁরা তাই বারবার নারী আন্দোলনের কথা তোলেন। সেটা যে মেয়েদের প্রতি নিছক ভাবালু দরদ তা নয়। বিজ্ঞানের হিসেব। দেশের সাধারণ মানুষ নিপীড়িত, মেয়েদের উপর কিন্তু দ্বিগুণ পীড়ন। তাই নিপীড়িত জনতা নতুন সমাজ ব্যবস্থার পথে এগুতে চাইলে মেয়েদের উপর থেকে প্রাথমিক পীড়নের চাপটা সরাতে হবে। তাতে মেহনতী জনতার শক্তি দ্বিগুণ হবে না কি?

আমাদের দেশের আদর্শে সামাজিক মেহনতের মধ্যে মেয়েদের কোনো প্রতিষ্ঠা নেই। মেয়েরা তাই মূক পশুর মতো। তার মানে, তাদের ঘাড়ের উপর পরিশ্রমের দায় যে নেই তা নয়। বরং হাড়ভাঙা খাটুনিই। কিন্তু সামাজিকভাবে এই পরিশ্রমের মর্যাদা নেই। অন্দরের সংকীর্ণ গণ্ডি দিয়ে এই পরিশ্রমকে স্বতন্ত্র করে রাখা হয়েছে, বাকি সমাজটা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। তাই এ পরিশ্রম সামাজিক মেহনতের মর্যাদা পায় না। খাটতে খাটতে গা গতর ছেঁচে গেলেও তার প্রতি সমাজের শ্রদ্ধা নেই, সামাজিক-ভাবে তাকে স্বীকার করার পথ নেই। সারাদিনের পর বাড়ির কর্তা যখন বাড়ি ফেরেন তখন তাঁকে শান্ত করবার নানান

আয়োজন। তার মানে আপিসের খাটুনি যে খাটুনি হিসেবে বেশি তা নয়; হয়তো অন্তঃপুরের খাটুনির চেয়ে কমই। কিন্তু এই আপিসের খাটুনিরও মর্যাদা অনেক বেশি, সমাজ একে স্বীকার করেছে, এর জন্যে নগদ বিদায় দিচ্ছে।

আর এই সামাজিক মেহনত থেকে বিচ্ছিন্ন বলেই মেয়েরা ঠিক মানুষ নয়,—মেয়েমানুষ, আধখানা মানুষ। কেননা, মানুষের সঙ্গে পশুর যেটা মোট তফাত সেটা সমাজ-জীবনের দিক থেকেই তফাত। পশুরা দল পাকিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সমাজ গড়তে পারে না। কিন্তু মানুষ কেমন করে শিখলো সমাজ গড়তে? সমাজতত্ত্বের আলোচনায় এ নিয়ে অনেক রকম ভুল-নির্ভুল মতবাদ। নির্ভুল মতবাদটা হলো, মেহনতের কথা। মানুষ মেহনত করতে শিখেছে, শিখেছে পৃথিবীর সঙ্গে সংগ্রাম করতে। পৃথিবীর মুখ চেয়ে বাঁচা নয়, পৃথিবীর কাছ থেকে নিজেদের দরকার মতো জিনিস আদায় করে নেওয়া। মানুষের হাত স্ববশ, হাতিয়ার স্ববশ। বস্তুত, পশুর সঙ্গে মানুষের যতো রকম তফাত তার মূলে শেষ পর্যন্ত এই হাত-হাতিয়ারের কথাই, এই সচেতন মেহনতের কথাই। মানুষের এতো বুদ্ধি, এতো জ্ঞান, এমন আশ্চর্য শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস,—এ সবের মূলেই শেষ পর্যন্ত ওই হাত, ওই হাতিয়ার, ওই সচেতন মেহনত। এ কথার সমর্থনে সমাজতত্ত্বের অনেক রকম নজির আছে। নজিরগুলির কথা পাড়তে গেলে স্বতন্ত্র আলোচনায় গিয়ে পড়তে হবে। অন্য প্রবন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু সমাজতত্ত্বের এই মূল সত্যটিকে মনে রেখে আপনি এবার ওই স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের ছবিটা বিচার করুন। ওর মধ্যে যে মেয়েটির ছবি তাকে কি আপনি ষোলো আনা মানুষ বলতে পারেন? কেমন করে পারবেন? মেহনতই মানুষকে মানুষ করেছে, অথচ এই মেয়েটির মধ্যে সামাজিক মেহনতের মর্যাদা নেই। তা নেই বলেই তার নেই মানুষের মর্যাদাও। হাঁড়ি হেঁসেল নিয়ে গতর ক্ষোয়াবার কথাটা বলছি না, কেননা সেই গতর ক্ষোয়ানোটাকে সমাজ থেকে যেন আলাদা করে রাখা, তাকে কোনো রকম মর্যাদা দেওয়া নয়। বৃহত্তর সমাজ-জীবন যে মেহনতকে মেহনত বলে জেনেছেন, যার জন্যে নগদ বিদায় পাওয়া যায়, সেই মেহনতের

কথা বলছি। সেই মেহনতের জীবনে মেয়েটির নিজের কোনো স্থান নেই। স্বামীর মুখ থেকে সেই মেহনত জীবনের কথা শুধু কানে শোনা। রূপকথা শোনবার মতো। মর্যাদা নেই তাই। ঠিক মানুষ নয়। পুরো মানুষ নয়। নেহাতই মেয়েমানুষ। সে যখন জন্মাবে তখন শাঁখ বাজবে না।

মেহনতকারী মানুষ নতুন সমাজ গড়বে। পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী। কিন্তু মেহনতকারী মানুষের আধখানা অংশকে যদি এমনি করে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর আদর্শের গণ্ডি দিয়ে আলাদা করে রাখা হয়, তাহলে তাতে যে শুধুই মেয়েদের আত্মসম্মান চিরকাল পঙ্গু হয়ে থাকবে তাই নয়, মেহনতকারী মানুষের পুরো দলটারও। তাই, এ আদর্শের বিরুদ্ধে শুধু যে মেয়েদের অভিযান তাই নয়, মেহনতকারী মানুষের মিলিত অভিযান হওয়া চাই।

স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের কথাটা ভাবতে গেলে সর্বপ্রথমে ভাবা দরকার মানুষের কথা। দু'জনেই মানুষ। স্বামীও, স্ত্রীও। তা নইলে, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক তো আর মানুষে-মানুষে সম্পর্ক হবে না। তার মানেই কিন্তু এমন দু'জনের কথা ভেবে দেখতে হবে যাদের আছে মেহনতের মর্যাদা। সামাজিকভাবে স্বীকার করা হয়েছে যে মেহনতকে। তার মানেই কিন্তু শুধু ওই নারীজাতির আদর্শকে পরিহার করবার কথা নয়, বর্তমান সমাজের কাঠামোটাও বদল করবার কথা। কেননা, সমাজের এই কাঠামোয় নারীজাতিকে সামাজিকভাবে মেহনতের মর্যাদা দেবার অবসর নেই। আদর্শ স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের আলোচনা তাই শেষ পর্যন্ত সমাজ বিপ্লবের প্রসঙ্গে না গড়িয়ে পারে না।

পাছে কেউ ভুল বোঝেন এই ভয়ে এখানে একটা কথা খুব পরিষ্কার করে বলতে চাই।

আমাদের দেশে বাস্তব বিবাহ-সম্পর্কের তীব্র সমালোচনা করা হলো। কিন্তু তার উদ্দেশ্য কি এই যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা, মমতা, বা নিষ্ঠার দিকটাকে তুচ্ছ করা দরকার? নিশ্চয়ই নয়। বিবাহিত জীবনকে ভাঙবার তাগিদে এই সমালোচনা নিশ্চয়ই নয়। বরং ঠিক তার উল্টো কথাই। বর্তমান পরিস্থিতিতে—মেয়েরা যতোদিন না সমাজিক শ্রমের স্বাভাবিক

মর্যাদা পাচ্ছে,—ততোদিন পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা, মমতা বা নিষ্ঠা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠবার পথে দারুণ বাধা থেকে যাচ্ছে। সেই বাধাটা দূর করবার আশাতেই এই সমালোচনা।

কিসের বাধা? আমাদের দেশের পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বাধা। বিদেশী শাসক এই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাটাকেই টিকিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছিল। শোষণের স্বার্থে।

তার মানে স্নেহ মমতা মাধুর্য—যে-কোনো কথাই ভাবুন না কেন, নিছক হৃদয়বৃত্তি বলে এগুলিকে কল্পনা করা চলবে না। কেননা, হৃদয়বৃত্তি হলেও হাজার হোক মানুষেরই হৃদয়বৃত্তি এবং সে-মানুষ সমাজেরই জীব। তাই সমাজ যদি মানুষকে পঙ্গু করে, খর্ব করে রাখতে চায় তাহলে এই হৃদয়বৃত্তিগুলিও পঙ্গু ও খর্ব হয়ে যেতে বাধ্য। ব্যক্তিগত মানসিক চেষ্টাটা তাই এ-ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত সফল না হতেও পারে।

স্নেহ, প্রেম, মাধুর্য—হৃদয়বৃত্তি হিসেবে নিশ্চয়ই দুর্মূল্য। কিন্তু সেগুলির পূর্ণ চরিতার্থতার জন্যে বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া দরকার। আমাদের দেশে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক প্রসঙ্গে সেই বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি করা বলতে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপূর্ণ উচ্ছেদই বুঝাতে চাই।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজের উচ্ছেদ প্রসঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতন সংগ্রামের কথাও ওঠে। আর, বর্তমান সমালোচনার উদ্দেশ্য ওই সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কারই।

উদ্দেশ্যটা তাই বিবাহ-সম্পর্কে ভাঙন ধরানো নিশ্চয়ই নয়। তার বদলে, বিবাহ-সম্পর্ককে আরো মজবুত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করবার কথাই। মজবুত ভিত্তি বলতে, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ করে মেয়েদের ফিরিয়ে দেওয়া স্বাভাবিক শ্রমের মর্যাদা।

তার মানে আমি বলতে চাই আদর্শ স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের প্রসঙ্গটা আসলে মনস্তত্ত্বের প্রসঙ্গ নয়, শেষ পর্যন্ত সমাজতত্ত্বের প্রসঙ্গই। কিম্বা, মনস্তত্ত্বের সমস্যা হিসেবেই যদি একে দেখতে চান তাহলেও মনে রাখবেন, মানুষের মন বলে ব্যাপারটা হাওয়া থেকে জন্মায় না, আকাশ থেকে আজব চিড়িয়ার মতো উড়ে আসে না। বাস্তব সমাজ ব্যবস্থা থেকেই তার জন্ম, বাস্তব সমাজ ব্যবস্থার উপরই তার স্থিতি, বাস্তব সমাজ ব্যবস্থাকে বদল করার মধ্যেই তাকে বদল

করবার পথ। তাই ঘুরে ফিরে, সমাজতত্ত্বের আলোচনা ওঠে, সমাজ বিপ্লবের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। আর সেই আলোচনা বাদ দিয়ে, সেই প্রসঙ্গকে এড়িয়ে গিয়ে, মনস্তত্ত্বের কতকগুলো সৌখিন কথাবার্তা বলে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক নিয়ে আদর্শ কোনো পথ নির্দেশ করতে যাওয়া আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছু নয়। এ-রকম প্রবঞ্চনার পথ যদি দেখতে চান তাহলে কিছু মার্কিন সাময়িক পত্রিকা সংগ্রহ করুন। আজকের দিনে আমাদের শহরে সেই রকম পত্রিকার অজস্র আমদানি, রাজপথ দিয়ে হেঁটে গেলে দু'পাশাড়ি চোখে পড়বে। দেখবেন হরেক রকম মন ভোলানো রঙ-এর মলাট পরে পত্রিকাগুলি আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। মলাট উল্টালে দেখা যায় প্রবঞ্চনার কায়দা কানুনটা কী রসালো!

কিন্তু যদি নিজেকে বঞ্চনা করতে উৎসাহ না থাকে তাহলে চীন দেশের আধুনিক দলিলটার দিকে ফিরে তাকাতে হবে। আমাদেরই মতো পেছিয়ে পড়া দশা ছিলো ওদের দেশের। আমাদের দেশের মতোই ওদের দেশেও নারীজাতির আদর্শ, সেই আদর্শের বোঝা চাপিয়ে মেয়েদের অথর্ব করে রাখা, মানুষের অধম করে রাখা। সেই আদর্শের গণ্ডি দিয়ে ঘেরা সংকীর্ণ জগৎটুকুর মধ্যে মেয়েদের হাড়ভাঙা খাটুনি। অমানুষিক খাটুনি। কিন্তু সামাজিকভাবে সে খাটুনির মর্যাদা নেই।

কিন্তু আজকের দিনে প্রপিতামহদের ভূতে পাওয়া ওই ভাগ্যকে ঝেড়ে ফেলে জেগে উঠেছে চীন। মহাচীন। পঞ্চাশ কোটি মানুষের ওই দেশ। মেয়েরা পেয়েছে মেহনতের মর্যাদা, সামাজিক মর্যাদা। আর তাই, আদর্শ স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের বাস্তব ভিত্তি স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।

আজকের চীন দেশে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের বাস্তব ভিত্তিটাকে বদল করবার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক নিয়ে আইনকানুন-গুলিতেও আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

কী রকম বদল হলো আইনকানুনগুলিতে?

১৯৫০ সালে ১লা মে চীন দেশে বিবাহ ও বিচ্ছেদ সংক্রান্ত সম্পূর্ণ নতুন আইন প্রচলিত হয়েছে। সেই নতুন আইনের তর্জমা:

চীন জনগণের প্রজাতন্ত্রে (Peoples' Republic)
বিবাহ সংক্রান্ত আইন

প্রথম পরিচ্ছেদ : সাধারণ মূলসূত্র

ধারা : ১—নারীর উপর পুরুষের প্রাধান্য এবং সন্তানের স্বার্থ সম্বন্ধে উদাসীনতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অর্থহীন ও বাধ্যতামূলক সামন্ততান্ত্রিক বিবাহ পদ্ধতি উচ্ছেদ করা হবে।

সহচর বাছাই করবার স্বাধীনতা, একবিবাহ, নরনারীর সমান অধিকার, এবং নারী ও সন্তানের আইনসঙ্গত স্বার্থরক্ষার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নতুন গণতান্ত্রিক বিবাহ পদ্ধতি প্রবর্তিত করা হবে।

ধারা : ২—বহু বিবাহ, উপপত্নি প্রথা, শিশু বিবাহ (বাক্‌দান), বিধবা বিবাহে বাধা দেওয়া এবং বিবাহ প্রসঙ্গে টাকা বা উপহার আদায় করা নিষিদ্ধ হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বিবাহ চুক্তি

ধারা : ৩—দুই পক্ষের সম্পূর্ণ সম্মতির ভিত্তিতে বিয়ে হবে। কোনো পক্ষই জোরজার করতে পারবে না এবং কোনো তৃতীয় পক্ষ এর মধ্যে মাথা গলাতে পারবে না।

ধারা : ৪—পুরুষের বয়েস ২০ এবং মেয়ের বয়েস ১৮ হবার পরই বিবাহ চুক্তি সম্ভব হবে।

ধারা : ৫—নিম্নোক্ত কোনো নারী বা কোনো পুরুষই বিয়ে করতে পারবে না :

(ক) স্ত্রী এবং পুরুষ যদি এক বংশসম্ভূত হয় এবং তাদের মধ্যে যদি রক্তের সম্পর্ক থাকে, কিম্বা স্ত্রী ও পুরুষ যদি একই পিতামাতার সন্তান হিসাবে ভাই বোন হয়, কিম্বা স্ত্রী এবং পুরুষ যদি সৎ ভাই ও সৎ বোন হয়। যেখানে সগোত্র-আত্মীয়তাটা পঞ্চম পর্যায়ে পৌঁছেছে সেখানে বিবাহের প্রশ্ন প্রচলিত আচার ব্যবহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

(খ) কোনো পক্ষ যদি শারীরিক অসুস্থতার দরুন যৌনশক্তি সম্পন্ন না হয়।

(গ) কোনো পক্ষ যদি উপদংশ, উন্মাদরোগ, কুষ্ঠ বা অন্য এমন কোনো রোগে আক্রান্ত হয় যার দরুন চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুসারে সে বিবাহের অযোগ্য।

ধারা ঃ ৬—যে এলাকা (sub-district) বা গ্রামে তাদের বাস সেখানকার গণ-সরকারের কাছে নিজেরা উপস্থিত হয়ে স্ত্রী এবং পুরুষকে বিবাহ চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হবে। এই আইনের ব্যবস্থার সঙ্গে বিয়েটাকে খাপ খেতে দেখলে স্থানীয় গণ-সরকার বিনা সময়পাতে বিবাহের নিদর্শন-পত্র মঞ্জুর করবে।

এই আইনের ব্যবস্থার সঙ্গে বিয়েটা খাপ খাচ্ছে না দেখলে রেজিস্ট্রারি মঞ্জুর করা হবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ স্বামী ও স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্য

ধারা ঃ ৭—স্বামী ও স্ত্রী সহচর হিসাবে একত্রে বাস করবে এবং সংসারে তাদের সমান মর্যাদা থাকবে।

ধারা ঃ ৮—স্বামী ও স্ত্রী কর্তব্যের দিক থেকে বাধ্য হবে পরস্পরকে ভালোবাসতে, শ্রদ্ধা করতে, সাহায্য করতে ও দেখাশুনো করতে, মিলেমিশে বাস করতে, উৎপাদনে নিযুক্ত হতে, সন্তানের যত্ন করতে এবং সংসারের মঙ্গল সাধনায় ও নতুন সমাজ গড়ে তোলবার কাজে তারা মিলিতভাবে সচেষ্ট হবে।

ধারা ঃ ৯—স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই স্বাধীনভাবে বৃত্তি নির্বাচন করতে পারবে এবং সামাজিক কাজ স্বাধীনভাবে করতে পারবে।

ধারা ঃ ১০—সংসারের সম্পত্তির উপর দখল ও ব্যবস্থা নির্ণয়ের দিক থেকে স্বামী ও স্ত্রীর সমান অধিকার থাকবে।

ধারা ঃ ১১—স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই নিজের পারিবারিক নাম (পদবী) ব্যবহার করতে পারবে।

ধারা ঃ ১২—স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই পরস্পরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্ক

ধারা ঃ ১৩—সন্তানদের প্রতিপালন করা ও শিক্ষা দেওয়া পিতামাতার কর্তব্য ; পিতামাতাকে সমর্থন করা ও সাহায্য করা সন্তানের কর্তব্য। পিতামাতা ও সন্তানেরা কেউই অপরের প্রতি দুর্ব্যবহার করবে না বা পরস্পরকে ত্যাগ করবে না !

এই ব্যবস্থা সৎ পিতামাতা ও সৎ সন্তানদের বেলাতেও প্রযোজ্য। জলে ডুবিয়ে শিশুহত্যা করা বা ওই জাতীয় অপরাধমূলক কাজ কঠিনভাবে নিষিদ্ধ হবে।

ধারা : ১৪—পিতামাতা ও সন্তানেরা পরস্পরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবার অধিকার পাবে।

ধারা : ১৫—বিবাহ বন্ধনের বাইরে যে সন্তানদের জন্ম তারা আইনত বিবাহ বন্ধনের মধ্যে জন্মানো সন্তানদের সঙ্গে সমান অধিকার পাবে। বিবাহ বন্ধনের বাইরে যে সন্তানেরা জন্মেছে তাদের ক্ষতি বা তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার কেউই করতে পারবে না।

শিশুর মা বা অন্যান্য সাক্ষী বা অন্য কোনো সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিবাহ গণ্ডির বাইরে জন্মানো শিশুর পিতা যে ঠিক কে তা আইনত প্রমণ হবার পর উক্ত পিতা শিশুর যতদিন না ১৮ বছর বয়েস হয় ততদিন পর্যন্ত তার ভরণ-পোষণের সমস্ত বা আংশিক খরচ বহন করবে।

প্রকৃত মাতার সম্মতি নিয়ে প্রকৃত পিতা শিশুকে কাছে রাখতে পারে।

শিশুটির প্রকৃত মা যদি বিয়ে করেন তাহলে তার ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত ব্যাপার ১১ ধারার ব্যবস্থা অনুসারে হবে।

ধারা : ১৬—আগেকার বিয়েতে জন্মানো কোনো শিশুর প্রতি স্বামী বা স্ত্রী অসৎ ব্যবহার করতে পারবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বিবাহ-বিচ্ছেদ

ধারা : ১৭—স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই বিবাহ বিচ্ছেদ চাইলে তা মঞ্জুর করা হবে। যদি শুধু স্বামী বা শুধু স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদ চায় তাহলে এলাকার (sub-district) গণ-সরকার এবং এলাকার বিচার প্রতিষ্ঠান চেষ্টা করেও দু'জনের মধ্যে মিটমাট করতে ব্যর্থ হবার পরই বিচ্ছেদ মঞ্জুর করা হবে।

যে সমস্ত ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই বিবাহ বিচ্ছেদ চায় সেই সমস্ত ক্ষেত্রে বিচ্ছেদের নিদর্শন-পত্র পাবার জন্যে উভয়কেই এলাকার গণ-সরকারের কাছে আবেদন করতে হবে। সরকার যখন প্রমাণ পাবে যে উভয় পক্ষই বিচ্ছেদ চায় এবং সন্তান ও সম্পত্তি রক্ষার ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে, তখন বিনা বিলম্বে বিচ্ছেদের নিদর্শন-পত্র মঞ্জুর করা হবে। যদি শুধুমাত্র একপক্ষই বিচ্ছেদ চায় তাহলে এলাকার গণ-সরকার মিটমাটের চেষ্টা করতে পারে। আপোষের চেষ্টা বিফল হলে বিনা বিলম্বে উক্ত সরকার ব্যাপারটির সিদ্ধান্তের জন্যে জেলার বা শহরের

জনগণের আদালতে পাঠাবে। কোনো পক্ষ যদি জেলার বা শহরের জনগণের আদালতে আপীল করতে চায় তাহলে এলাকার জনগণের সরকার কোনো বাধা দিতে পারবে না। বিবাহ বিচ্ছেদের মামলার ব্যাপারে জেলার বা শহরের জনগণের আদালতের প্রধান চেষ্টা হবে দু'পক্ষের মধ্যে একটা মিটমাট করবার, আপোষের চেষ্টা ব্যর্থ হলে আদালত বিনা বিলম্বে রায় দেবে।

যে ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদের পর স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে আবার বিবাহ সম্বন্ধের পুনঃস্থাপন চায় সেই ক্ষেত্রে তাদের পক্ষে এলাকার জনগণের সরকারের কাছে পুনর্বিবাহ রেজেস্ট্রি করবার জন্যে দরখাস্ত করতে হবে। এলাকার জনগণের সরকার এই দরখাস্ত গ্রহণ করবে ও পুনর্বিবাহের নিদর্শন পত্র মঞ্জুর করবে।

ধারা ঃ ১৮—স্ত্রী যখন অন্তঃসত্ত্বা তখন স্বামী বিবাহ বিচ্ছেদের দরখাস্ত করতে পারবে না। শিশু জন্মাবার এক বছর পরে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করতে পারে। কোনো মেয়ে যদি বিবাহ বিচ্ছেদের দরখাস্ত করতে চায় তাহলে তার পক্ষে এই বাধা থাকবে না।

ধারা ঃ ১৯—বিপ্লবী সেনা বাহিনীর কোনো সভ্য যখন যুদ্ধক্ষেত্রের কাজে নিযুক্ত তখন যদি সে তার স্ত্রী বা স্বামীর সঙ্গে চিঠিপত্রের আদান প্রদান বজায় রাখে তাহলে তার স্ত্রী বা স্বামী তার কাছ থেকে সম্মতি না পেয়ে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করতে পারবে না।

এই নিয়ম প্রবর্তিত হবার তারিখ থেকে শুরু করে দু'বছরের মধ্যে বিপ্লবী সেনাবাহিনীর কোনো কর্মী যদি তার পরিবারের কাছে কোনো চিঠি না লেখে তাহলে তার স্ত্রী বা স্বামীকে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন মঞ্জুর করা যেতে পারে। এই আইন প্রবর্তিত হবার দু'বছর আগে থাকতে শুরু করে এবং এই আইন প্রবর্তিত হবার এক বছর পর পর্যন্ত যদি বিপ্লবী সেনাবাহিনীর কোনো কর্মী তার পরিবারের কাছে কোনো চিঠি না লেখে তা হলে তার স্ত্রী বা স্বামীর বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদনও মঞ্জুর করা যেতে পারে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ বিবাহ বিচ্ছেদের পর সন্তানদের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষার ভার

ধারা ঃ ২০—পিতামাতার মধ্যে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হলে পিতা মাতার সঙ্গে সন্তানের রক্তের সম্পর্ক শেষ হয় না। শিশুদের অভিভাবক

পিতাই হোন বা মাতাই হোন শিশুরা কিন্তু উভয় পক্ষেরই সন্তান থেকে যায়।

বিবাহ বিচ্ছেদের পর পিতা মাতা উভয়েরই কর্তব্য হলো শিশুদের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষার ভার গ্রহণ করা।

বিবাহ বিচ্ছেদের পর যে শিশু মার দুধ ছাড়েনি তাকে মার কাছে রাখবার ব্যবস্থাই মূল নীতি হবে। শিশু বড় হবার পর তার অভিভাবকত্ব নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ হলে এবং কোনো আপোষে আসা সম্ভব না হলে, জনগণের আদালত শিশুর স্বার্থ অনুসারে একটা রায় দেবে।

ধারা ঃ ২১—বিবাহ বিচ্ছেদের পর শিশুকে যদি মার কাছে রাখবার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে শিশুটির ভরণ-পোষণ ও শিক্ষার জন্যে যে খরচ তা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পিতাকেই গ্রহণ করতে হবে। এই ভরণ-পোষণ ও শিক্ষার খাতে কতদিন পর্যন্ত এবং কী পরিমাণ খরচ করা হবে সে বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা চুক্তি করা দরকার। যে ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ চুক্তিতে আসতে পারবে না সেই ক্ষেত্রে জনগণের আদালত শিশুর স্বার্থ অনুসারে রায় দেবে।

এই খরচ, নগদ টাকায় কিম্বা জিনিষ পত্র দিয়ে কিম্বা শিশুর জন্যে নির্ধারিত জমি চষে দিয়ে করতে হবে। শিশুর ভরণ-পোষণ এবং শিক্ষা সম্বন্ধে পিতামাতার এই চুক্তি শিশুটির পক্ষে তার বাবা বা মাকে চুক্তি অনুসারে নির্ধারিত সাহায্যের পরিমাণ বাড়াতে অনুরোধ জানাবার ব্যাপারে কোনো বাধা হবে না।

ধারা ঃ ২২—বিবাহ বিচ্ছেদের পর মেয়েটি যদি আবার বিয়ে করে এবং তার (নতুন) স্বামী যদি আগের পক্ষের সন্তান বা সন্তানদের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষার ব্যয় বহন করতে রাজী হয় তাহলে অবস্থা অনুসারে সেই সন্তান বা সন্তানদের বাবা এদের ভরণ-পোষণ আর শিক্ষা বাবদ খরচ কম দিতে বা এই খরচ দেওয়া থেকে অব্যাহতি পেতে পারে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ বিবাহ বিচ্ছেদের পর সম্পত্তি ও ভরণ-পোষণ

ধারা ঃ ২৩—বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে মেয়েটির বিয়ের আগে যে সম্পত্তি ছিলো তার উপর তার অধিকার থাকবে। অন্যান্য পারিবারিক সম্পত্তি ভাগ করা হবে দুই পক্ষের মধ্যে চুক্তির উপর নির্ভর করে। যে ক্ষেত্রে চুক্তিতে আসা সম্ভব হয়নি সেই ক্ষেত্রে জনগণের আদালত পারিবারিক সম্পত্তির আসল অবস্থা, স্ত্রী এবং শিশু বা শিশুদের স্বার্থ

এবং (দেশের) উৎপাদনের পক্ষে কল্যাণকর নীতি বিচার করে একটি রায় দেবে।

যে সব ক্ষেত্রে স্ত্রীর ভাগের সম্পত্তি শিশু বা শিশুদের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষার ব্যয় বহন করবার পক্ষে পর্যাপ্ত সেই সব ক্ষেত্রে স্বামী শিশুদের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষার জন্যে আরো খরচ দেওয়া থেকে অব্যাহতি পেতে পারে।

ধারা ঃ ২৪—বিবাহিত জীবনের সময় যে ঋণ হয়েছে বিবাহ বিচ্ছেদের পর তা শোধ দেওয়া হবে ওই সময়ে স্বামী ও স্ত্রী যা সম্পত্তি সংগ্রহ করেছে তাই থেকে। যে ক্ষেত্রে এ-রকম কোনো সম্পত্তি সংগ্রহ হয়নি কিম্বা যে সম্পত্তি সংগ্রহ হয়েছে ঋণ শোধ দেবার ব্যাপারে তা অপর্যাপ্ত, সেই ক্ষেত্রে উক্ত দেনা শোধ দেবার দায় থাকবে স্বামীর উপরই। স্বামী বা স্ত্রী স্বতন্ত্রভাবে যে ঋণ করেছে তা শোধ দেওয়ার দায়িত্ব হবে সেই পক্ষেরই যে এই ঋণ করেছে।

ধারা ঃ ২৫—বিবাহ বিচ্ছেদের পর কোনো এক পক্ষ যদি আর বিয়ে না করে এবং ভরণ-পোষণের ব্যাপারে অসুবিধায় পড়ে তাহলে অন্য পক্ষ তাকে সাহায্য করবে। এই সাহায্যের পরিমাণ কী হবে এবং কত দিন ধরে তা চলবে সে সম্বন্ধে উভয় পক্ষ মিলে একটি চুক্তি করবে; যে ক্ষেত্রে চুক্তি সম্ভব হলো না সেই ক্ষেত্রে জনগণের আদালত একটি সিদ্ধান্ত করে দেবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ উপবিধি

ধারা ঃ ২৬—যারা এই আইন লঙ্ঘন করবে তাদের আইনত শাস্তি দেওয়া হবে। যে-সব ক্ষেত্রে বিবাহের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবার চেষ্টা খুন জখম পর্যন্ত গড়াবে সেই সব ক্ষেত্রে যাঁরা এইভাবে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করবে তাঁরা ফৌজদারী আইনে অপরাধী হবে।

ধারা ঃ ২৭—এই আইন ঘোষিত হবার দিন থেকেই কার্যকরী হবে। যে সব এলাকায় জাতীয় সংখ্যালঘুদের বাস সেই সব এলাকায় জাতীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে প্রচলিত বিবাহ সংক্রান্ত প্রথা অনুসারে স্থানীয় জনগণের সরকার (বা সামরিক ও শাসনভারপ্রাপ্ত কমিটি), কিম্বা প্রদেশের জনগণের সরকার এই আইনে কিছু কিছু পরিবর্তন ও নতুন ধারা যোগ করতে পারবে। কিন্তু সেই ব্যবস্থা কার্যকরী হবার আগে সরকারী শাসন বিভাগের কাছে অনুমোদনের জন্যে সেগুলিকে

পেশ করতেই হবে। নতুন চীনে বিবাহ-বিধির এই সংস্কারের তাৎপর্যটা ঠিক কী?

বিবাহ-বিধির সংস্কারকে ওঁরা ভূমিসংস্কারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেন? মিলটা ঠিক কোথায়? এই প্রশ্নটির জবাব থেকেই বুঝতে পারা যাবে, ওঁদের চোখে বিবাহ-বিধি সংস্কারের আসল তাৎপর্যটা কোথায়?

আসল কথা হলো, দেশের উপর থেকে মান্ধাতার আমলের সমাজব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করা। সে-সমাজব্যবস্থার নাম সামন্ততন্ত্র। সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ কেন? কেননা, সামন্ততন্ত্র দেশের মানুষকে পঙ্গু করে রেখেছিলো। সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ না হলে মানুষের মুক্তি নেই, দেশের উন্নতি নেই।

কৃষকেরা পঙ্গু হয়েছিলো। কেন? জমিদার আর সামন্ত-শ্রেণীর শোষণ। তাদের ছিলো না জমিতে অধিকার। আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণ থেকে তারা বঞ্চিত ছিলো। প্রপিতামহদের ভূতে পাওয়া তাদের ভাগ্য। সে-ভাগ্য তাদের বেঁধে রেখেছিলো হাজার বছরের পুরোনো অচল খোঁটায়।

ভূমিসংস্কার! কী হলো? তারা জমিতে অধিকার পেলো। তারা আধুনিক বিজ্ঞানের সুযোগ সুবিধে পেতে লাগলো। খুলে গেল প্রভূত উৎপাদনের পথ। দেখা দিলো শান্তি আর ঐশ্বর্যের সম্ভাবনা।

আর, বিবাহ-বিধির বেলায়? সাধারণভাবে দেশের সব মানুষের উপরই জমিদার সামন্তদের শোষণের চেষ্টা। মেয়েদের উপরেও। ছেলেদের উপরেও। তাছাড়াও কিন্তু মেয়েদের উপর আরো একটি বাড়তি বোঝা ছিলো। স্বামীর শাসন, পুরুষ জাতির শাসন,—এ তাই এক রকম বাড়তি পক্ষাঘাত সৃষ্টি করবার আয়োজন। তারই নাম প্রাচীন কালের বিবাহ-বিধি।

এও সমাজতন্ত্র—সামন্ততন্ত্রের আর একটা দিক।

তাই সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ-পরিকল্পনায় শুধু মাত্র ভূমিসংস্কার নয়, বিবাহ-বিধির সংস্কারও। ভূমিসংস্কারের দরুন মুক্তি পেলো অনেক কোটি কৃষক, বিবাহ-বিধি সংস্কারের দরুন অনেক কোটি মেয়ে।

তাই, দু'-এর মধ্যে যোগাযোগ রয়েছে। কেননা, এই দুটি হলো সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদের দুটি প্রধান আয়োজন

তিন : আমার বাংলা

একাদশ পরিচ্ছেদ

কোন পথ

কলম হাতে অনেক্ষণ চুপচাপ বসে থাকি। আমার বাঙলা! কী লিখবো, কী বলে শুরু করবো? আকাশ-পাতাল কত কথাই মনের মধ্যে তোলপাড় করে, এত কথা যে কোনরকম কিনারাই পাওয়া যায় না।

আমার বাঙলা! মনে পড়ে, একবার উড়োজাহাজ থেকে দেখেছিলাম আমার এই বাঙলাকে—ঘুরেছিলাম বাঙলা দেশের আকাশ বেয়ে, বাঙলা দেশের হাওয়ায় ভর দিয়ে। জলপাইগুড়ি, চায়ের বাগান, হিমালয়, মেদিনীপুর, সমুদ্র, পদ্মা, গঙ্গা, সুন্দরবন, কারখানা, কয়লাখনি, আসানসোল। কত অজস্র টুকরো টুকরো ছবি মনের মধ্যে ভিড় করতে থাকে,—এত ছবি যে, মন তাদের গ্রহণ করে উঠতে পারছে না, হেরে যাচ্ছে! মনে হয়েছিলো, আকাশ থেকে পাখীর চোখ দিয়ে না দেখলে দেশটাকে বুঝি চেনবারই জো নেই। কেননা, তা না হলে একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায় না, বোঝা যায় না কি অপরূপ রূপ, কী বিপুলবিরাট, কী রকম বিশ্বাসের সীমা পেরিয়ে যাওয়া বৈচিত্র্য! মনে হয়েছিলো, সবচেয়ে বড় শিল্পীর সবচেয়ে উদ্দাম কল্পনাও পাল্লা দিতে পারবে না এই বাস্তবের সঙ্গে, আমার বাংলার সঙ্গে। একদিকে তুষার ঢাকা বরফের চূড়োয় ভোরের সূর্য যেন আকাশ জোড়া গলা-সোনার ঘড়া উপুড় করে দেয়, সে-রূপ এত উজ্জ্বল যে চোখ ঝলসে যায়,—মানুষের চোখ অমন উজ্জ্বল রূপ সইতে পারে না বুঝি। আর একদিকে সমুদ্র: যতদূর চোখ যায় ততদূর শুধু শান্ত আর নীল, সবুজ আর খয়েরি রঙের ছড়াছড়ি, আর তার উপর যখন দুপুরের হলদে রোদ পড়ে তখন চেয়ে থাকতে থাকতে মাথার ভিতরটা কি রকম যেন ঝিমঝিম করে। আবার দুপুরের সূর্যও পথ খুঁজে পায় না সুন্দরবনের আর আসাম-কিনারার গহন অরণ্য ভেদ করে কিংবা আসানসোলের কয়লাখনিগুলির কালো কালো

পাতাল-ছোঁয়া সুড়ঙ্গের মধ্যে। এই রকম কতই না! কত রকম, কত অজস্র ছবি! পদ্মা চলেছে তার আভিজাতিক পাড় কাঁপানো ছন্দে; গঙ্গা যেখানে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে সেখানে কালিদাসের সেই শ্লোক: অনন্য সামান্য কলত্রবৃত্তি····। কে যেন বলতেন, কালিদাস বাঙালী ছিলেন; কেননা তা না হ'লে ছ'টা ঋতুর এমন স্পষ্ট রূপ তিনি দেখলেন কোথা থেকে? দুনিয়ার আর কোথাও তো ছ'টা ঋতুর এই রকম স্পষ্ট ছ'টা রূপ চোখে পড়ে না। কিন্তু কালিদাস কোন প্রদেশের লোক ছিলেন তা নিয়ে মাথা ঘামাবার ফুরসত থাকে না, কেননা ইতিমধ্যে উড়োজাহাজটা এসে পড়েছে ধানের ক্ষেতের উপর, ঘাসে ঢাকা মাঠের উপর, মাঝে মাঝে গাছের ঝোপ। কী আশ্চর্য সবুজ রঙ—যে সব যাযাবর পাখীরা বছরে বছরে এ-দেশ থেকে ও-দেশে উড়ে যায় তাদের চোখে কি এমন গাঢ় আর এমন উজ্জ্বল সবুজ রঙ আর কোথাও ধরা দিয়েছে?

বিশ্বাস হয় না, এমন বিরাট, বিপুল বৈচিত্র—আর এত যে অপরূপ রূপ সবই কি না আমার এই বাঙলা দেশের! এ-দেশের আকাশ বেয়ে, এ-দেশের বাতাসে ভর দিয়ে, পাখীর চোখে পুরো দেশটাকে দেখে ঘোরবার একটা দারুণ নেশা আছে। মনে হয়েছিল, এমনভাবে যদি দেখতে না পেতাম তাহলে হয়তো দেখাই হতো না আমার বাঙলাকে।

জানি, এ-দেখা মিথ্যে দেখা নয়। তবু কিন্তু এই দেখাকেই পুরো দেখা বলে মেনে নেওয়াতে মস্ত ফাঁকি আছে। ফাঁকিটা ধরা পড়ে আকাশ থেকে মাটিতে নেমে এলে, পায়ে চলার পথ ধরে এগিয়ে চলার সময়। এই যে পায়ে চলার পথ, এখানে ফাঁকা আকাশের আয়েশ নেই। এখানে ভিড়—এত ভিড় যে আকাশের রাজ্য থেকে ঘুরে আসবার পর যেন দম বন্ধ হয়ে যায়। অভাব আর অভিযোগের ভিড়, দৈন্য আর শীর্ণতার ভিড়, নগ্নতা আর কুশ্রীতার ভিড় আর ভিড় অন্ধতার, কুসংস্কারের, অজ্ঞানের। 'ফ্যান দে', 'ফ্যান দে'—লক্ষ মানুষের সেই বুভুক্ষু চিৎকার তেতাল্লিশ সালের সমস্ত দিন ধরে, সমস্ত রাত ধরে। "আল্লা হো আকবর" "বন্দে মাতরম্"—সেই খুনের নেশা দাঙ্গার সময়কার, সমস্ত দিন আর সমস্ত রাত ধরে। পায়ে চলা পথ ধরে হাঁটবার সময় এত

চিৎকারের স্মৃতি কানে আসে যে মাথার মধ্যটা ঝিঁঝিঁ করে। বাঙলা দেশের পায়ে চলা পথ, কলকাতার পথ। পথ চলতে চলতে হঠাৎ দেখি একটি কচি ছেলের হাত জুতো জোড়া চেপে ধরেছে: 'স্যু পালিস, বাবু স্যু পালিস'। পালিসের দরকার নেই, পালিস করা জুতো এত দৈন্যের ভিড়ে বেখাপ্পা দেখাবে যে! কিন্তু ছেলেটা মিনতি করে বলে, ওর বাপ ওলাওঠায় মরে গিয়েছে, তাই আমাদের জুতোয় পালিস না উঠলে ওর পেটের একটা ছোট্ট কোণও ভর্তি হবে না। খুব সম্ভব ছেলেটা মিথ্যে কথা বলছে, কিন্তু মিথ্যে কথা যে বলছে তাও তো এক নির্মম বাস্তব—অন্তত এইটুকু তো সত্যি কথা যে, চারটে পয়সার আশায় ওইটুকু একটি ছেলেকে এমন সাংঘাতিক একটা মিথ্যে কথা বলতে হচ্ছে।

আমার বাঙলা! আকাশ থেকে নেমে এসে পায়ে চলা পথ ধরে হাঁটবার সময়কার ছবিটা এই রকম, একেবারে অন্যরকম। এই পায়ে চলার পথ আঁকড়ে পড়ে রয়েছে কত লক্ষ মানুষের কত কঙ্কালের স্মৃতি। যারা খেতে পায়নি, মরে গিয়েছে, তাদের কঙ্কাল। যারা নিলকর সাহেবদের চাবুক খেয়েছে, মরে গিয়েছে, তাদের কঙ্কাল। যারা পরনের কাপড় পায়নি বলে শীতে কুঁকড়ে গিয়েছে তাদের কঙ্কাল। যারা আশ্চর্য ভালো কাপড় বুনতে পারতো বলে বিদেশী বণিকদের সামনে বুড়ো আঙুল বলি দিতে বাধ্য হয়েছিল, তাদের কঙ্কাল। যারা দেশকে ভালবাসার অপরাধে বিদেশী শোষকদের কাছ থেকে উপহার পেয়েছিল বন্দুকের সঙীন আর বুলেট, তাঁদের কঙ্কাল। এই যে পায়ে চলার পথ, এ-পথ যেন অদৃশ্য কঙ্কালের এক অপরূপ যাদুঘর। এই পথের দু' পাশে যে সব মানুষ—রোগে আর অভাবে যাদের শরীর শীর্ণ, যারা ওষুধ আর পথ্য পায় না বলে অসহায়ের মতো দেবতার কাছ থেকে করুণা চায় আর এ-করুণা পাবার আশায় নিজেদের শেষ কাণাকড়িটি তুলে দেয় পুরোহিত আর পাণ্ডার হাতে—তারপর নির্মম, নিঃসম্বল মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই পাবার থাকে না—তারা।

আকাশ থেকে পাখীর চোখ দিয়ে দেখতে যাবার ফাঁকিটা ওখানেই: চোখে পড়ে না পায়ে চলার সরু পথটুকু আর সেই পথে যে শীর্ণ, অসুস্থ, নগ্ন মানুষের মিছিল সেই মিছিলটা। অথচ

আকাশ থেকে বাঙলা দেশের যে রূপটা চোখে ধরা পড়েছিলো, সেই রূপটাও তো চোখে দেখা; সেটাও নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা নয়—সেও তো আমার এই বাঙলা দেশেরই রূপ। কি বিরাট আশ্চর্য, কী অপরূপ বৈচিত্র্য—পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শিল্পীর সবচেয়ে উদ্দাম কল্পনাও এর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না!

আকাশ থেকে দেখা ওই বিরাট ঐশ্বর্য, আবার পায়ে চলা পথের এই দারুণ দৈন্য—এ দুটোর মধ্যে একটাও তো মিথ্যে কথা নয়। আর তার জন্যই শান্ত মনে ভেবে দেখতে হবে কেমন করে সত্যি হয় এই দুটোই। ভাবতে গেলে একটা ভারী অদ্ভুত কথা ধরা পড়ে। আমাদের এই যে বাঙলা দেশ—যার এমন বিপুল, বিরাট ঐশ্বর্য—সে দেশ সত্যিই কতোখানি আমাদের হয়েছে; যারা বাঙলা দেশের মানুষ বহুদিন ধরে তাদের অধিকার থাকেনি এই বিরাট, বিপুল ঐশ্বর্যে। তাই আকাশে উড়লে ঐশ্বর্যটুকু ধরা পড়ে, কিন্তু মাটিতে পা দিলে অন্যরূপ: অভাব, দৈন্য, নগ্নতা আর কুশ্রীতা।

এই দেশের মানুষ, অথচ এ দেশ তাদের নয়। এ দেশের ঐশ্বর্যে তাদের অধিকার নেই। যারা লুঠ করতে এসেছিলো আমাদের দেশের ঐশ্বর্য তাদের কড়া পাহারাদারি ডিঙিয়ে আমরা যখন এই ঐশ্বর্যের কাছ ঘেঁষতে গিয়েছি তখনি রাগে তাদের চোখ লাল হয়ে উঠেছে আব লাল হয়ে উঠেছে তাদের বন্দুকের সঙীন আমাদের রক্তে। তাই আমাদের দেশ প্রাচুর্যের দেশ হলেও আমাদের পিঠগুলি অভাবের চাপে কুঁজো! এ যেন ছোটবেলায় পড়া সেই রূপকথার গল্প: রাজপুরীতে দৈত্যেরা সোনার কাঠি ছুঁইয়ে রাজপুত্রকে বন্দী করে রেখেছে। রূপকথার গল্পের সঙ্গে আমাদের এই বাস্তব জীবনের তফাতটা শুধু এই যে সোনার কাঠির বদলে আমাদের কপালে ছোঁয়ানো বন্দুকের সঙীন; দৈত্যের দাপটের দিক থেকে গল্প আর বাস্তব দুটোই একরকম। বহুদিন এইভাবেই দিন কেটেছে।

কিন্তু, আপত্তি উঠবে, এ তো সমস্তই অন্য কথা হচ্ছে। রাজনীতির কথা, অর্থনীতির কথা, সমাজতত্ত্বের কথা। আমরা যৌন-জীবনের কথা নিয়ে আলোচনা করতে বসেছি। ধান ভানতে শিবের গীত কেন? কেন রাজনীতির কথা, অর্থনীতির কথা, সমাজতত্ত্বের কথা? আপত্তি উঠবে, কেননা আমরা এক ভ্রান্ত পথে চিন্তা

করতে অভ্যস্ত হয়েছি : মনে করি যৌনজীবনের কথাটা বাকি জীবন থেকে আলাদা কোনো কথা। যৌন-জীবনের কথাটা বেশ রসাল অশ্লীলতার কথা হবে, যা পড়তে পড়তে আমদের মনের গোপন কামবিকারগুলিতে সুড়সুড়ি লাগবে। আর জীবনের বাকি সব কথাগুলি হবে অন্যরকম, যা নিয়ে স্পষ্টভাবে, সোজাসুজি ভাষায় এমন কি গুরুজনদের সঙ্গে আলোচনা করা চলে! এই হলো আমাদের সাধারণ মনের ভাব আর যেহেতু এটা নেহাতই একটা ভুল ধারণা সেই হেতু এই ধারণাটাকেই প্রথমে ভাঙ্গা দরকার।

মানুষের যৌন-জীবনের কথাটা বাকি জীবনের কথা থেকে আলাদা হবে কেমন করে? যৌন-জীবন তো জীবনেরই একটা দিক মাত্র আর জীবন বলতে বোঝায় একটা গোটা জিনিস, একটা পুরো জিনিস—জীবন বলতে কতবগুলি খাপছাড়া জিনিসের গাণিতিক যোগফল বোঝায় না। এই যে পুরো জীবন এরই একটা দিক হলো যৌন-জীবন; তাই মানুষের বেলায় অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে, রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে—এক কথায় সমাজ-জীবনের সঙ্গে—যৌন-জীবনের একেবারে অঙ্গাঙ্গী যোগাযোগ। পশু জগতের দৃষ্টান্ত দেখে মানুষের যৌন-জীবনকে বুঝতে পারবার সম্ভাবনাটা কম, পশুর বেলাতেও অবশ্য যৌন-জীবন তার বাকি জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে জড়িত। কিন্তু পশুর পক্ষে যেটা হলো পুরো জীবন তা শুধু জীববিজ্ঞানের নিয়মকানুন নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু মানুষের পুরো জীবনটা শুধুমাত্র জীববিজ্ঞানের নিয়মকানুন মানতে ব্যস্ত না—জীববিজ্ঞানের নিয়মকানুনের সঙ্গে যোগ হয়েছে সমাজবিজ্ঞানের নিয়মকানুন আর তার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে মানুষের পুরো জীবন। কেননা, মানুষ তো শুধু জীব নয়, সামাজিক জীব। তাই মানুষের পুরো জীবনের মধ্যে রয়েছে অর্থনীতি আর রাজনীতি, সমাজ সংগঠন আর সংস্কৃতি—শুধুমাত্র জীববিজ্ঞানের নিয়মকানুন নয়। বাঙলা দেশে যৌনসমস্যাকেও বুঝতে পারা যাবে না, এদেশের বৃহত্তর সামাজিক পটভূমিটার কথা তোলা না হলে।

আমার বাঙলা। সোনার বাঙলা। কী বিশাল ঐশ্বর্য, কী বিরাট সম্ভাবনা! তবু দৈন্য—নির্মম, অসহ্য দৈন্য। তার কারণ পেছিয়ে পড়ে থাকা দেশ আমাদের। উৎপাদনের উপায়ে যতখানি

উন্নতি হলে আর সমাজব্যবস্থায় যে ধরনের পরিবর্তন হলে দেশের ঐশ্বর্য বাস্তবিকই দেশের মানুষের ঘরে ওঠে ততখানি উন্নতি ও সেই ধরনের পরিবর্তন আমাদের দেশে হয়নি। কেন হয়নি তা বুঝতে হলে অনেকদিন আগেকার কথা থেকে শুরু করতে হবে, ইংরেজরা যখন প্রথম আমাদের দেশে এল তখনকার কথা থেকে।

বিদেশী বণিকেরা প্রথম যখন আমাদের দেশে এল তখন এদেশের সমাজ-ব্যবস্থায় যতই ঘুণ ধরুক না কেন ব্যবসা বাণিজ্যের দিক থেকে অবস্থাটা বেশ সমৃদ্ধই: আমদানির চেয়ে তখনো আমাদের রপ্তানিই বেশি, তখনকার দিনে ঢাকা-মুর্শিদাবাদের অবস্থা তখনকার লণ্ডন-প্যারীর চেয়ে কম নয়। এই সমৃদ্ধির লোভেই বিদেশী বণিকেরা আমাদের দেশে আস্তানা গাড়তে এসেছিলো: ওরা এসেছিলো ব্যবসা করতে কিন্তু ওদের মধ্যে একদল বণিক—ইংরেজ বণিক গড়ে তুললো এক সাম্রাজ্য। কেমন করে সম্ভব হলো এই ব্যাপার? এই প্রশ্নের জবাব পেতে গেলে মনে রাখতে হবে দুটো কথা। প্রথমত, আমাদের দেশের সমৃদ্ধি তখন যেমনই হোক না কেন, সমাজ-জীবনের পটভূমিটা তখনো সেই হাজার বছরের পুরানো ক্ষয়ে যাওয়া, মরে যাওয়া, সামন্ততন্ত্রই। দ্বিতীয়ত, ওরা—ওই ইংরেজ বণিকেরা—ছিলো এক উন্নত সভ্যতার প্রতিনিধি; ইংলণ্ডে তখন ফিউডাল যুগের ধ্বংসাবশেষের উপর বুর্জোয়া বণিক যুগের ইমারত গড়ে উঠেছে। তাই ইংরেজরা শুধুই যে এ-দেশের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণভাবে হাতের মুঠোয় নিয়ে যেতে পারলো তাই নয়, হটিয়ে দিতে পারলো ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের। আপাতত ওই অর্থনৈতিক প্রতিপত্তিটার উপরই বিশেষ করে নজর রাখতে হবে; কেননা এরই খাতিরে ওরা শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষকে অস্ত্রবলে পরাস্ত করবার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হলো! পলাশীর যুদ্ধ—যুদ্ধে ওদের জয় হলো। আর তারপর ওরা জাহাজ ভর্তি করে আমাদের দেশের সম্পদ, আমাদের দেশের ঐশ্বর্য নিয়ে চললো নিজেদের দেশে। সে যে কত টাকা তার হিসেব করতে গেলে মাথা ঘুরে যায়। সমস্তই আসলে লুঠতরাজের টাকা, তবে মর্জি মতো ওরা কিছুটার নাম দিতো খাজনার টাকা, কিছুটার বা ভেটের টাকা, আবার অনেকখানি

টাকার কোনো নামই থাকতো না। যে যা পেয়েছে গিলেছে: ক্লাইভ আর হেস্টিংস-এর মতো রাঘব বোয়াল থেকে শুরু করে হরেক রকম চুনোপুঁটি পর্যন্ত। এই যে সব জাহাজ বোঝাই টাকা চললো আমাদের দেশ থেকে, এই টাকা দিয়েই ওদের দেশে শিল্পবিপ্লবের ভিৎ গাঁথা হয়েছে। কথাটা শুনতে হয়তো অবাক লাগে; কিন্তু সত্যিই ওদের দেশে নতুন সভ্যতা—ধনতন্ত্র—আমাদের কাছ থেকে লুঠ করা টাকা না পেলে গড়ে উঠতো কিনা সন্দেহ! ইংরেজ বণিকরা যখন প্রথম ভারতবর্ষে ব্যবসা করতে এল তখন ওদের দেশে কলকারখানাওয়ালা ধনতন্ত্র শুরু হয়নি। ধনতন্ত্র গড়ে উঠবার জন্যে ব্যবসাদারদের হাতে অনেক কাঁচা টাকা দরকার,—সেই টাকায় বিরাট বিরাট কারখানা খোলা হবে, দেশের উৎপাদন-পদ্ধতি বদলে যাবে। এই টাকাটারই নাম দেওয়া হয় প্রাথমিক পুঁজি। ইংরেজ ব্যবসাদাররা এই প্রাথমিক পুঁজির অনেকখানিই সংগ্রহ করলো আমাদের দেশ থেকে, লুঠতরাজ করে। আর তারপর সেই টাকার ভিত্তিতে ওদের দেশে দেখা দিলো শিল্প-বিপ্লব: কারিগরদের ছোটোখাটো যন্ত্রপাতি আর হাতিয়ার দিয়ে উৎপাদনের বদলে বিরাট বিরাট কারখানায় উৎপাদনের ব্যবস্থা হলো। ওদের দেশের ঐতিহাসিকেরা অবশ্য জাঁক করে বলতে চান শিল্প-বিপ্লবের আসল কারণ হলো কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের আশ্চর্য আবিষ্কার; হারগ্রীয়েভ্‌স্ আবিষ্কার করেন সূতাকল, ওয়াট্ আবিষ্কার করেন স্টিম ইঞ্জিন, এই রকম কতই না। বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কারকে ছোট করবার দরকার নেই; কিন্তু মনে রাখতে হবে শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার শিল্প-বিপ্লব ঘটাতে পারে না। কেননা, এই সব আবিষ্কারকে শিল্পে প্রয়োগ করতে গেলে ব্যবসাদারদের হাতে বিরাট পুঁজি—অনেক কাঁচা টাকা জমা দরকার। ভারতবর্ষকে লুঠ করবার আগে ওদের দেশের ব্যবসাদাররা এই পুঁজি সংগ্রহ করতে পারেনি। সে সময়েও বৈজ্ঞানিকেরা অনেক আশ্চর্য আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু ব্যবসাদারদের হাতে এমন টাকা ছিলো না যে, আবিষ্কারগুলিকে কাজে লাগিয়ে কলকারখানা ফাঁদা যায়। টাকার পাহাড় জমলো ভারতবর্ষকে লুঠ করবার পর; বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার ব্যবসাদারদের হাতে হাতিয়ার হয়ে উঠলো,

ওদের দেশে দেখা দিলো শিল্প-বিপ্লব। ১৭৫৭-এ পলাশীর যুদ্ধ, ১৭৬০ থেকে ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব শুরু। ধনতন্ত্র। নতুন সভ্যতা: সামন্ততন্ত্রের অন্ধকারকে পেছনে ফেলে প্রাচুর্যের পথে এগিয়ে চলা। সামন্ততন্ত্রের তুলনায় ধনতন্ত্র যেন স্বর্গ, যদিও শেষ পর্যন্ত ধনতন্ত্রের আয়ু ফুরিয়ে যাবার পর যে নতুন সভ্যতার সূচনা দেখা গেল— সমাজতন্ত্র—তার তুলনায় এই ধনতন্ত্রই নরক-বিশেষ হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু সে পরের কথা, সে কথা ভেবে ভুলে গেলে চলবে না, এই ধনতন্ত্রের কী বিরাট আর বিপুল সম্ভাবনা! ধনতন্ত্রের যা কীর্তি তার পাশে মানব সভ্যতার অতীত কীর্তিগুলির গৌরব ম্লান হয়ে যায়—কোথায় লাগে ইজিপ্টের পিরামিড, ব্যাবিলোনের প্রাসাদ— এই ধনতন্ত্রের বিরাট, বিপ্লবী কীর্তিগুলির পাশে।

সে-সব কীর্তি দেখা দিলো না আমাদের দেশে। আজও পুরোপুরি দেখা দেয়নি। যতটুকুও বা দেখা দিয়েছে তাও বিদেশীদের তাঁবেই। তাই আমরা এখনো অনেকখানি পড়ে আছি সামন্ততন্ত্রের আওতায়। আমাদের দেশ থেকে লুঠ করা জাহাজ-বোঝাই টাকায় ওদের দেশে নতুন সভ্যতার বনিয়াদ গাঁথা হলো অথচ আমরা পড়ে রইলাম সামন্ততন্ত্রের নরকেই। তার কারণ বিদেশীর শাসন, যে শাসনের মূলমন্ত্র হলো ওদের ব্যবসাদারদের উৎসাহ। সে উৎসাহের দিক থেকে ভারতবর্ষের পক্ষে নতুন সভ্যতার পথে এগিয়ে যাবার মতো সর্বনেশে ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না। যতদিন ভারতবর্ষ পেছিয়ে পড়ে থাকা দেশ হয়ে থাকবে ততদিন এইখান থেকে শস্তায় কাঁচা মাল সংগ্রহ করা চলবে পুরোদমে। আর তারপর, কাঁচা মাল থেকে কলকারখানায় যেসব জিনিস তৈরি হবে সেগুলিরও তো একটা বাজার চাই: আমাদের দেশেও যদি বড় বড় কলকারখানা গড়ে ওঠে তাহলে আমাদের দেশের লোকরা তো সেইখানে তৈরি জিনিসই কিনতে থাকবে, ওদের পক্ষে ঢালাও রপ্তানির বাজার যাবে ভেস্তে, আর বাজারই যদি ভেস্তে যায় তাহলে বণিক সভ্যতার পক্ষে বাঁচবার অবলম্বন কী থাকে? তাই আমাদের দেশে প্রগতির বিরুদ্ধে বিদেশী শোষকদের অমন কড়া পাহারাদারী, আমাদের দেশকে সামন্ত প্রথার খুঁটিতে বেঁধে রাখবার এমন পাকাপোক্ত ব্যবস্থা। দেশকে ভালোবেসেছি, শুধু এইটুকু

কথা মুখ ফুটে বলবার অপরাধে কত মানুষের গলায় ফাঁসির দড়ি ঝুলেছে, বুকে উঠেছে বেয়নেটের চিহ্ন, তার পুরো হিসেব কে করবে? তবু, যাতে দেশটাকে আরো ভালো করে শোষণ করা যায় এই আশায় ওরা আমাদের দেশে যে সব পরিবর্তন আনতে বাধ্য হয়েছিল তারই দরুন আবার আমাদের দেশ আংশিকভাবে সামন্ত-তন্ত্রের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেয়েছে। রেলপথ গড়া হয়েছে, কারখানা খোলা হয়েছে। তাছাড়া, দেশের মানুষের মন থেকে স্বদেশপ্রেম তো সত্যিই শাসনের চাবুক দিয়ে মেরে ফেলা যায় না; তাই বিদেশী শোষণের বিরুদ্ধে মানুষের মনে তীব্র বিক্ষোভ জমা হয়েছে, মরীয়ার মতো লড়াই করতে এগিয়েছে মানুষ।

স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরো ইতিহাস এখানে তোলবার সুযোগ নেই; দরকারও নেই। বিশেষ করে যে-কথা মনে রাখা দরকার তা হলো, সাম্প্রতিক কালে আমরা যখন দেশকে স্বাধীন করেছি তখন তার বাস্তব অবস্থাটা কী রকম? এক-কথায়, আধা-সামন্ততান্ত্রিক অবস্থা—যে-সামন্ততান্ত্রিক অবস্থায় ইংরেজ শাসকেরা আমাদের বেঁধে রাখতে চেয়েছিলো মোটের উপর তারই প্রচণ্ড প্রভাব। তাই, আমাদের স্বাধীনতা লাভের উল্টো পিঠেই প্রকাণ্ড সমস্যা হলো, সামন্ততন্ত্রের পূর্ণ উচ্ছেদ করে দেশকে আধুনিক শিল্পে সমৃদ্ধ করে তোলা।

তবুও, এ-সমস্যাকে শুধুমাত্র শিল্প-উন্নয়নের সমস্যা মনে করলে ভুল হবে। এক-কথায়, সামন্ততন্ত্রের সমস্ত গ্লানি কাটিয়ে সামগ্রিকভাবে সমাজকে নতুন করে গড়তে হবে।

এখানে আমরা এই বহুমুখী ও জটিল সমস্যার মধ্যে বিশেষ করে একটি দিকেরই আলোচনা করবো। সেটা হলো স্ত্রী পুরুষ সম্পর্ককে নতুনভাবে গড়ে তোলবার দিক।

কোনখান থেকে আমরা শুরু করছি তা মনে না রাখলে বুঝতে পারা যাবে না বাঙলা দেশের যৌনসমস্যা, চিনতে পারা যাবে না সে সমস্যা সমাধানের পথ। আমার বাঙলা,—কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে তা হয়ে থেকেছে অর্ধ-সামন্ততান্ত্রিক ঔপনিবেশিক বাঙলা। অর্থনীতির দিক থেকে পেছিয়ে পড়া দেশ; আর ইতিহাসে যে-হেতু পদে পদেই প্রমাণ রয়েছে যে অর্থনৈতিক অবস্থাটাই দেশের সব রকম

সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইমারতের বনিয়াদ, সেই হেতু সামাজিক দিক থেকে, সাংস্কৃতিক দিক থেকে পেছিয়ে পড়া দেশ। তাই, এ দেশ থেকে সামন্ত প্রথার অন্ধকার এখনও দূর হয়নি। যৌনজীবনের ক্ষেত্রে তার প্রমাণটা প্রতি পদেই! প্রতি পদেই অন্ধতা, অন্ধকার : ধর্মমোহের আড়ালে যৌন বিকারের আশ্রয়, বৈধব্য প্রথার আড়ালে গণিকাবৃত্তির প্রশ্রয় আর রতিজ রোগে দেহ পচতে শুরু করলে ঠাকুর দেবতার পায়ে মাথা কুটতে কুটতে মরে যাওয়া। এই রকম কতই না! ফর্দ করবো? ফর্দ পাবো কোথায়? বিদেশের উন্নত আবহাওয়ায় তবু মোটামুটি একটা ফর্দ যোগাড় করবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমাদের দেশে মাথা কুটে মরলেও জানবার জো নেই দৈনিক কত মেয়ে অবৈধ গর্ভপাত করাবার আশায় হাতুড়ের হাতে প্রাণ দিচ্ছে কিংবা রতিজ রোগের দরুন দৈনিক কত লোক পাগল হয়ে যাচ্ছে, মরে যাচ্ছে, পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। এ সব ব্যাপারের সঠিক খবর যোগাড় করা সম্ভবই নয়। এ-সব খবর পাবার বদলে আমরা বারবার সেই সামন্ততান্ত্রিক সংস্কারের প্রতিধ্বনিটুকুই শুনতে পাই : হে-ভারত, ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ......

তবু হিসেব পাবার উপায় নেই বলেই আলোচনার হাল ছেড়ে দেবার দরকার পড়ে না। আলোচনা করা চলে ভিত্তিটাকে নিয়ে। সেটাই খুব জরুরী আলোচনা। আর এই ভিত্তির আলোচনার প্রথম আর প্রধান কথা হলো, সমাজে নারীর স্থান। আমার বাঙলা। বাঙলা দেশের সমাজে নারীর স্থানটা ঠিক কী রকম? ঔপনিবেশিক দেশে যেমনটা হতে বাধ্য আজও বহুলাংশে সেই রকমই। অর্থাৎ সামাজিক মেহনতের মর্যাদায় মেয়েদের স্থান অতি সংকীর্ণ। আর যৌনজীবনের ইতিহাস প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি, সামাজিক মেহনতের মর্যাদা মেয়েদের ফিরিয়ে দিতে না পারলে সমাধান নেই যৌনসমস্যারও। অবশ্য ইংরেজ মার্কিনদের ধনতান্ত্রিক সমাজেও মেয়েরা সামাজিক মেহনতের প্রকৃত মর্যাদা ফিরে পায়নি, তাই ওদের দেশে যৌনজীবনের উপর সহস্র গ্লানির বোঝা। তবু আমাদের সঙ্গে তফাত আছে। মস্ত বড় তফাত। সে তফাত হলো, আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশের সঙ্গে পূর্ণ ধনতান্ত্রিক দেশের যে তফাত তারই অনুরূপ। ওদের দেশেও মেয়েরা পুরো মানুষের মর্যাদা পায়নি, তবু আমাদের দেশের মতো গৃহপালিত পশুর দশা নয়।

গৃহপালিত পশু কথাটা নেহাতই নির্মম হয়ে গেল। কিন্তু বাস্তবটা বোধ হয় তার চেয়েও বেশি নির্মম। বাস্তবের কথাটা ভেবে দেখা যাক, ভেবে দেখা যাক আমাদের দেশের একটি সাধারণ মেয়ের ইতিহাস—তার জন্মের সময় থেকে শুরু করে।

সাধারণ বাড়িতে একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। খোকা হলো না খুকী হলো এইটেই প্রথম ও প্রধান প্রশ্ন। মেয়ে হয়েছে রে, মেয়ে হয়েছে! সকলের মুখে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। দুশ্চিন্তার রেখা দেখা দিলো বাবার কপালে। মা কপালে করাঘাত করলেন। বাড়িতে শাঁক বাজবে না। ছেলে হলে বাজতো—কিন্তু ভারী তো এক মেয়ের ডেলা! এই রকম শোকাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় মেয়েটির প্রথম আগমন, অবাঞ্ছিত আগমন। তারপর, প্রত্যেক মুহূর্তে লাঞ্ছনার এক একটা বেড়া পেরিয়ে তিলে তিলে মেয়েটি বড় হতে লাগলো। প্রতি মুহূর্তে তাকে এক ভবিষ্যৎ ভয়াবহ শ্বশুর বাড়ির জন্যে প্রস্তুত করে তোলবার চেষ্টা: শিবের মাথায় দুর্বা ঘাস চাপিয়ে, গরুর পায়ে ফুল দিয়ে তার প্রার্থনা, শ্বশুর বাড়িটা যেন অন্তত ভয়ংকর না হয়। পুরুষের সঙ্গে সমান সামাজিক মর্যাদার কথা অবশ্যই ওঠে না; কিন্তু অকথ্য অত্যাচারের সম্ভাবনা থেকে তো ঠাকুর দেবতা রক্ষা করতে পারেন। দেবতার পায়ে এইটুকু প্রার্থনা জানিয়ে মেয়েটি বড় হয়ে উঠতে লাগলো। কিন্তু যদি তার স্বাস্থ্যটা সত্যি ভালো হয়ে পড়ে তাহলে পিতামাতা প্রমাদ গোনেন: আইবুড়ো মেয়েদের অমন বাড়ন্ত চেহারাটা ভালো নয়, সেই হেতু মেয়েটির স্বাস্থ্য তার মা বাবাকে মনে করিয়ে দেয় মেয়ে এবার অরক্ষণীয়া হয়ে পড়ছে। সহস্র গঞ্জনাও কিন্তু সত্যিই তো কারুর বয়েসকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। পিতা হন্যে হয়ে ঘোরেন পাত্রের সন্ধানে। তারপর কনে দেখার পালা: মেয়েটিকে যাচাই করবার জন্যে প্রায়ই এক একটি নতুন নতুন দল আসে। তাদের সামনে আবির্ভূত হতে হয় মেয়েটিকে—কেউ পছন্দ করে, আর কেউ বা করে না। মেয়েটির পক্ষে মুখ বুজে সমালোচনা শোনা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই! যারা পছন্দ করলো তারা দরাদরি শুরু করলো—বিনে পয়সায় মেয়ের বিয়ে হয় না; যত ভালো পাত্র চাই তত বেশি মূল্য দিতে হবে। তাই পিতার আর্থিক সামর্থ্য অনুসারে মেয়েটির বিয়ে হবে, তার নিজস্ব গুণের সঙ্গে সম্পর্কটা কম। পিতাকে হয়তো দেনা করতো হলো, হয়তো ঘটিবাটি বিক্রি

করতে হলো আর করতে হলো কপালে করাঘাত—কন্যার পিতা হবার যে চরম গ্লানি তারই আক্ষেপ। মেয়েটির পক্ষে মুখ বুজে সব শোনা ও দেখা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। তত্ত্বতাবাস আর নগদ টাকার ঘুষের সঙ্গে তাকে পাঠানো হলো শ্বশুরবাড়ি। তারপর তার কপাল। শ্বশুর-শাশুড়ী আর স্বামী-ননদ যদি নেহাত অমানুষ না হয় তাহলে তার জীবনটা কাটবে শান্ত নিরুপদ্রবভাবে, সন্তান উৎপাদনের উপায় হিসেবে। যদি তারা অমানুষ হয় তাহলে হয়তো চোখের জল আর পেটের জ্বালায় ভরবে তার বাকি জীবন। অতি-বড়ো অমানুষদের সংসারে পড়লে এমনকি হয়তো শেষ পর্যন্ত সে বেছে নেবে গলায় দড়ি বা গণিকা পল্লীর আশ্রয়। তার মা কপালে করাঘাত করে বলবেন: আঁতুড়ে কেন নুন খাইয়ে মারিনি অমন মেয়েকে। অবশ্যই, স্বামীর পরমায়ুটুকু যে তার জীবনের একমাত্র সম্বল তা জানা কথাই। স্বামীর পরমায়ুটুকু অকালে ফুরালে তার বাকি জীবনটায় আর মাছ-গয়না জুটবে না, জুটবে তার বদলে সাদা থান আর একাদশীর উপোস আর স্বামী-খেকো পোড়ারমুখীর দুর্নাম।

এই তো গেল মোটামুটি আমার বাঙলার একটি সাধারণ মেয়ের জীবনের ইতিহাস। এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়; কিন্তু ব্যতিক্রম-গুলি নেহাতই প্রশান্ত মহাসাগরে নগণ্য দ্বীপের মতো। তাই ব্যতিক্রম-গুলি দিয়ে কোনো কিছুই প্রমাণিত হবে না। তাছাড়া, এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, আমাদের দেশে অতি বড় পটের বিবিটিও প্রধানতই শ্বশুর বাড়ির সংকীর্ণ গণ্ডিটুকুর মধ্যে গৃহপালিত জীব ছাড়া আর কিছুই নয়; হাজার জড়োয়া আর বেনারসীতে ভূষিতা হলেও তার বেশি কিছু নয়। আঁতুড় ঘর থেকে রান্না ঘর পর্যন্ত তার জীবনের গণ্ডি। অবশ্যই অধিকাংশের জীবনেই আঁতুড় ঘরটা হলো নরকের সহজ সিংহদ্বার। প্রসবের বৈজ্ঞানিক সুব্যবস্থা যদিই বা কারুর আর্থিক সামর্থ্যে কুলোয় তাহলেও অনেক ক্ষেত্রে ধর্মসংস্কারে বাধে, তাই ব্যবস্থা আর হয়ে ওঠে না।

এই তো হলো আমার বাঙলার মেয়ে! এমন কেন হলো? তার কারণ, ওই রাজনীতি, ওই অর্থনীতি। বিদেশী শোষকদের নাগপাশে আবদ্ধ থাকার ফলে আমাদের দেশ অগ্রগতির পথ ধরে এগুতে পারেনি আর তাই বিদেশে সামন্তযুগের সমাজে মেয়েদের যে রকম অবস্থা ছিলো

আজও আমাদের দেশে মোটামুটি সেই অবস্থাই। সোবিয়েৎ বিপ্লবের আগে রুশ-এশিয়ায় মেয়েদের যে রকম অবস্থা ছিলো আজও আমাদের দেশে সেই রকমই অবস্থা। চীন দেশে এই সেদিন পর্যন্ত যে-রকম অবস্থা ছিলো আজো আমাদের দেশে সেই রকমই। কেননা, সামন্ত-সমাজের সঙ্গে এই অবস্থাটার যোগাযোগ অত্যন্ত গভীর।

এই তো আমার বাঙলা আর তার যৌন-সমস্যা।

কোন পথে এগোবো? নারী উন্নয়ন নিয়ে আন্দোলন করবো? মুক্ত যৌন-প্রণয়ের স্বপক্ষে প্রচার করবো? নিশ্চয়ই করবো। কিন্তু যদি মনে করি শুধু এইটুকুর মধ্যেই আমাদের মুক্তি আসবে, যৌন-সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, তাহলে প্রকাণ্ড ভুল করে বসবো। কেননা, যৌন-সমস্যাটা বাকি জীবনের সমস্যা থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়,—স্বতন্ত্রভাবে তার সমাধান কখনোই সফল হতে পারে না। যে সমাজ ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে আমাদের জীবন, সেই কাঠামোটা অটুট থাকবে আর আমাদের পরিচ্ছন্ন প্রচেষ্টায় যৌন-জীবনের সমস্যাগুলিকে সমাধান করা চলবে—এমনতরো কল্পনা নেহাতই শিশুসুলভ। যেমন, জ্বরের ঘোরে রোগী যখন ভুল বকে তখন শুধু ওই ভুল বকাটুকুর চিকিৎসা করে লাভ নেই, চিকিৎসা করতে হয় জ্বরের যেটা আসল কারণ তার। এখানেও সেই কথাই। যে অর্ধ-সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়ার একটা লক্ষণ হলো যৌন-জীবনে এই অসুস্থতা, বিকার, সেই অর্ধ-সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে।

কথাটা যে শুধু ফাঁকা বক্তৃতা নয় তা বুঝতে পারা যাবে একটু মুক্তভাবে চিন্তা করলেই। ধরা যাক সামাজিক মেহনতের মর্যাদায় মেয়েদের প্রতিষ্ঠা করবার কথা, যা না হলে যৌন-জীবনে মানুষের মুক্তি নেই। কেমন করে সামাজিক মেহনতের মর্যাদায় মেয়েদের প্রতিষ্ঠা করা যাবে? এঙ্গেলস দেখাচ্ছেন, তার প্রধান সর্ত হলো দেশে শিল্প উন্নয়ন, বিরাট বিরাট কারখানা গড়ে তোলা। একমাত্র দৈত্যের মতো বিরাট যন্ত্র-শক্তিকে বশ করতে পারবার পর পুরুষের মেহনত আর মেয়েদের মেহনত মর্যাদার দিক থেকে সমান হতে পারে। কলকারখানার এলাকায় ঘুরলেই বুঝতে পারা যায় কথাটা কতখানি সত্য। সেখানে মেয়ে মজুররা আর গৃহপালিত পশুর মতো নয়। কিন্তু শুধুমাত্র কলকারখানা খোলবার কথা ভাবলেও চলবে না। প্রশ্ন

ওঠে সেগুলির মালিকানা নিয়ে। যতদিন পর্যন্ত বিরাট বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মালিক থাকবে মাত্র মুষ্টিমেয় মানুষ, ততদিন পর্যন্ত দেশের বুকে প্রাচুর্যের মধ্যেও হাহাকার চলতে থাকবে। দেশের মানুষ মুক্তি পাবে না।

তাই, শুধু বিরাট বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথাটুকুই সবটুকু কথা নয়। মুষ্টিমেয় ব্যক্তিগত মুনাফালোভী ব্যবসাদারের মালিকানা বজায় থাকলে শিল্প প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ মানুষের জীবন পর্যন্ত পৌঁছায় না। যে কথা আলোচনা করা হচ্ছিলো—সামাজিক মেহনতের মর্যাদা মেয়েদের ফিরিয়ে দেবার কথা—বিরাট বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়তে না পারলে এই সমস্যার কোনো কিনারা হবার নয়; কিন্তু শুধুমাত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়বার কথা ভাবলেও চলে না। কেননা, যতদিন এই সব প্রতিষ্ঠানের মালিকানা জাতীয় মালিকানায় পরিণত না হচ্ছে ততদিন মেয়েদের ঘরের মেহনত আর সামাজিক মেহনতের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘোচবার সম্ভাবনা নেই। জাতীয় মালিকানা বা এই যৌথ মালিকানার নামই সমাজতন্ত্র। একদিকে বিরাট বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠান, সেখানে দিনের পর দিন মানুষের উৎপাদন শক্তিকে অবিশ্বাস্য-ভাবে বাড়িয়ে যাওয়া, আর একদিকে যৌথ মালিকানা। দেশের যা সম্পদ সেই সম্পদকে মানুষের ঘরে তোলবার আয়োজন। এরই নাম সমাজতন্ত্র।

আশ্চর্য দেশ সোবিয়েৎ রাশিয়া। পৃথিবীর সমস্ত মেহনতকারীর আদর্শ আর প্রেরণা ওই সোবিয়েৎ দেশ। কেননা, ওইখানেই প্রথম সফল হয়েছে সমাজতন্ত্র; ওইখানেই প্রথম সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনার ভিত্তিতে মানুষের জীবনকে প্রতিষ্ঠা করবার সার্থক প্রচেষ্টা হয়েছে। ওই দেশের মানুষ জীবনের মূল সমস্যা সমাধান করবার সুযোগ প্রথম পেয়েছে। সোবিয়েৎ দেশে তাই নতুন সভ্যতা, পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী। ও দেশের ঐশ্বর্য দেখবার জন্যে তাই বাতাসে ভর দিয়ে আকাশ থেকে পাখীর চোখ ধার করবার দরকার পড়ে না। ও দেশের ঐশ্বর্য চোখে পড়ে মানুষের চোখে মুখে, নতুন সভ্যতার দীপ্তি তাদের চেহারায়।

জীবনের আসল সমস্যার গোড়া ধরে ওরা ঝাঁকানি দিয়েছে। তাই সমাধানের পথে এগোতে পেরেছে সব রকম সমস্যার। সব রকম সমস্যার মধ্যে যৌন-সমস্যাও। এই কথাটা না বুঝলে যৌন-সমস্যার সোবিয়েৎ সমাধানকে বুঝতেই পারা যাবে না। এই কথাটা না বুঝলে আমার

বাঙলার যে যৌন-সমস্যা তা সমাধান করবার আসল পথ খুঁজে পাওয়াই সম্ভব নয়।

কিন্তু আমরা? আমরা এগোবো কোন পথে?

প্রথম কথা হলো, সামন্ততন্ত্রের পূর্ণ উচ্ছেদ।

এ-বিষয়ে অবশ্যই কোনো সন্দেহ নেই যে স্বাধীনতা লাভের পর আমরা সে-দিকে পা বাড়িয়েছি। আয়োজন শুরু হয়েছে নতুন পরিকল্পনার ভিত্তিতে আমাদের অর্থনৈতিক জীবনকে পুনর্গঠন করবার। বড়ো বড়ো বাঁধ বাঁধা হচ্ছে, প্রচণ্ড বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের আয়োজন চলেছে, ভিৎ গাঁথা হচ্ছে বিরাট বিরাট ইস্পাতের কারখানার। এ-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে এই নব-পরিকল্পনায় জোর দেওয়া হয়েছে জাতীয় মালিকানার উপর। এদিক থেকে সোবিয়েৎ দেশের সাফল্য, চীন নয়া গণতন্ত্রের সাফল্য বর্তমানে অনেকাংশেই আমাদের আদর্শ-উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলেছে, পথের নির্দেশ দিয়েছে। এবং আমাদের এই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্যের উপর নির্ভর করছে আমাদের ভবিষ্যৎ।

শুধু তাই নয়। আজ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার আনবার আয়োজন চলেছে, আয়োজন চলেছে আইন-ব্যবস্থায় সংস্কার আনা। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, আমাদের দেশে বিবাহ-বিধিতে সাম্প্রতিক সংস্কার। প্রচণ্ড বাধা অতিক্রম করে আমাদের দেশে বহু-বিবাহের পথ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে, সম্ভব হয়েছ, বিবাহ-বিচ্ছেদের সুযোগ সৃষ্টি করা। আমাদের দেশের ইতিহাসে এ-জাতীয় পরিবর্তনকে বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন বলে মানতেই হবে।

আমরা সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করবার আয়োজনে অগ্রসর হয়েছি। সেদিক থেকে, আজ আমাদের সামনে ভুলছে এক নবীন উন্নত দেশের দৃশ্যপট,—আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আমাদের উৎসাহ-প্রেরণার উৎস সেইখানে। তাই আমাদের সামনে আজ সবচেয়ে বড়ো সমস্যা, এই অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে কী ভাবে সম্পূর্ণ সার্থক করে তোলা যায়: কোথায় বাধা, সেই বাধাকে কী ভাবে দূর করা সম্ভব? আর তারপর? —ওই অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের উপরে দাঁড়িয়ে—আমরা কী ভাবে পূর্ণ সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হতে পারবো?

কিন্তু এ-জাতীয় অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সমস্যা ছাড়াও আমাদের

সামনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা রয়েছে, যে-বিষয়ে সবসময়ে আমাদের হুঁস থাকে না।

সেটা হলো আমাদের চিন্তা-সংস্কারের সমস্যা।

বহুদিন ধরে পিছিয়ে পড়া আবহাওয়ায় আমাদের দিন কেটেছে বলে আমাদের ধ্যানধারণার রাজ্যেও বহু আগাছা জন্মেছে, শ্যাওলা পড়েছে। এবং, যেটা আরো মারাত্মক কথা,—এই জাতীয় আগাছার প্রতি অনেক সময় আমাদের মমতা জাগে, আমরা সেগুলিকে জাতীয় ঐতিহ্যের গৌরব বলে ভুল করে বসি। বিশেষত, নরনারীর সম্পর্ক নিয়ে ভাববার সময় আমরা এখনো পদে পদে এই মারাত্মক ভুল করে বসি।

কিন্তু আমরা যেন ভুলে না যাই যে আমাদের মনের মধ্যে যতোদিন সামন্ততন্ত্রের অন্ধকারকে বাঁচিয়ে রাখবো ততোদিন পর্যন্ত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করে হাজার বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদনও ব্যর্থ হবার আশঙ্কা আছে। তাই এই চিন্তা সংস্কারের দায়িত্বটা বড়ো কম নয়।

সচেতনভাবে ভেবে দেখতে হবে আমাদের মনের কোন ধারণা, কোন সংস্কার আজো আমাদের পিছনদিকে টেনে রাখতে চায়। সেগুলিকে উচ্ছেদ করতে হবে। কথাটা বিশেষ করে জরুরী স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক প্রসঙ্গেই। কেননা, পিছিয়ে-পড়া দশার সবচেয়ে বড়ো অন্ধতা, সবচেয়ে গভীর কুসংস্কার অধিকাংশ সময়ে এই সম্পর্কটিকে কেন্দ্র করেই টিকে থাকে।

তাই চাই চিন্তাসংস্কার। এর অভাবে দেশের আইনে অত্যন্ত বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটলেও আমরা তার উপযুক্ত সুযোগ নিতে দ্বিধা করতে পারি, ব্যর্থ হতে পারে আমাদের নব-পরিকল্পনা। কথাটা কেন বিশেষ করে তুলছি তা এর পরের পরিচ্ছেদে স্পষ্টভাবে দেখতে পাবো।

দ্বাদশ অধ্যায়

ভারতের নব-বিবাহ-বিধি

সামন্ত-প্রথার একটা মস্ত মজবুত বনিয়াদ ছিলো আমাদের দেশের বিবাহ-বিধি। ১৯৫৫-র আইন সে-বনিয়াদকে অনেকাংশে ধ্বংস করতে পেরেছে, আমাদের পক্ষে আরো উন্নত অবস্থার দিকে এগোবার সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

বহুবিবাহ বন্ধ হয়েছে।

বাল্য-বিবাহ বন্ধ হয়েছে।

আইনগত স্বাতন্ত্র্য এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্ভব হয়েছে।

এই ব্যবস্থাগুলির তাৎপর্য বড়ো কম নয়। অতএব এখানে ১৯৫৫-এর নব-বিবাহ-বিধির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

আইনটির নাম, "হিন্দু ম্যারেজ এ্যাক্ট, ১৯৫৫"—১৮ই মে ১৯৫৫ তারিখে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর পেয়ে আইনট প্রবর্তিত হয়েছে। এই নতুন আইনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিকের সারাংশ :—

১। সমস্ত ভারতীয় হিন্দুর উপর এ-আইন প্রযোজ্য—হিন্দু বলতে বৌদ্ধ, জৈন, শিখ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদেরও বোঝানো হবে। খৃষ্টান, মুসলমান, ইহুদী ও পার্শীদের উপর আইনট প্রযোজ্য নয়।

২। নিম্নোক্ত সর্তগুলি মানা না-হলে আইন-সঙ্গত বিবাহ হবে না :

(ক) বিয়ের সময় কাকুরই পূর্ব-বিবাহিত স্বামী বা স্ত্রী থাকতে পারবে না।

(খ) হাবা বা পাগলের সঙ্গে বিয়ে হবে না।

(গ) বিয়ের সময় স্বামীর বয়েস ১৮ বছরের কম বা স্ত্রীর বয়েস ১৪ বছরের কম হওয়া চলবে না।

(ঘ) স্ত্রীর বয়েস ১৮ বছরের কম হলে তার অভিভাবকের সম্মতি লাগবে।

(ঙ) ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে হবে না।

৩। যদি স্বামী বা স্ত্রী উপযুক্ত কারণ না-থাকা সত্ত্বেও একে অপরকে

ত্যাগ করতে চায় তাহলে অপরের পক্ষে বিবাহ-সম্পর্ক ফিরে পাবার আইনসঙ্গত অধিকার থাকবে।

৪। নিম্নোক্ত যে-কোনো কারণে আইনসঙ্গত স্বাতন্ত্র্যের (বা Judicial Separation) আবেদন করা যাবে:

(ক) আবেদনের ঠিক আগে স্বামী বা স্ত্রী যদি একটানা দু'বছর একে অপরকে ত্যাগ করে থাকে।

(খ) আবেদনকারীর প্রতি যদি অপরপক্ষ এমন নিষ্ঠুর আচরণ করে থাকে যার দরুন তার সঙ্গে আবার ঘর করতে ন্যায্যত ভয় হয়।

(গ) আবেদনের ঠিক আগে অন্তত একবছর ধরে অপরপক্ষ যদি কুষ্ঠরোগে ভোগে।

(ঘ) আবেদনের ঠিক আগে যদি অপরপক্ষ ছোঁয়াচে রতিজ রোগে আক্রান্ত হয় এবং এ-রোগ যদি আবেদনকারীর কাছ থেকে না পেয়ে থাকে।

(ঙ) আবেদনের ঠিক আগে অপরপক্ষ যদি অন্তত দু'বছর মানসিক অসুস্থতায় ভোগে।

(চ) বিয়ের পর অপরপক্ষ যদি আবেদনকারী ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে মৈথুন করে।

আদালতে আইনসঙ্গত স্বাতন্ত্র্যের রায় পাওয়া গেলে কোনো পক্ষই অপরের সঙ্গে ঘর করতে বাধ্য থাকবে না।

৫। এই আইন পাশ হবার পর যে-সব বিয়ে হবে সেগুলির বেলায় যদি দেখা যায় একপক্ষ ইতিপূর্বেই বিবাহিত ছিলো, বা স্বামীর বয়েস ১৮-র কম বা স্ত্রীর বয়েস ১৪-র বেশি, বা স্ত্রীর বয়েস ১৮-র কম হওয়া সত্ত্বেও অভিভাবকের অনুমতি নেওয়া হয়নি,—তাহলে সে-বিয়ে বাতিল (void) হয়ে যাবে।

৬। নিম্নোক্ত কারণে যে-কোনো বিয়ে (—তা এই আইন পাশ হবার আগেই ঘটে থাকুক বা পরে ঘটুক—) বাতিল করে দেবার জন্যে আবেদন করা যাবে;

(ক) যদি বিয়ের সময় থেকে স্বামী রতিশক্তিহীন (impotent) হয় এবং সেই অবস্থাতেই থাকে।

(খ) যদি যে-কোনো পক্ষ হাবা বা পাগল হয়।

(গ) যদি জুয়াচুরি করে বা জোর করে একপক্ষকে বিয়েতে সম্মত

করা হয়ে থাকে, বা ওইভাবে (যে-ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) অভিভাবকের সম্মতি আদায় করা হয়ে থাকে।

(ঘ) বিয়ের সময় স্ত্রীর গর্ভে যদি অপর কারুর সন্তান থাকে।

৭। বিবাহ-বিচ্ছেদ বা divorce নিম্নোক্ত কারণে হবে:

(ক) একপক্ষ যদি ব্যভিচার-জীবন যাপন করে (living in adultory)—অর্থাৎ, অপর কোনো স্ত্রী বা পুরুষের সঙ্গে থাকে।

(খ) ধর্মান্তর গ্রহণ করে আর হিন্দু না-থাকে।

(গ) বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন পেশ করবার ঠিক আগে একটানা তিন বছর দুরারোগ্য উন্মাদ-রোগে বা কুষ্ঠরোগে বা ছোঁয়াচে রতিজরোগে ভোগে।

(ঘ) একপক্ষ যদি সংসার ত্যাগ করে কোনো ধর্ম-সম্প্রদায়ে যোগ দেয়।

(ঙ) একপক্ষ যদি একটানা সাত বছর সম্পূর্ণ নিখোঁজ হয়।

(চ) আইনসঙ্গত স্বাতন্ত্র্যের রায় পাবার পরও যদি একটানা দু'বছর স্বামীস্ত্রী সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হয়।

৮। নিম্নোক্ত কারণে স্ত্রী বিবাহ-বিচ্ছেদ পাবে:

(ক) যদি দেখা যায়, এ-আইন পাশ হবার আগে স্বামীর অন্য বিয়ে ছিলো এবং সে-পক্ষের স্ত্রী যদি বেঁচে থাকে।

(খ) স্বামী যদি ধর্ষণ, সমকাম বা পশুকামে লিপ্ত হয়।

৯। বিয়ে হবার তিন বছরের মধ্যে কেউই বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন করতে পারবে না।

১০। বিবাহ-বিচ্ছেদর পর এক বছর উত্তীর্ণ না-হলে কেউই পুনর্বিবাহ করতে পারবে না।

১১। ভারতীয় পিনাল-কোডের ৪৯৪ ধারা অনুসারে একাধিক বিয়ের শাস্তি ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ডও হতে পারে।